ইলিয়া এরেনবুর্গ

# ঝড়

## প্রথম ভাগ

(১ম ও ২য় খণ্ড)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ (যন্ত্রস্থ)

অনুবাদ : অশোক গুহ

ভারতী লাইব্রেরী
১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রতুলকুমার দত্ত
১৪৫, কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর ঃ
ননীগোপাল পোদ্দার
ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রেস,
৭৭-১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দাম ঃ চার টাকা

শ্রীমতী কিরণকে

# ভূমিকা

যুদ্ধ-সাহিত্যের উৎস সন্ধানে যেতে হয় আদিমতমকালে। সুদূর সেই অতীত থেকেই ধারা বয়ে চলেছে, আজ তা এসে ঠেকেছে বর্তমানে। তখন ধারা ছিল সরল— গোষ্ঠীগত বিরোধ—পরে তাতে শ্রেণী-সংঘাতের জটিলতা দেখা দিয়েছে। আজ তা জটিলতরো থেকে তমোতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সাহিত্যের ধারা মানুষের মুখ্য ভাবাবেগের দ্যোতক, তার মানবতা আর ব্যক্তিত্ববোধেরও প্রতীক। তাই তার বাঁকে বাঁকে মহাগাথা আর মহাকাব্যের নিশানা-পাথরও রয়েছে। আরিস্ততল যাকে মিথ্যময়ী ইতিহাস বলেছেন, সে এই মানুষের শ্রেণী-সংগ্রামের ঝড়কে সার্থক আর অমর রূপই দিয়েছে। তাই আমরা পেয়েছি রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ওডেসী আর ইগরের গাথার মতো নিশানা-পাথর। আর পেয়েছি উনিশ শতকে টলস্টয়ের 'সংগ্রাম ও শান্তি' (War & Peace)। এরই মধ্যে আরো কত লেখক এসেছেন, যুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু নিশানা-পাথরের সংখ্যা এই কয়েকখানি। সুদূর অতীত থেকে ধাপ এসে ঠেকেছে উনিশ শতকে—সংগ্রাম ও শান্তিতে।

তারপরে বিংশ শতাব্দী। এ শতাব্দীর প্রথম পাদেই মহাযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেল। সাহিত্যিকরাও নিশ্চিন্ত হয়ে গজদন্তের মিনারে বসে রইলেন না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁদের ছুটতে হোলো যুদ্ধে। আগেকার মহাকাব্যের বীরত্বের দিকটা তাঁদের কাছে তত দেখা দিল না, যত দেখা দিল তার তিক্ততা, তার দুঃখ। তাই ওয়েন আর সাসুন থেকে শুরু করে ফক্‌নার, হেমিংওয়ে পর্যন্ত এই পাইকারী হত্যার কোনো অর্থ খুঁজে পেলেন না। তাঁরা সৈনিকের খাকি উর্দি পরে যুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে পারলেন : সৈনিকরা তো আর কিছু নয়, মৃত্যুর ধূসর দেশের বাসিন্দে ; আগামীকাল থেকে তারা আর কোনো লভ্যাংশ পাবে না। বারবুসের মার্কসবাদী বিজ্ঞানী মন এর ভিতরে একটা অর্থ খুঁজে পেলেন, সে সাম্রাজ্যবাদের লোলুপতা। এঁরা সাহিত্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাতে গণ্ডি টেনে দিলেন।

তাই রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট', বেরুলো, বেরুলো বারবুসের 'আণ্ডার ফায়ার', হেমিংওয়ের 'ফেয়ারওয়েলস্ টু আর্মস্', কিন্তু তারা যুদ্ধের বাস্তব খণ্ড চিত্র বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে পূর্ণাঙ্গ চিত্র হয়ে উঠলো—কিন্তু সমষ্টিগত মানুষের নিরিখে যুদ্ধের সমগ্র রূপ তো ফুটে উঠলো না। তাই প্রথম মহাযুদ্ধে আর একখানা 'সংগ্রাম ও শান্তি' সৃষ্টি হোলো না।

এর কারণ ছিল বই কি। এক বারবুস ছাড়া কেউ যুদ্ধের কারণ খতিয়ে দেখেন নি, তাই হতাশায় পর্যবসিত হোলো ঝড়ের কাহিনী। সাহিত্য যুদ্ধের বিরোধী হলেও সে হোলো সংকীর্ণ ব্যক্তিগত ও নেতিবাদী। তবে এরই মধ্যে শোলোকভের ডন-উপন্যাসমালা সংগ্রাম ও শান্তির সমান আসন না পাক, সমগোত্রীয় বটে। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপক রূপ তাতে নেই। তার উপজীব্য রুশ-বিপ্লব ও অন্তঃযুদ্ধ। তাহলে দেখা গেল মহাকাব্য তৈরী হোলো না প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবার আসা যাক। এর সালটা ১৯৩৯। এবার শ্রেণী-সংগ্রাম আরো জটিল। 'সোশালিস্ট পিতৃভূমি'র পত্তন হয়েছে, কমিউনিজমের ভাবধারায় নির্জিত সর্বহারার দল অনুপ্রাণিত। ওদিকে ফ্যাসীবাদ মানুষের অগ্রগতি রোধ করবার জন্য তাকে পশ্চাৎ-মুখী ভাবধারার শিকলে বাঁধছে। তাই সালটা ১৯৩৯ হলেও ছোটখাটো ঝড় তার আগেই বয়ে গেল। সাংহাইয়ে ঝড় বয়ে গেল, চিয়াং-রাজত্ব বসলো ; তারপর স্পেন। স্পেন শেষ নয়, শুরু—প্রস্তাবনা—মহাঝড়ের আদিপর্ব। মানুষ তখন যুদ্ধের মানে খুঁজে পেয়েছে। তাই দলে দলে পৃথিবীর তরুণ তরুণী ছুটে এল আদর্শের জন্য লড়াই করতে। এ তাদের নায়কের অনুবর্তীতা নয়, আদর্শের প্রেরণা। সাহিত্যিকরাও বসে থাকতে পারলেন না, তাঁরা এলেন, লড়লেন, কেউ বা প্রাণ দিলেন। উপন্যাসও বহু লেখা হোলো, লেখা হোলো নানা বিবরণী আর কবিতা। হেমিংওয়ে—স্পেনের মর্মন্তুদ ট্রাজেডিকে সস্তা সিনেমার উপজীব্য করে তুললেন ; লোরকা, স্পেণ্ডার, অডেন, নেরুদা লিখলেন উদ্দীপনাময়ী কবিতা। দুখানি উপন্যাস এরই মধ্যে চমক দিয়ে গেল। একখানা গুস্তাভ রেগলারের 'দি গ্রেট ক্রুসেড', আর একখানা আন্দ্রে মালরোর 'ম্যান্স হোপ'। রেগলার আর মালরো লড়েছিলেন স্পেনে, তাই স্পেনের সেদিনের ঝড় জীবন্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু এতো আংশিক ছবি—তাঁরা

লিখলেন আশাটুকু অবলম্বন করে। মালরোর উপন্যাস যুদ্ধ শেষ হবার আগেই বেরুলো। কিন্তু ঝড়ের সে সমগ্র রূপ দেখা দিল না, তাই মহান হয়ে উঠলো না তাঁদের সৃষ্টি। হয় তো এর কারণ সেদিনকার যুদ্ধের পরিণতি। যদি বিশ্বাসঘাতকতা আর লজ্জা পরিণতি হিসেবে না আসত, তাহলে হয় তো 'সংগ্রাম ও শান্তি'র মতো আর একখানা মহাকাব্য আমরা পেতাম।

প্রাচ্য এর মধ্যে নিশ্চিন্ত বসে ছিল না, বিশেষ করে চীন। তার উপর দিয়েও ঝড় বয়ে গেল। সে ঝড় খণ্ড-প্রলয় হোক, কিন্তু তাতে দুই বিরোধী ভাবধারার দ্বন্দ্ব ছিল, ছিল অর্থ। মালরো তারই এক খুদে ফটোগ্রাফ ধরেছিলেন Storm in Sanghai-তে। কিন্তু মালারোর সে ছবিতে হতাশার সুরই প্রধান। তিনি মানুষের ভাগ্যের নিষ্ঠুরতাই দেখিয়েছেন।

বিদেশীর চোখে-দেখা ঝড় নয়, ঝড়কে উপলব্ধি করে তার অর্থ খুঁজে বার করে চীনে আর এক শিল্পী তাকে রূপ দিলেন এবার। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়ার চাষীদের গেরিলা প্রতিরোধ সংগ্রামের এ কাহিনী। বইখানির ইংরেজী নাম village in August লেখক তিয়েন চুন পেশাদার সৈনিক, তাঁর বইখানা বেরিয়ে চীনের জনগণকে এক অপূর্ব সংহতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুললো! কিন্তু ঝড়ের খণ্ড-রূপ হিসেবে উজ্জ্বলতমো হলেও সমগ্ররূপ সে নয়।

তারপর উনচল্লিশের পর্যায়। এবার যুদ্ধ-সাহিত্যের ফিরিস্তি লম্বা। উপন্যাস আছে, কবিতা আছে, নাটক আছে, আর আছে জীবন্ত বিবরণী। রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স সর্বত্র তারা বেরিয়েছে, চমক দিয়েছে। কিন্তু এ যেন বিজলীর দীপ্তি—স্থায়ী আলো তাদের নেই।

আরাগঁ ও নেরুদার কবিতা বাদ দিলে এরই মধ্যে প্রোজ্জ্বল দুটি—একটি বরিস ভয়েতেকভের 'সেবাস্তপোলের শেষ ক'দিন', আর একটি এহরেনবুর্গের—'পারীর পতন'। দুটিই স্ফুলিঙ্গ—বহু নিষ্প্রভতার ভিতরে তারা জ্বলছে কিন্তু মহান যুদ্ধ-সাহিত্যের অঙ্গীকার তারা পূর্ণ করতে পারে নি। তার কারণ 'সেবাস্তপোলের শেষ ক'দিন' যুদ্ধের একখানি জীবন্ত বিবরণী, উপন্যাসের চরিত্রের পূর্ণতা বা গভীরতা কিছুই তার নেই। তাই সে বাস্তব আর জীবন্ত হয়েও মহানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। আর এহ্রেনবুর্গ যুদ্ধ-উপন্যাস লিখতে গিয়ে এঁকেছেন ক্ষয়িষ্ণু পারীর ছবি—তার ভাঙন দেখা দিয়েছে—কি তার সমাজে, কি তার রাজনীতিতে—কিন্তু যুদ্ধের ছবি তেমন নেই—যাও আছে সেও খণ্ড,

বিচ্ছিন্ন। তাই তাঁর এই মহান উপন্যাস যুদ্ধ-সাহিত্য হিসেবে 'সম্ভাবনাময় ব্যর্থতা' (?) ছাড়া আর কিছুই নয়—অন্তত বিদেশী কয়েকজন সমালোচকের মত তো তাই। শুধু বারবুস তার 'আণ্ডার ফায়ার' নিয়ে টি'কে আছেন, কিন্তু তাও যুদ্ধের পূর্ণরূপ দিতে পারেন নি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পূর্ণতাই তাঁর উপন্যাসে আমরা পাই।

আগে যখন যুদ্ধ ছিল সরল, যখন যুদ্ধমান দুটি দলই শুধু তার ক্ষয়-ক্ষতির জের টানতো, তখন কাব্য অথবা গাথাই ছিল তার নাটকীয় গতি প্রকাশের একমাত্র বাহন। কিন্তু আজ যুদ্ধ জটিলতমো, বহু ধারাময়। শুধু একটা দল নয়, একটা জাতি নয়, সারা পৃথিবী তাতে জড়িয়ে পড়ছে, তাই কাব্য আর গাথার রূপ নিলে তার আর চলবে না, তাকে নিতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যম বেছে। টলস্টয় একথা বুঝেছিলেন, তাই একটা শ্রেণী, একটা দেশকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেছিলেন সংগ্রাম ও শান্তি। (তিনি রাশিয়ার সব কটা শ্রেণীকে দেখাননি, তার চাষী-চরিত্রগুলিকে গোটা শ্রেণীর পরিচায়ক হিসেবে ধরা যায় না।) আজ বিশ শতকে যুদ্ধ এমন একটা জটিলতমো রূপ নিয়েছে যে কোনো একক শ্রেণী বা দেশের কোটরে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তার পটভূমিকা আজ আরো বিস্তৃত। টলস্টয়ের দেশের মানুষ, তাঁরই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এহ্‌রেনবুর্গ তা বুঝেছেন, তাই 'পারীর পতনে' তাঁর প্রচেষ্টা দেখা যায়। আর সে-প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছে আজ 'ঝড়-এ'।

টলস্টয় সংগ্রাম ও শান্তি রচনায় সাত বছর ব্যয় করেছিলেন, আর এহ্‌রেনবুর্গ 'ঝড়-এ' নিয়েছেন এক বছর—১৯৪৬ থেকে ৪৭ সাল। তার 'সম্ভাবনাময় ব্যর্থতাকে' তিনি সার্থকতায় সমুজ্জ্বল করতে চেষ্টার অন্ত রাখেন নি; আর তাতে সফলও হয়েছেন। কিন্তু টলষ্টয়ের থেকে তাঁর সময় আরো জটিল—যে-উপাদান তিনি বেছে নিয়েছেন তা আরো জটিলতরো।

টলস্টয় উপাদান বেছে নিয়েছিলেন ইতিহাস থেকে, আর সে ইতিহাস তাঁর সময়ের নয়—সে যুদ্ধ ঘটেছিল তাঁর পিতা-পিতামহের কালে। টলস্টয়ের এই উপাদান বেছে নেওয়ার মূল ছিল অবচেতনার আড়ালে। তিনি রাশিয়ার শাসক শ্রেণীর সামাজিক শুভবুদ্ধিকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। তাই তাঁকে অতীত কালকে খুঁজে নিতে হয়েছিল। আর তাই তো স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রামকে আরোপ করা হয় ইতিহাসের বিরাট পটভূমিতে—তাই তিনি স্বাধীন হয়েও নিজের প্রয়োজন আর বাধ্য-বাধ্যকতা সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারেন না। তাই টলস্টয় শাসক শ্রেণীর (নিজেও তারই অন্তর্ভুক্ত) প্রগতিশীল ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য রেখে যুদ্ধের বাস্তব রূপ নিরূপণ করেছেন। তিনি নেপোলিয়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিরোধ শক্তিকে দেখেছেন 'জনযুদ্ধ' হিসাবে। সম্মেলিত মিত্র শক্তির বিগত যুদ্ধে ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধ সংগ্রামেরই এ শামিল। শাসক শ্রেণী যেখানে নিজের স্বার্থরক্ষায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, সেখানে জনগণের সাড়া জাগে না। কিন্তু মাতৃভূমি রক্ষার প্রেরণায় যে যুদ্ধ হয় সেখানে সম্মেলিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি জেগে ওঠে। টলস্টয় এ কথা বুঝেছিলেন বলেই শাসক শ্রেণীর পরিচালিত যুদ্ধেরও নাম দিয়েছিলেন 'জনযুদ্ধ'। কি তাঁর এই 'জনযুদ্ধ' যেন জনগণের নিয়ন্ত্রিত ভাগ্য। নেতা বা ভাবধারা তাদের চালিত করছে না—চালিত করছে ভগবানের শুভইচ্ছা।

কিন্তু সে যুগ আর নেই। জনগণের ভূমিকা আজ মার্কসবাদের সন্ধানী আলোয় উদ্ভাসিত, সুপরিস্ফুট। তাই যুদ্ধের কারণ আর লক্ষ্য মানুষের কাছে পৃথক পৃথক রূপে রূপায়িত। আবার এই কারণ আর লক্ষ্যই যুদ্ধের রূপও বদলে দেয়। চীন আর রাশিয়ার কাছে বিগত যুদ্ধ 'জনযুদ্ধের' রূপ নিয়েই এসেছিল; ব্রিটেনের কাছেও তা এসেছিল, কিন্তু তাতে সাম্রাজ্যবাদের মিশেল ছিল বেশি—তাই সে তার উপনিবেশগুলিতে যুদ্ধের আহ্বান পৌঁছে দিতে পারে নি। তার লক্ষ্য তখন সাম্রাজ্য রক্ষা। মার্কিন মুল্লুকেও প্রথম পর্যায়ে সে ছিল 'জনগণের যুদ্ধ'—ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে—কিন্তু পরে তাকে মুষ্টিমেয় ধনিক স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী পথে চালানো হয়। তখন সে গণতন্ত্রের মহিমা ভুলে নানা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিজড়িত হয়ে পড়ে। এ তো এক-এক দেশের এক-এক লক্ষ্যের কথা, এমন কি একই দেশেও তার বিভিন্ন লক্ষ্য দেখা দেয়। যুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন স্তর এক হয়েই দেখা দেয়। তাই সে একাধারে আত্মরক্ষা আর আক্রমণের সংগ্রাম হয়ে ওঠে, প্রগতিশীলতা আর সাম্রাজ্যবাদ, বিপ্লবী আর গোঁড়া মতবাদের সাময়িক মিলন ঘটে। এই সামগ্রিক সংহতি শক্তির আলোড়নে কিছুটা ক্ষয়ে যায় তার বিরোধ, সে ক্রমশঃই এক সঙ্গতির দিকে এগিয়ে যায়। আজকের নতুন সংগ্রাম ও শান্তির লেখককে যুদ্ধের এই জটিল রূপ বুঝতে হবে—আর এরেনবুর্গ তা বুঝেছেনও।

তাছাড়া এরহেনবুর্গ প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা, যুদ্ধে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি অতীতে ঝড়কে খুঁজতে যাননি, তিনি বর্তমানের ঝড় এড়িয়ে কোনো স্বাস্থ্য নিবাসে কি সুইজারল্যাণ্ডের আরামে গা ঢেলে দেননি। তিনি ঝড়ের রূপ তার ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে খেয়ে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর বিজ্ঞানী মন ছিল সজাগ। তাই এখানে তিনি টলস্টয়ের অনুজ বা অনুগামী নন। টলস্টয় 'সংগ্রাম ও শান্তিতে' লিখেছেন :—

'ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার নিষেধ বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। শুধু অজ্ঞানতাই এখানে ফলপ্রসূ ; যারা ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে, তারা তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না।'

কিন্তু টলস্টয়ের বহু মতবাদের মতো একথা যুক্তিসহ নয়। এরেনবুর্গ তাঁরই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী—কিন্তু ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মানুষ। তাঁর জন্ম সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ায় হলেও তিনি সোভিয়েৎ ব্যবস্থায় পুষ্ট। তাই গোর্কি যে লেখকদের কথা বলেছেন : 'সোভিয়েৎ লেখক শুধু সাহিত্যিকই নন, তিনি এক ব্যক্তিত্ব, তাঁর দেশে যা ঘটছে, তারই কর্মঠ, উৎসাহী অংশীদার'—এরেনবুর্গ সেই সোভিয়েৎ লেখকদেরই একজন এবং অগ্রণীও। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে, তাই তিনি বলতে পারেন, 'চার বছর ব্যাপী যুদ্ধ—আমরা কি ভুলতে পারি ? সোভিয়েতের আর সবার মতো আমি যা করতে পারি তাই করেছি। কত মুহূর্ত এসেছে, যখন একখানা উপন্যাস, কি একটা কবিতা লেখার প্রেরণা এসেছে, কিন্তু লিখতে হয়েছে অন্য জিনিস। এ একা আমার নয়, একজন ইঞ্জিনিয়ার, সেতু নির্মান যে করে, তাকে ওড়াতে হয়েছে সেতু। সে যা শিখেছে, যার স্বপ্ন দেখেছে, তা তো সে করতে পারেনি।—আমরা আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি, মানুষের জন্য, সংস্কৃতির জন্য লড়েছি।'

এরেনবুর্গ সোশালিস্ট সমাজের মানুষ আর মার্কসবাদী বলেই তার এই অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন, তিনি মনস্তাত্ত্বিক আর সামাজিক কার্যকারণের তাৎপর্য বুঝেছেন ; বুঝেছেন আধুনিক যুদ্ধের রূপ আর তার বিরোধ—তার অবিরাম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। এখানে তাঁর সহায় হয়েছে বাস্তবতাবোধ। এ বোধ সমাজতন্ত্রের কষ্টিপাথরে কষিত, তাই এর নাম সোশ্যালিস্ট বাস্তবতা। এখানে মানুষকে দেখতে হবে সমাজের

একজন হিসাবে, বিচ্ছিন্ন করে নয়, সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক দিয়ে হবে তার বিচার। সমাজ তার সামঞ্জস্য আর বিরোধ নিয়ে ফুটে উঠবে। অতীতকে এখানে উপলব্ধি করতে হবে ইতিহাসের ধারা হিসেবে—সে-ধারা এসে মিশেছে বর্তমানে, সেখান থেকে গেছে ভবিষ্যতে। এক কথায় একে বলা যায় বর্তমানের নিরিখে অতীতের মূল্য নিরুপণ ও ভবিষ্যতের কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতনতা। এরেনবুর্গের 'ঝড়' ইতিহাসের এই বিপ্লবীধারার প্রকাশ হিসাবে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্তই শুধু নয়, মহাকাব্যও বটে।

তাঁর 'ঝড়-এ' ফুটে উঠেছে তিনটি যুদ্ধমান দেশের জীবন্ত ছবি—তাদের প্রাক-সমর পর্বও বাদ যায়নি। এ তো আরিস্তোতলীয় এপিকের জীবন্ত ভাষ্য, একে ইতিহাসের কৃত্রিম রূপ বুঝি বলা যায় না, এ এক জীবন্ত ইতিহাস। 'পারীর পতনে' পপুলার ফ্রন্টের ফাটল ধরা থেকে ফ্রান্সের পরাজয়ের ইতিহাস আছে, ঝড়-এ আছে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব থেকে পরবর্তী ইতিহাস—আর সে শুধু ফ্রান্সের নয়, রাশিয়ার, জার্মানীরও। যুদ্ধ চায় মুষ্টিমেয় মানুষ, কোথাও বা ফ্যাসিবাদকে কায়েম করবার জন্যে, কোথাও বা তারই তোষণে, ঐতিহ্য জলাঞ্জলি দিয়ে। আবার কোথাও বা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে জনগণের উন্নতির নানা পরিকল্পনা চলছে। পারীর ল'াসিয়ে যুদ্ধ চান না; ভার্দুনের স্মৃতি তার মনে প্রোজ্জ্বল। জার্মানদের প্রতি আছে তাঁর বিদ্বেষ। রাশিয়ার সার্জি জানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এরই ছায়ায় সে পালিত। তারা তৈরী—তার স্বপ্ন—তারা বার্লিন হয়ে যাবে স্পেনে—ফ্যাসিবাদের মহিমা লুটিয়ে দেবে। কিন্তু তবু মন থেকে সেও চায় না; চায় না সোবিয়েতের মানুষ। জার্মানীর রিকটারও যুদ্ধ চায় না, ফ্যাসিবাদের নবন্যায়কে সে ঠাট্টাই করে, কিন্তু তারই ঘূর্ণায় সে হাবুডুবু খায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনের এই অভিব্যক্তি।

এক বিচিত্র জগত রচেছেন এহ্‌রেনবুর্গ। নানা মানুষ ভিড় করেছে। তারা ইতিহাসের সংঘাতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, সম্পূর্ণতা পাচ্ছে। আজ যে প্রতিক্রিয়াশীলতার শিবিরে বন্দী, কাল সে এগিয়ে আসছে ইতিহাসকে নতুন রূপ দিতে। তারা রক্ত মাংসেরই ছায়া, বিভিন্ন ভাবধারার আলনা নয়। তিনি শত্রু মিত্রের বাছ-বিচার করেননি, সমান দরদ দিয়েই এঁকেছেন। ভঙ্গুর পারীর সমাজ, ল'াসিয়ে আর বার্টি, মাদো আর লুই, নিভেল আর দ্যুমা

সবাই দরদ দিয়ে আঁকা—সহানুভূতিরও তাতে কমতি নেই। জার্মানীর নবন্যায়-শাসিত সমাজে আছে কেলার, রিক্‌টার, হিল্ডা, গার্ডা—তারাও মানুষ—দুর্বল অসহায় মানুষ, আদর্শ নেই বলেই তারা ঘূর্ণিতে পাক খাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে—নিজেদের দুর্বলতাকে ভাবছে শক্তি। আর আছে সোশালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার মানুষ। সার্জি, ওসীপ, লুকুতিন, হানা, নিনা, ভালিয়া, নাতাশা, লাবাজভ আরো অনেকেই। এরাও মানুষ, দুর্বলতা আছে এদের, আছে নির্বুদ্ধিতা, কেউ বা হয়তো পুরনো দিনেরই ভগ্নাবশেষ। সহানুভূতি দিয়েই তারা আঁকা, আবার ব্যঙ্গের ছুরিও চালানো হয়েছে নিপুণ হাতে। যুদ্ধে ওদের শান্তি চুরমার হয়ে গেল। কত নাতাশা আর ওসীপ ঘর বাঁধার মুখে দুদিকে ছড়িয়ে পড়লো, কত সার্জি প্রাণ দিলে—কিন্তু এক বিরাট সংহতি শক্তি নিয়ে ওরা এগিয়ে গেল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। জনযুদ্ধের এই তো প্রকৃত স্বরূপ। তাই 'ঝড়' শুধু মানুষের খণ্ড চিত্র নয়, মানবতার একখানা সম্পূর্ণ দলিল।

·

যুদ্ধের আগে যেমন শান্তি চেয়েছে মানুষ, যুদ্ধের পরেও সে চাইছে তাই। তারই পত্তনের ভাবনা ভাবছে। প্যাসিফিস্টদের নিষ্ক্রিয় শান্তির কামনা এ নয়, এ এক আত্মার শক্তি—যা ভাঙ্‌চুরের মধ্যে আবার গড়তে পারে। তাই মাদো বলে :—'এস সমাধি ছুঁয়ে শপথ করি, বাধা আসুক, আসুক বিপত্তি, রক্তের স্রোত বিলুপ্ত করে দিক সব, তবু আমরা যতক্ষণ পাহাড়ের চূড়ায় না গিয়ে পৌঁছব, ততক্ষণ পর্যন্ত উঠে যাব। এই শপথই আমরা করছি।'

নিনা জর্জিয়েভনা নতুন কাজের কথা ভাবেন,—'সৈনিকরা তো তাদের কাজ করেছে, এবারে ব্যস্ততা শুরু হবে আমাদের –।'

ওসীপ বলে নাতাশাকে—'এক বছর কি ভোলা যায় ?—কিন্তু আমরা তো আবার মিললাম। এবার তোমার গাছপালা, আর গমের শীষ নিয়ে তুমি কাজ করবে, আমি করব আমার বাড়ী গড়ার কাজ। লারমানতভের সেই কবিতা পড়নি—দুটি মানুষ ভালোবাসলো, মরলো ; আবার পরলোকে তাদের দেখা, —তখন কেউ কাউকে চেনে না।—কিন্তু আমরা তো পরস্পরকে চিনেছি।' আর জার্মানীর ধ্বংস স্তূপের উপর বসে হিল্ডা কি ভাবে ?

'ঝড়ের প্রতীক তো আমি হতে চাই না, আমি চাই সামান্য একটি মেয়ে হতে।'

রিক্‌টারও ভাবে, 'ঝড় নই, আমরা শুধু ঝড়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, তাই যখন ঝড় উঠলো, আমরা তাকে রুখতে পারলাম না। এখন কি হবে? শহরের বদলে এখন তো ধ্বংস স্তূপ। আমি নিজেও তো তাই।'

শান্তির উদ্যোগ পর্বে এসে এরেনবুর্গের 'ঝড়' শেষ হোলো। আবার নতুন পৃথিবী, নতুন সূর্য উঠবে। রাত তাই শিউরে উঠছে, সব কিছু আবছা, হৃদয়ে এখনো আছে ব্যথা, কিন্তু প্রেরণাও আছে। পৃথিবীর রেখাময় অবয়ব ফুটে উঠবে আবার, আবার শান্তির আশীর্বাণীর মতো ছড়িয়ে পড়বে প্রথম সূর্যের আলো।

এরেনবুর্গ এদের কথা বলতে গিয়ে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন। মনোবিকলনের যে-ধারা নাম পুরুষ থেকে উত্তমপুরুষে প্রসৃত প্রবর্তন করেছিলেন, (যেমন কারও ভাবনার কথা বলতে বলতে তার মুখ দিয়ে বলানো)। যাকে জ্যুল রোমাঁ প্রভৃতি রূপ দিয়েছেন তাকে বাস্তবতার খাতে বইয়ে দিয়েছেন তিনি। সে নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে, সার্থক হয়েছে। প্রসৃতের আঙ্গিকের উপর এ এক নূতনতর শ্রীবৃদ্ধি—বুঝি বা একেবারে নূতন প্রকাশই।

তাঁর এই গভীর বাস্তবতা বোধ, এই অনন্য শিল্প-কৌশলের পিছনে রয়েছে অভিজ্ঞতা আর সাধনা। এই অভিজ্ঞতা তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে, তাঁর লেখনীকে ব্যাপৃত করে রাখছে। আর তারই ফলে দেখা দিয়েছে এক বিরাট প্রতিভা—যে প্রতিভা বিরাট মহীরুহের মতো শুধু বেড়েই চলেছে—এখনো তার বৃদ্ধি থামেনি—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এমনি বেড়েই সে চলবে।

এই প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে খ্যাতনামা সোভিয়েৎ ঔপন্যাসিক, ফেদিন। তারই চুম্বকটুকু এখানে তুলে দেওয়া হোলো:—

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই এরেনবুর্গ লিখছেন। তখন তিনি কবি। তারপর মহাযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেল, কবি আর শিল্পীরা তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, হতাশা এসে দেখা দিল। এরেনবুর্গও তাঁর প্রাপ্য অংশটুকু পেলেন, অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো তাঁর লেখায়। তিনি জানালেন, বুর্জোয়া সমাজের আশা নেই, তিনি দেখলেন মুমূর্ষু পাশ্চাত্য ধনিক সভ্যতাকে। আশার ক্ষীণ রেশটুকু তখন কোথায়?

তাঁর প্রতিভা ব্যঙ্গে ঝলসে উঠল:—'এক মহা মোহময় যুগ—যখন মানুষ,

তামাক বলে বাঁধা কপির পাতাকে ভুল করে ;—এরুহেনবুর্গের বইগুলির নাম দেয় 'সুষ্ঠু' সাহিত্য'—এই ব্যঙ্গের পিছনে ছিল এক বিরাট প্রস্তুতির তোড়জোড় —শুধু বুর্জোয়া সমাজকে ধিক্কার দিলেই হবে না, নতুন সাহিত্যও গড়তে হবে। তারই বীজ পড়লো ; তিনি বুর্জোয়া সমাজকে যেন কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করালেন ; আর চললো নতুনের সন্ধান। তারপর একদিন এই ব্যঙ্গময়তা, এই নেতিবাদ গঠনশক্তি হিসাবে দেখা দিল। তিনি সমগ্র মানুষ জাতিকে জানতে চাইলেন, যোগাযোগের সূত্র ধরে ধরে ব্যক্তি থেকে সমগ্র মানবতার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি যে সমস্যা তুলে ধরলেন, সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের সমস্যা। তা কি হবে ?

প্রথম যুগে এর উত্তর ছিল নেতিবাদমূলক। কিন্তু মানুষকে বিমূর্ত ভাবেন নি বলেই, নেতিবাদ আর নিরাশার ছায়া তাঁর বইয়ের পাতা থেকে ক্রমে সরে সরে গেল, সূর্য আকাশে উঠলে এমনি সরে সরে যায় ছায়া। এর মূলে ছিল বিপ্লবের প্রতি, তার সংগঠনী শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি প্রশ্ন করলেন, মানুষের ভবিষ্যৎ কি ? বিপ্লবের বিজয় কি সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে ? বিজয়ীরা গডবেন কেমন পৃথিবী ? সে পৃথিবী কি সুখময় হবে ?

এরুহেনবুর্গ খুঁজতে লাগলেন এই প্রশ্নগুলির উত্তর।

উত্তর মিলে গেল একদিন, এই শতকের তৃতীয় পাদে। তখন সন্দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

সোবিয়েৎ ভূমির 'পাঁচ শালা প্ল্যান' তখন নতুন পৃথিবীর প্রতীক, আর নিজের দেশে সে শ্রমের জয় ঘোষণা করছে।

তিনি এবার উপলব্ধি করলেন যে, মনের যে-মহতি শক্তি প্রতিরোধ-প্রাকারে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়, সেই-ই আবার সংগঠনী প্রচেষ্টায় তাকে প্রেরণা জোগায় , আরো বুঝতে পারলেন, যাকে শিল্পী মানুষের পরম আশীর্বাদ বলে জানেন, সেই সুখ আর শান্তি রচিত হচ্ছে তাঁরই দেশে। বিপ্লব যে অন্যায়ের প্রাকারকে ধসিয়ে দিয়েছে, তারই উপর আর এক জীবনকে এনে প্রতিষ্ঠা করেছে। এ জীবন মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুষ্ঠু, সুন্দর করে তুলবে, সামঞ্জস্য বিধান করবে। সমাজ-জীবনও হবে সুন্দর, সুসমঞ্জস।

শিল্পী এতদিন নতুন জীবনের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে পারেন নি

ভালো করে। এবার তা পারলেন, তিনি বুঝলেন—হাঁ, বিপ্লবের আর এক অভিধা সৃষ্টি। তাঁর বইয়ের পর বইয়ে বিপ্লবের এই ধারার পরিচয়ই তিনি দিলেন।

আজ এহ্‌রেনবুর্গের বয়েস ষাট বছর। তিনি এক দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছেন, এ পথ পার হওয়া সহজ নয়। এর বাঁকে বাঁকে আছে বিশ্বাস, আছে ন্যায়, আছে মহত্ব।—এখনো এ পথ ফুরোয় নি—তিনি এগিয়েই চলেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁর মনে সন্দেহ আর অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। সমন্বয় আর হবে না—এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। আজ আর তা নেই। আজ তাঁর মন এক অমোঘ বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত—আর তাঁর প্রতিভা আজ সেই বিশ্বাসে শিকড় চালিয়ে দিয়েই বিরাট মহীরুহে পরিণত। এই তাঁর পরিচয়, এহ্‌রেনবুর্গের পরিচয়।

এদিকে আর এক ঝড়ের মেঘ দেখা দিয়েছে, হাওয়াও উঠছে। খণ্ড ছিন্ন জার্মানীর ক্ষত শুকোয়নি, সেখানে মহড়া চলছে যুদ্ধের। ইঙ্গ-মার্কিন জোট জাতি সংঘের নামের আড়ালে কোরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূর্ণ করবার জন্য আসরে নেমেছে। তারা হুমকি দিচ্ছে, আনবিক বোমা দোলাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ তাদের আত্মার শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে যুদ্ধকে বাধা দিতে। আর ঝড়ের ভাষ্যকার তাদেরই অগ্রণী। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে:

'ওরা বোমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দোলাচ্ছে বোমা—নগর আর দেশগুলিকে ধ্বংস করবার আগে ওদের নিরস্ত্র করতে হবে। সারা পৃথিবীর প্রতি দেশের বাছা বাছা নারী আর পুরুষ আজ নিজেদের শান্তির এই সংগ্রামে নিবেদন করেছেন—সবাই শুরু করেছেন শান্তির যুদ্ধ।—স্পষ্ট স্বীকারোক্তিই করছি, এমন মুহূর্ত আসে যখন উপন্যাসের যে পাতাটা লিখতে শুরু করেছি, তা ফেলে রেখে উঠে আসা কঠিন, তবু তা করতে হয়, উপন্যাস ছেড়ে লিখতে হয় দশম কি একশততম প্রবন্ধ। মানুষের যা কর্তব্য, একজন লেখক কি তা অস্বীকার করতে পারেন?'

তিনি শান্তির সংগ্রামের এই দায়ীত্ব অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে লেখকদের দায়ীত্ববোধও তাঁর জাগ্রত। খবর এসেছে, তিনি ঝড়ের

অনুসঙ্গী একখানা উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর ষষ্টিতম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে সেদিন। সেখানে তিনি বলেছেন :—

'লেখকের বার্ধক্য বলে কিছু নেই—যে ভাবাবেগ অবর্ণিত রয়ে গেছে, যে বই লেখা হয়নি, তার জন্যেই তো লেখক বেঁচে আছেন। যতক্ষণ না লেখার প্যাডখানা থেকে তাকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তো তরুণ। আর মানুষের তো সে সাধ্য নেই। একমাত্র মৃত্যুই তা পারে। একথা বলছি শুধু এই জন্যেই যে, আমি লিখতে চাই, মৃত্যু পর্যন্ত আমি লিখে যেতে চাই।'

এই চির-তরুণ লেখকের কামনা সফল হোক।

# এক

স্ভেৎসেভ ভদ্রলোককে বললেন,

"সার্জি পেত্রোভিচ্, আপনার কাজের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই, তবু রোস্ আইনের ব্যাপারটায় আপনি হাত দিলে খুশি হতাম। লাঁসিয়ের সঙ্গে কথা বলাও দরকার। কেমন যেন বেখাপ্পাই ঠেকছে। প্রথমে খুব তাড়াহুড়ো দেখিয়েছিল, এখন দেখছি ঝিমিয়ে গেছে।"

ভদ্রলোক নতুন লোক—সবে চার মাস হোল পারীতে এসেছে, তবে ফরাসী ভাষায় একেবারে চোস্ত। তার সহকর্মীরা যখন তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে অবাক হয়ে যায়, সে হেসে বলে, 'আমি তো পারীরই মানুষ।'…তার বাবা-মা পারীতে বহুদিন ছিলেন, ওখানেই তাঁদের বিয়ে হয়, বিপ্লবের পরে তাঁরা ফিরে যান মস্কোতে। শেরিয়োজার বয়স তখন সাত বছর।

নিনা অজিয়েভ্না ছেলে যাতে ফরাসী ভাষা না ভুলে যায়, তাই ওর সঙ্গে ফরাসীতেই হামেশা কথাবার্তা বলতেন। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর প্রথম সন্তান হবে কবি। সার্জি বহু বিষয়েই উৎসাহ দেখালে—ভ্রমণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, থিয়েটার, কোনো-কিছুই বাদ গেল না—কিন্তু কবিতা সে লেখেনি। কবি-ভাবটুকু তার বজায় ছিল, তাই নিজের কাজ সে বেশ উৎসাহ নিয়েই করেছে, সব কিছুতেই পড়েছে তার দুর্লভ প্রভাবের ছাপ। বন্ধুত্বে যেমন সে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, আবার ঝগড়ায়ও তার ঝাঁঝ কম দেখা যায়নি—অন্যের চোখে যা এড়িয়ে যায় এমন সূক্ষ্ম জিনিষ নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে; আবার অন্যের চোখে যা স্বাভাবিক, তারই বিরুদ্ধে চালিযেছে প্রতিবাদ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার ছিল না, নিজেকে বিশিষ্ট করে লোকের চোখের সুমুখে দেখাতে চায়নি। কিন্তু সে যা কিছু করেছে, তাতেই পড়েছে বিশিষ্টতার ছাপ। যে-কোনো পরিবেশেই সে হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট, পাঁচজনের একজন। যখন সে ছেলেমানুষ নিনা অজিয়েভ্না ঠাট্টা করে ওকে 'আমার খুদে ফরাসী মানুষটি' বলে ডাকতেন। নিশ্চয়ই তাকে দেখে ওর মার মনে পড়ত পারীর কথা—যৌবন তাঁর সেখানে কেটেছিল। কিন্তু ফরাসীদের বাইরের উদ্দাম আর উজ্জ্বল

আবরণের নিচে যে প্রশান্তি লুকিয়ে আছে, সার্জির তো তা ছিল না। প্রায়ই সে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বসত। মধ্যপথ তার জন্ম নয়—সে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে যেত—এই অপরিণাম-দর্শিতার জন্ম ভৎর্সনাও সে পেত; কিন্তু ভুল সে ভুলে যেত না, তাকে সে হুল ফোটাত, নিজের ভুলের জন্ম সে কখনো ওজুহাত খোঁজেনি। এখন তার আটাশ বছর বয়েস। এখনো কৈশোরের সরলতা আর অসঙ্গত আবদারের ঝোঁক তার যায়নি।

তার জীবনের রোমান্সের সঙ্গে যৌথকরণের যুগ মিশে আছে। সে তখন একমাথা ঝাঁকড়া-চুলওলা তরুণ কমিউনিষ্ট। ইউক্রাউনে তাকে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে তর্ক-বিতর্কে গলা গিছলো ভেঙে, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় চলতে হোত, অথচ মন তখন অযুত-নিযুতের কথা ভাবছে। এদিকে সিকি পাউণ্ড রুটির বরাদ্দ, নিঃশব্দে তাই ভাগবাটোয়ারা করে খেতে হচ্ছে। এমনি তখন অবস্থা। তার কনুইয়ের উপরে ক্ষতচিহ্নটি সেদিনকারই উপহার—সেই হেমন্ত রাতের স্মৃতি—তাকে গুলী করেছিল কারা। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি। সেখানেও শান্তি নেই, নেই বিশ্রাম। ছুটেই সে চলেছে—সেখান থেকেই সোজাসুজি কুজনেস্ক-এ পাঠানো হোল তাকে—এক খাতের ভিতরে সুরু হোল জীবন—কাদায় কোমর অবধি ডুবিয়ে খাত খোঁড়া, উকুনের উপদ্রব। মৃতের মতো স্বপ্নহীন ঘুম, স্বপ্নের মতো জাগরণ—দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, বিচিত্র দুঃখের স্বাদ, তারপরে স্তূপের ভেতর থেকে জাগলো শহর—শহর তো নয় যেন ঝলমলে কুঞ্জবন।

সার্জির কাছে একখানা ফটো ছিল—সযত্নেই সে রেখেছিল—একটি ছোট্ট মেয়ে, মোটা বিনুনিটা মাথার চারদিকে ঘিরে আছে। কোমল তার চোখ—কিন্তু তুর্গেনিভের নায়িকাদের মতোই সে দৃষ্টি তীব্র হতে জানে, বুঝিবা সোফিয়া পেরোভস্কায়ার বন্ধুর মতোই। ছবিটি নিনা জর্জিয়েভ্নার, যখন জেল থেকে বেরিয়েছিলেন তখনকার ছবি। গোপন আন্দোলনের সাহসিকা তিনি, নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এই ব্রতে। কিন্তু পরবর্তী জীবনে রুগ্ন স্বামী আর সন্তান-সন্ততির বোঝা তাঁর কাঁধে এসেই চাপলো। তাঁর স্বামী ছিলেন একাউণ্টাণ্ট, সংখ্যা নিয়েই তাঁর কারবার। জীবন তাঁর কাছে এক সুসমঞ্জস প্রাকার, তাঁর উঁচু আদর্শের সঙ্গে হঠাৎ কোনো ব্যাপার খাপ না খেলে, তিনি যেন নিভে যেতেন। বিড়বিড় করে বলতেন, "কাপড় ছাঁটলাম,

আমরা যথাসাধ্য করলাম, কিন্তু দেখ, দেখ, আমাদের ছোকরাদের দরজিগিরি দেখ! এগুলো এখন বাতিল করে দাও! এগুলো তো এখন নষ্ট মালের বাজারের সামগ্রী।" ...পনেরো বছর আগে তিনি মারা যান যক্ষ্মায়। তারপর নিনা জর্জিয়েভ্‌নাকে সন্তানদের ভালোভাবে প্রতিপালন করতে খুব খাটতে হয়েছে। ভাসিয়া ছোট ছেলে—তার বয়স তখন এগারো আর ওলগার ছ-বছর। নিনা এক স্কুলে আর কোনো এক প্রতিষ্ঠানে ফরাসী শেখাতেন, রাতে বসে করতেন অনুবাদ।

নাটকীয় জীবন তাঁর নয়, স্বামীর সঙ্গে বেশ সদ্ভাবই ছিল, তাকে ভালবাসতেন নিনা—কিন্তু জীবনে সন্তুষ্ট হননি। তাই আজ তাঁর তিপান্ন বছর বয়সেও তিনি ভাবুক—স্বপ্ন দেখেন। সার্জি শুধু তাঁর ছেলে নয়, সে তাঁর বন্ধু। তার সঙ্গে নিনা নানাবিষয়ে খোলাখুলিভাবে বহুক্ষণ ধরে কথা বলেন। ভাসিয়া যেন বড় বেশী ভোঁতা, আর মেয়েকে নিয়েও ভয়, সব কিছুতেই চুলচেরা বিচার করতে বসে। সার্জিই একমাত্র তার গোপন ভাবালুতার প্রতীক, যেন এক শরীরী আবির্ভাব। স্বামীকে নিয়ে কোনোদিন ঈর্ষায় ভুগতে হয়নি, কিন্তু সার্জির সম্বন্ধে ভাবতে গিয়েই তিনি শিউরে উঠেন, ও যদি কোনো চপল মেয়েকে ভালোবেসে বসে, আর মার প্রতি উদাসীন হয়! যখন ছেলের মোহ ঝড়ের মতোই বিক্ষুব্ধ না হয়ে উবে যায়, তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

যখন তিনি শুনলেন সার্জিকে পারীতে পাঠানো হচ্ছে, তিনি ভয় পেলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো যেখানে কাটিয়েছেন, সেই শহর দেখবে তাঁর ছেলে, ভালোই তো! এতে তাঁরা আরো ঘনিষ্ঠ হবেন। কিন্তু পারী সম্বন্ধে যে রয়েছে তাঁর ঈর্ষা—তাও আবছা—কোনো রূপই সে নেয়নি। বিদায় দিতে গিয়ে তিনি বললেন, "মন্ত্‌সুরিতে গিয়ে পুকুরের ধারের বেঞ্চিটা দেখে এসো, সারের দু'নম্বরের বেঞ্চটা, একটা প্লেন গাছের নিচে পাতা। তোমার বাবা আর আমি পরিচয়ের পরে ওখানে গিয়েই বসতাম।" সার্জি মনে মনে হেসে ভাবলে, "মা ভুলে গেছেন যে, তারপর তিরিশ বছর পেরিয়ে গেছে...।"

পারীতে পৌঁছে সে অবাক হয়ে গেল: তার মা যে শহরের কথা বলেছেন, এ তো সেই শহরই বটে!...সে-বেঞ্চটাও যে তেমনি আছে—এ সম্বন্ধেও সে

নিঃসন্দেহ।...তার এই ছোট্ট জীবনে সে কত সয়েছে, কত কিছুর ভিতর দিয়ে সে এসেছে—তাতে সে তো স্থিতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতে পারে না। বিরাম সেখানে নেই। সে তো বেশি দিনের কথা নয়, বড় বড় সব বাড়ি গোর্কী ষ্ট্রীটের এখান থেকে ওখানে সরানো হোল। আর এখানে যেন মানুষকেও তার পুরনো কোঠা থেকে সরানো যাবে না। একশো বছরের বুড়ীরা শোবার ঘরে ঘোরবার চটি পরে তেমনি বেঞ্চে বসে আছে। ঐ যে ভদ্রলোকটি, চোখে মনোকল্, উনি তো মোপাসাঁর গল্পের মানুষ!...সবই যেন বহুপরিচিত, তাই বুঝি অবাস্তবও।

মস্কোর কঠোর জীবনের পর সে এল পারীতে। চুলে পাক ধরেছে, একটু কেমন একগুঁয়ে সে, তাই মনও তার অবিশ্বাসী। মস্কো এখন জীবন কাটাচ্ছে আসন্ন ঝড়ের চেতনায়, কিন্তু পারীর প্রতিবেশী মাদ্রিদের দুঃখে ভ্রূক্ষেপও নেই। এই তো সেদিনের কথা। তুষার-ঝরা সন্ধ্যায় পুশকিন স্কোয়ারে টাঙানো স্পেনের মানচিত্রের সমুখে ভিড় জমে গেলো, নিঃশব্দ ভিড়। তাদের নিঃশ্বাসে ঝরে পড়ছিল আশঙ্কা, ক্রোধ আর বিশ্বাস। একটার পর একটা চাঞ্চল্যকর মামলা এল গেল : শুরু হোল বিশ্বাসঘাতকতার বিচার। সেই আদালতের মামলার বিবরণীর সঙ্গে সঙ্গে মিশে গেল জার্মানবাহিনীর পদধ্বনি ; বার্সেলোনার কান্না উঠলো, গোপন চুক্তি আর সামরিক চাল চালা হোল। তারপর মিউনিক...তখন মস্কোর মানুষরা আশঙ্কায় উত্তেজনায় দিন গুনছে, শেষ অঙ্ক এসেছে ; তুঙ্গে তখন ঘটনা। মস্কোর সেই উত্তেজনা আর উদ্বিগ্ন রাত্রের পরে সাজি এখানে দেখলো আর এক জীবন। এ যেন মেলার সেই প্রমোদের চক্রযান—ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে, জ্বলছে, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। মাথা ঘুরে যায় আর কি! শহর যেন এক বিবাহ-উৎসব মুখর বাড়ি। মানুষ জানে না, তাদেরই জানালার বাইরে ওৎ পেতে আছে মৃত্যু। ছিপ ফেলে ওরা সিনের পাড়ে বসে ঝিমোচ্ছে, হোরেসের কাব্য-প্রিয়রা পুরনো বইয়ের দোকানের তাক ঘাঁটছে আর হাঁচছে, পথের গাইয়েরা মোড়ে মোড়ে গাইছে কিকির প্রেমের গান : কিকি, অতুলনীয়া কিকি—পোষও সে নাকি মানে। একটু থামো তো সাজি! একি সত্য যে ১৯৩৯ সাল এসে গেল, ধ্বংসস্তূপ আর কবরখানা কি পিরেনিসের ওপারে ছড়িয়ে পড়লো, অভিশপ্ত প্রাহা কি আর্তচিৎকারে ডাকলো তার বন্ধুদের, রাইনের পাড়ে

পাড়ে কি কামান পাতা হোল ; বোধ হয়, পারী তার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, হয়তো ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গেছে, হয়তো বহুদিন দেওয়াল-পঞ্জীর পাতা ছিঁড়তে ভুলে গেছে ? এখুনি হয়তো লম্বা চুলওলা একজন বক্তা বেরিয়ে আসবেন পাশের কাফে থেকে, কাব্য-বিলাসীদের জড়ো করবেন, জড়ো করবেন নীল কোর্ত্তাপরা ফোবুর স্যাত-আঁতোয়ানের শ্রমিকদের—তাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতীক বৃক্ষ-রোপনের আবেদন জানাবেন ! হিটলার তাদের কাছে কিছুই নয়, বেকার ব্যঙ্গচিত্রকরদের উদ্ভট কল্পনা মাত্র।

সার্জি তাকালো চারদিকে···এই ঢিলেঢালা জীবনের স্তরে সে বিষণ্ণতা খুঁজে পেল : শহরের এই উদ্দাম আনন্দে বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে। হাসি ঠাট্টা, এমন কি প্রেমিক-প্রেমিকার ফিসফিসানিতে এক যাত্রার প্রস্তুতির সাড়া। কোথায় এ যাত্রা ঈশ্বর জানেন ! অস্থির হয়ে ঝিমুচ্ছে পারী—ঘুমানো তার চাইই—তারপর যা হয় হোক না !

শহর তাকে নতুন করে আকর্ষণ করলো, তীব্র সে আকর্ষণ—সিনকে তার ভালো লাগলো, ভালোবেসে ফেলল। সিনের রূপ নেই, নেই চঞ্চলতা—আছে বুঝি বিস্ময়। সে ভালোবাসলো পারীর ফুটপাথ—কখনো বা ধূসর নীল, কখনো বা বেগ্‌নী ; বৃষ্টি-ধোয়া পথ, ঝাঁকে ঝাঁকে চঞ্চল আলো এসে পড়ছে তার উপর—তার পরে সরু রাস্তার সার—কেমন ঠাণ্ডা—সমুদ্রের স্বাদ তার হাওয়ায়, কেমন বন্য যেন। সে ভালোবাসলো পারীর অজস্র ফুল আর পুঁতির মালা, তার চোখের জল, জনতার হৈ-হল্লা, আমোদ-প্রমোদ ! ওরা মৃত্যুর সুমুখে দাঁড়িয়েও ঠাট্টা-তামাসা করতে জানে। যে চোখ-ধাঁধানো সুন্দরীকে দেশবিদেশের পর্যটকরা দিনরাত দেখে বেড়ায় তাকে সে ভালোবাসেনি, সে ভালোবাসলো ধূসর পারী—প্রাত্যহিকতায় ম্লান আর সাধারণ পারী—অথচ সে পারী অতুলনীয়া।

অবসর তার প্রচুর, তাই ঘুরে বেড়াতে লাগলো শহরে। কাজে তাকে নানা কারখানায় যেতে হোল। সেখানে বিচিত্র মানুষের মেলা। সে তাদের সঙ্গে মিশে গেল, তাদের স্বরূপ চিনলো। পারীর ভদ্র সমাজ-জীবনের এ আর এক দিক। সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো ; তার ভাগ্য ভিন্ন আর এক জীবন-ধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা। সে তার সম্বন্ধে সচেতন, তার সেই ভাগ্যের কথা, সে জীবনের কথা এদের কাছে অজ্ঞাত, অবোধ্য। গত কয়েক

বছরের জীবন তার হঠাৎ-উচ্ছলতাকে শান্ত করে এনেছে, কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে সে। এখানে যাদের সঙ্গে তাকে মিশতে হোলো তারা শুধু অপরিচিতই নয়, তারা বিরূপও বটে। নিনা জর্জিয়েভ্‌নাকে সে লিখল: "তুমি বিশ্বাস করবে না মা, আমি রীতিমতো রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠেছি! যখন কানে আর চোয়ালে ঘুষি মারবার কথা, তখন মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখেছি, যাদের ফাঁসি লটকানো উচিত, তাদেরই স্বাস্থ্য পান করছি। এখানে বহু জিনিষ পচে গলে গেছে, কিন্তু তবু এ এক আজব শহর। আর মানুষ-গুলোকেও আমার ভালো লেগেছে।......"

গোটা পঞ্চাশ বয়েস হবে এমনি একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন সার্জির অফিসে। সুশ্রী—মুখখানা একটু বেশি গোলগাল, পুরনো দিনের অভিনেতার আদল আসে। লাঁসিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে তারপর অপ্রতিভ হাসি হাসলেন:

"রাগ করবেন না! রোস্ আইনেকে ঢেলে সাজতে হচ্ছে···যাতে সব ঠিক হয়ে যায় তার ত্রুটি করছি না।"

দুদিন পরে আবার দেখা। লাঁসিয়ে বৈঠক বসবার আগে দুপুরের ভোজ বেশ সুষ্ঠু ভাবেই সমাধা করেছেন, এক বোতল বার্গাণ্ডিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ তিনি স্মৃতি রোমন্থন শুরু করলেন।

"আমার কলেজ-জীবনে দেশছাড়া রুষদের সঙ্গে দেখা হোত, চমৎকার লোক সব! একবার ওদের এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিল। মঁসিয়ে লুনাচারস্কিও ছিলেন, আর ছিলেন এক ভাস্কর, নামটা উচ্চারণ করাই শক্ত···"

সার্জি কথাবার্তার মোড় ব্যবসায়ের দিকেই ঘোরাতে চাইল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। লাঁসিয়ে ক্ষুব্ধ হলেন:

"আপনি আমাকে ব্যবসাদার ভাবছেন, তাই না? কিন্তু এ একটা অতি আকস্মিক ব্যাপার—যৌবনের হঠকারিতার পরিণত ফল আর কি! জানেন, আমি কবি হবার স্বপ্ন দেখতাম, কবিতা লিখতাম, তারপর একদিন···"

সার্জি ভ্রূ কোঁচকালো। লাঁসিয়ে বিড় বিড় করে বললেন,

"ক্ষমা করবেন, আমাদের বিষয় থেকে দূরে চলে যাচ্ছি।"

সার্জি এবার হাসল, বন্ধুত্বের এ হাসি।

"কবিতা আপনি ভালোবাসেন মঁসিয়ে? শুনে ভারি ভালো লাগলো।

ফরাসী কাব্যের সঙ্গে যার পরিচয় আছে এমন এক জনের সঙ্গে আলাপ করার কথা একদিন ভাবতাম বই কি!"

তারপরে আর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হোল না! মঁসিয়ে ভলাকভ বেস্পতিবারে নিশ্চয়ই আসবেন—কয়েকজন শিল্পীও আসবেন—কিন্তু আজকের দিনে শিল্পী কি আর আছে···এমন যুগে আমরা আছি···তাছাড়া লাঁসিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে রুষ অতিথির পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে খুশিই হবেন।

"আমাদের পরস্পরকে জানতে হবে ভালো করে: এখন তো আমাদের এই দুই জাতি মৈত্রীর বন্ধনে প্রায় বাঁধা পড়েছে। আমার অংশীদারও অর্ধেক রুষ, অর্ধেক ফরাসী। এখন সে পুরো ফরাসী বনে গেছে কিন্তু জন্মেছে কিয়েভ-এ। ওর নাম লিও আলপের্ত, খুব মাথাওলা ইঞ্জিনিয়ার মঁসিয়ে। বিপ্লবের আগে আপনাদের দেশ থেকে আসে, তখন ও ছেলেমানুষ, কিন্তু এখনো রুষ ভাষা ভোলেনি। ইস, দেখুন তো, এই সময়েই ও গেছে পারীর বাইরে! আমার এই ফার্ম আজ আট বছর ধরে রুষদের সঙ্গে ব্যবসা করছে, কিন্তু কোনো পক্ষ থেকেই কোনো অভিযোগ ওঠেনি। মসিয়ে পেত্রেঙ্কো প্রায়ই আমার বাড়িতে আসতেন। এখন তিনি মস্কোতে, সম্ভবত বলছিলেন, বড় চাকরীই নাকি তিনি পেয়েছেন। আর আমাকে একটা হপ্তা সময় দিন—একটু বিলি-ব্যবস্থা করে নিই···"

মরিস লাঁসিয়ে তথাকথিত 'সারা পারী'র জীবন্ত প্রতীক। রোস্ আইনের নাম ক'জন শুনেছে, কিন্তু লাঁসিয়েকে চেনে সবাই—থিয়েটারের প্রথম রজনী তাঁর বাদ যায় না, কোনো শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধনী-দিবসেও তিনি অগ্রণী। শিল্পকে তিনি পূজা করেন, তাঁর শহরতলীর বাড়ি করবেইয়ে তো এক মফস্বলের যাদুঘর—নিগ্রো দেবদেবীর মূর্তি, পুরনো পিস্তল, আর একটা টুকিটাকি জিনিষ রাখবার আলমারী পুরনো চিনে মাটির জিনিষে ভর্তি। লাঁসিয়ে জাঁকজমক করেই থাকেন···তিনি করবেইয়েতে প্রায়ই নৈশভোজের আমন্ত্রণও জানান। স্নিগ্ধ মোমের আলোয় ভোজ বসে। সুররিয়ালিষ্ট চিত্রী, অধ্যাপক, এমন কি একজন সিনেটরও তাঁর অতিথি হন। লাঁসিয়ে গ্রাম্য জীবনের সৌন্দর্যের কথা বলতে ভালোবাসেন, কিন্তু নিজে গ্রামের নির্জনতায় হাঁফিয়ে ওঠেন—একঘেয়ে বলেই মনে হয়—শহরের আলো, বন্ধু আর তর্ক-বিতর্কের

আবহাওয়া কামনা করেন। আশী কিলো তাঁর দেহের ওজন, কিন্তু পরিবারের ডাক্তার মোরিলো তাঁকে 'দ্বিপদ প্রজাপতি' বলেই ডাকেন।

এক নগণ্য মফস্বলের পোষাক-বিক্রেতার ছেলে, মরিস লাঁসিয়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে পারীতে এসেছিল যৌবনে। তার বাবা চেয়েছিলেন তাকে পৃথিবীতে দশের একজন করতে। মরিস তাই ঢুকলো পলিটেকনিক স্কুলে, কোন রকমে পরীক্ষায় পাশও করলো, বাকি সময়টা উৎসর্গ করল কবিতায়। সে একটা চওড়া কানাওলা টুপি কিনে ফেলল, গলাবন্ধ সে ব্যবহারই করত না, একখানা তুর্কী স্কার্ফ জড়িয়ে নিল গলায়। তার বাবা পোশাকের জন্য যে টাকা পাঠাতেন, সে তাই দিয়ে প্রথম সংখ্যা ( সেইটিই শেষ ) লা ব্রফল্‌দ'র্মে নামে এক পত্রিকা বার করল, তার কবিতা ছাড়া সে সংখ্যায় ছিল একজন য়্যানার্কিষ্টের লেখা এক প্রবন্ধ—সে পরে তুলো আমদানির ব্যবসায় ফেঁপে ওঠে। তরুণীদের মরিসকে তখন ভালো লাগত, কিন্তু সে ছিল অতি মাত্রায় লাজুক, তাই কবিতা আর দু একটা চোরা চুমু ছাড়া বেশি দূর এগোয় নি।

মাদাম লেফো শিল্পকলার একজন মুরুব্বী বলে খ্যাত, তাঁরই অনুষ্ঠিত এক বলনাচের আসরে মরিসের সঙ্গে রোস্ কারখানার মালিকের মেয়ের পরিচয়। মার্সেলিন সুশ্রী একথা বলা চলে না বটে, কিন্তু তার ছিল ব্যক্তিত্ব, আর কেমন এক সহজ ভাব। তার বাবার পরিচিত আর আত্মীয়দের সে ঘৃণা করত, নিজের সমবয়েসীদেরও রেহাই দিতনা—কারণ তারা টাকার পুজো করে। সে থাকত একা, তার নিজের কল্পনার জগতে। লাঁসিয়ে তাকে অভিভূত করে দিল। তার কল্পনা, সে যতই অগভীর হোক, তার আবেগ ছিল বলেই মার্সেলিন মুগ্ধ হোল, তার কাব্যপ্রীতি আর নিঃস্বার্থ পূজা তাকে দোলা দিল: সে ভালো বাসলো। রোস্ কিন্তু বিয়ের ঘোর বিপক্ষে গেলেন, ভৎসনা আর গালাগাল দিয়েই ক্ষান্ত না হয়ে তিনি তার মেয়েকে শহরতলীর বাড়িতে আটক রাখলেন। মার্সেলিন তার ক'দিন পরে এক রাতে মরিসের ঘরে এসে হাজির, মাথায় তার টুপি নেই, চুল এলোমেলো, পরনে অঙ্গের ঢিলে পোষাক। মরিস খুশি তো হলই, আবার ভয়ও পেল। সে চুমু খেল; তার চুমুর ফাঁকে ফাঁকে সে জানাল, মার্সেলিন তার বাপ মার কাছে ফিরে যাক্; পেড়াপীড়িই সে করল—

ভাবপ্রবণ হলেও সে ছিল বড় দুর্বল। মার্সেলিন তার কথা শোনে নি। সে-ই সব ঠিক করল। পোঁটলাকটা একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে সে রয়ে গেল। পরদিন ভোরে উঠেই সে ছুটলো দুধ আর রুটির খোঁজে—যেন সারা জীবন ধরে এই-ই করছে, এমনি তার ভাবখানা। শেষে রোস্‌কেই রাজি হতে হোল। তাঁর একমাত্র মেয়ে, তাছাড়া তাঁর স্ত্রী যখন জানালেন, শীগগিরই তিনি দাদু হবেন, বুড়ো নরম হলেন, হতচ্ছাড়া মরিসের সঙ্গে আপোস করে ফেললেন।

পলিটেক্‌নিক্‌ স্কুল থেকে বেরিয়ে লাঁসিয়ে তার শ্বশুরের কারখানায় কাজে লেগে গেল। কবিতা লেখা তখন বন্ধ হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে ব্যবসাও সে বুঝে ফেলল। এক বছর পরে বাঁধলো যুদ্ধ। লাঁসিয়ে নিজেকে দুর্বল বলেই ভাবতেন। শ্বশুর, খদ্দের আর গুজব—এই তিনকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু সৈনিক হিসাবে তিনি উৎরে গেলেন, পেলেন ক্রোয়া দ্য গেয়ার ক্রুশ। যুদ্ধ তাঁর মনে জেগে রইল মহান এক স্মৃতি হয়ে ; তিনি কাদা, উকুন, জার্মান মারণাস্ত্রের গর্জনই শুধু ভুলে গেলেন না, এমন কি সাথীদের মৃত্যুও তাঁর মন থেকে মুছে ফেললেন। রইল শুধু সেই মহান মুহূর্তগুলি, যখন তাঁর রেজিমেণ্ট লিলে ঢুকলো···মেয়েরা ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল সৈনিকদের গায়ে, চুমু খাচ্ছিল ; লা প্রেস্‌ বীর সার্জেণ্ট মসিয়ে লাঁসিয়ের এক ছবি ছেপেছিল :—আক্রমণের পনেরো মিনিট আগে যুদ্ধক্ষেত্রে বসে তিনি গান গাইছেন—তারই ছবি।···লাঁসিয়ে তারপর থেকেই বিশ্বাস করে এসেছেন, আর যুদ্ধ হবে না—এমনি আরো অনেক বিশ্বাস তাঁর আছে। যেমন তিনি মনে করেন, আজকাল আর কবিতা কেউ লিখতে জানে না, অথবা প্রেমে হাবুডুবু খেতেও মানুষ ভুলে গেছে—তাঁর ধারণা, তাঁর অভিজ্ঞতার আর পুনারাবৃত্তি হবে না, হতে পারে না।

যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই রোস্‌ মারা গেলেন, মরিস হলেন রোস্‌ আইনের মালিক। তিনি এবার স্ত্রী আর সন্তানদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হলেন ; উজ্জ্বল উচ্ছল জীবনের উপর ঝোঁক আর খামখেয়ালীপনা ও রয়ে গেল। কিন্তু রোস্‌ আইনে চলতে লাগল—মেশিন তেমনি সশব্দে চললো, অফিসঘরে বসে কোঁকড়ানো চুল টাইপিষ্ট মেয়েরা চালান নকল করতে লাগলো, খদ্দেররা শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে বলতে লাগলেন : "পুরাতন আর সুপ্রসিদ্ধ এই প্রতিষ্ঠান।"

সংকটের সময় রোস্ আইনে এল দেউলে হবার মুখে, লিও আলপের্ত আমেরিকায় একটা পেটেণ্ট বেচে কিছু টাকা পেয়েছিল তাই দিয়েই বাঁচাল তাঁকে। সে হোল লাঁসিয়ের অংশীদার। ভলাকভের সঙ্গে সাক্ষাতের বেশ কিছু আগে থেকেই আবার সংকট এল—চিনি নর্থ কেস পড়ল, টাকা তলিয়ে গেল। তখন একটা কিছু করা দরকার—হয় মার্সেলিনের জমিদারী গেলিনো বিক্রি করতে হবে, নয় তো কে-এক গ্যাস্টন রয়কে নিতে হবে অংশীদার হিসাবে। লাঁসিয়ে কেঁপে গেলেন; একজন অপরিচিতকে কি করে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে ঠাঁই দেবেন? ব্যাপারটা কি আত্মহত্যার সামিল নয়? কিন্তু অমন অশুভ চিন্তা শীগগিরই তিনি মন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেললেন—নিজেকে শান্ত করবার অভ্যাস তাঁর ছিল। 'আত্মহত্যাই বা কেন?'···পিঠেখানা মস্ত বড়, তিনটে ভাগে কাটলেও টুক্‌রোগুলো বেশ বড়ই থাকবে। আর আলপের্ত তো আমাকে গিলে ফেলেনি, এই রয় লোকটাই বা তা করবে কেন? তাছাড়া আলপের্ত ইঞ্জিনিয়ার, এই রয় তো ব্যবসার কিছুই জানে না··· গেলেনো বেচার কথা ভাবাই যায় না! তাই যাই বল না কেন, জমি হচ্ছে জমি···লোয়ার, আঙুরের ক্ষেত,···আর কি চমৎকার পার্ক। কি পিয়ার ফল! তাছাড়া বেচারী মার্সেলিনের যথাসর্ব্বস্ব লুট করাই হবে · কোনো ব্যাপারেই লাঁসিয়ে বেশীক্ষণ মন বসাতে পারেন না: তাই হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল: "মাদো চমৎকার একখানা দৃশ্যপট এঁকেছে, প্রতিভা আছে বটে! এমন কি সাবাও তাকে তারিফ করেন···। কিন্তু লুইকে নিয়েই আমার ভাবনা,—সে বৈমানিক হবে। এক অদ্ভুত যুগ—আমরা পেগাসাসের পিঠে চড়ে উড়তাম, ওদের ইঞ্জিন না হলে চলে না···জড়বাদীর দল! কিন্তু লুই এখনো বারকয়েক মত বদলাবে···মার্সেলিন বেশ সেরে উঠেছে, ওখানকার জল হাওয়া তাকে ভাল করে তুলেছে ··চমৎকার দেখতে হয়েছে এখন"·· সব অস্বস্তি ভুলে গিয়ে লাঁসিয়ে মৃদু হাসলেন।

পরিবারের কর্ত্তা হিসাবে তিনি দৃষ্টান্তস্থল, মাঝে মাঝে তিনি দু'একটি নারীর মোহজালে বাঁধা পড়েন বটে, সঙ্গে সঙ্গে রাশ টেনে আনেন। তাঁর ভয়, পাছে মার্সেলিন ব্যথা পান, ছেলেমেয়েদের তিনি শ্রদ্ধা করেন—সুশ্রী মাদো—বাপের শিল্পকলার ঝোঁক পুরোমাত্রায় পেয়েছে, আর পেয়েছে

মার একগুঁয়েমি। ছেলে লুই, লম্বা, ঢিলে-ঢালা স্বভাব; উজ্জ্বল স্ফূর্তিবাজ তরুণ, খেলাধুলো ভালবাসে, কোনো বই শেষ পর্য্যন্ত পড়বার ধৈর্য্য তার আজও হোল না।

করবেইয়ের পরিবেশটাই খামখেয়ালী, অতিথি অভ্যাগতদের চোখে তা পড়বেই—কিন্তু তারই আড়ালে আছে এক সাধারণ গার্হস্থ্য জীবন—সুখ আর দুঃখ দুই-ই আছে। মার্সেলিন অনেকদিন থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন—আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছেন, স্বামী যাতে আনন্দ পান, সে তো তাঁর কাছে তুচ্ছ, এমন কি হাসির ব্যাপারও বটে। লুই উৎসাহী তরুণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তার অদম্য—করবেইয়ের পুতুলের স্বর্গে তাই সে খাপ খায় নি। মাদো কল্পলোকের বাসিন্দে, তাই যখন সংসারের খুঁটিনাটি, অসঙ্গতি তার চোখে পড়ে, সে আপন মনে বলে ওঠে: 'যদি এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারতাম, পালিয়ে যেতে পারতাম!'...ভালোবাসা ওদের বেঁধে রেখেছে, অথচ মনের দিক দিয়ে ওরা পরস্পরের অচেনা অ-জানা। তাই খাবার টেবিলে বসে ওরা পরস্পরকে এড়াতে চায়, অতিরিক্ত ভদ্র হযে ওঠে। এ হেন পরিবারকে মরিস লাঁসিয়ে শান্ত স্বভাব, হাসি-খুশি ভাব, আর অফুরন্ত আনন্দ দিয়ে জুড়ে রেখেছেন। হঠাৎ তিনি জ্বলে উঠেন, আবার তাড়াতাড়ি শান্তও হয়ে যান। নিজেই আপন মনে হাসেন আর বলেন: "মাথাটা একটু গরম হয়ে গিছল..."রাজনীতি ঘৃণা করেন, নিজের বাড়িতে বসে তর্ক-বিতর্ক করতে কখনও দেন না, ওতে প্রীতি-সম্মেলনের প্রীতিটুকু নষ্ট হয়। যখন কোনো বন্ধু তাঁর কাছে শ্রেণী, দল আর রাষ্ট্রের চরম সংঘর্ষের কথা বলতে চান, লাঁসিযে তাঁকে বলেন, "সবই সত্যি, কিন্তু ভুলে যাবেন না যে, আমাদের এ দেশ বিচারবুদ্ধির দেশ। এ দেশে পাগলও সঙ্গতি রেখে কথা বলে। আমি আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, এখানকার পাগলরাও দেকার্তের নজির পাড়ে। তাই যে ভয়াবহ পরিণামের ছবি আপনি আঁকছেন, সে পরিণাম আমাদের দেশের হবে না। বিশ্বাস করুন বন্ধু, আমাকে বিশ্বাস করুন..."

ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথাবার্তার পর লাঁসিয়ে ভাবতে বসলেন, "রুষদের এই মালগুলো করে দিতে হবে। রয়কে ঠিক আমি বুঝতে পারছি না... সব কিছু আর দুহপ্তায় একেবারে ঢেলে সাজা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া,

ঐ লোকটাই বা এ ব্যাপারে হাত দেবে কেন ? আমি তো এখনো উত্তর দিই নি। আঃ, আলপের্ত এই সময় রইল বাইরে বসে…! কিন্তু আলপের্ত তো টাকাকড়ির ব্যাপারে কিছু জানে না, সে পাকা ইঞ্জিনিয়ার মাত্র। রয় তো ইঞ্জিনিয়ারও নয়।—কোত্থেকে এল লোকটা ? ওর মুখখানা দেখলেই কেমন সন্দেহ হয়, ভালো লাগে না।—কিন্তু ওর তো মাদোর সঙ্গে বিয়ের কথা হয় নি যে, মুখের চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাব ? এখন মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। রুষ ছোকরাটি বেশ, বলশেভিকরা যে এমন হয় কখনো ভাবিনি—বোধহয়, সব জায়গায়ই মানুষ মানুষ। এই তো, আমি—আমি কি রোস্‌ আইনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিলাম ? উলঙ্গ একজন মানুষকে দেখে কি তার উৎপত্তি, পেশা, কি ভাবধারার কথা জানা যায় ? যুদ্ধের সময়ের কথাই ধর না, আমাদের কোম্পানীতে ইন্দোচীন ব্যাঙ্কের চ্যালেৎ আর জোকে দুজন-ই তো ছিল। বেচারী জোকে যুদ্ধের আগে বুলেভারে সিগারেটের পোড়া টুকরো কুড়িয়ে রুজি-রোজগার করত। কিন্তু কত বন্ধুত্ব ছিল তাদের ! একটা মুহূর্তের জন্য ছাড়াছাড়ি হোত না। তারপরে একজন ফিরে গেল শেয়ার আর পুঁজির জগতে, আর একজন তার পোড়া সিগারেটের টুকরো কুড়োবার মেহনিতে—হাঁ, যুদ্ধে তো মানুষ ভুলে যায় সে কে, কোথা থেকে এসেছে—। রয় আবার আর এক যুদ্ধের কথা কেন বলছে ? লুই বিমান বাহিনীতে ঢুকবে—পাগলামি !—না, না, যুদ্ধ আর হবে না, আর একটা যুদ্ধের ধকল সহ্য করতে জনগণ চাইবে না। তারা শান্তিতে থাকতে চায়। আবার ওরা ঢেলে সাজতে চায় কারখানাটা, কায়দা করে বলা ছাড়া আর কি, তবু সবই সহ্য করতে হবে, ওদের কাছে মাথা নোয়াতে হবে। তাছাড়া উপায় কি ? চুয়ান্ন বছর বয়েস হোল, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রয় আসুক, কারখানার ভার নিক—কিন্তু একটা জিনিষ তো ওরা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না—সে আমার মনের শান্তি।”

## দুই

লাঁসিয়ে ভাবনায় পড়লেন, ভলাকভকে তো ভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন, আর কাকে করা যায়। তিনি নিভেলকে করতে চান—তাতে সন্ধ্যাটি মনোরম হয়ে উঠবে, কবিত্বের একটু ছোঁয়া লাগবে। কিন্তু সংঘর্ষের ভয় আছে, নিভেল জাতীয়তাবাদী, কমিউনিষ্টদের সে দেখতে পারে না—।

রোগা, কামলা-রোগী নিভেল, আত্মসর্বস্বও বটে। তার খাঁটি কবিতার সমজদারদের ছোট্ট গণ্ডিতে সে 'লা মাস্ক দ্য সার্সে'র কবি বলে পরিচিত। পুলিশ দপ্তরের একটা বড় চাকুরীও সে করে; পাসপোর্ট বিভাগের বড়কর্তা যে রাত জেগে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন, ঠোঁট তাঁর নড়তে থাকে, কখনো বা কাগজে কলমের আঁচড় কাটেন—সে সম্বন্ধে তাঁর সহযোগীদের সন্দেহ নেই। পুলিশ বিভাগের এই কাজে নিভেলের বিরক্তি ধরে গেছে, কিন্তু বাঁচবার আর কোনো তার উপায় নেই—তার বই বিক্রি হয় না। আর তার পিসীর কিছু বিষয় সম্পত্তি পাবে বটে, কিন্তু তিনি এই সত্তর বছর বয়সেও বেশ শক্তই আছেন। একদিনের জন্যও ঠাণ্ডা তাঁর লাগে না।

নিভেল যে-কোনো ভোজের টেবিলের শোভা বাড়াবে, কিন্তু লাঁসিয়ে ইতস্ততই করলেন। রাজনীতিই যতো আপদ! এমন কি স্ত্রীর কাছে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন:

"ওদের ভিন্ন ভিন্ন দিনে নিমন্ত্রণ কর।"

কিন্তু লাঁসিয়ে জেদ ধরলেন:

"নিভেল কবি। ঐ রুশ-ছোকরাটি দেখুক আমি দক্ষিণ বা বামপন্থী নই, আমি একজন ফরাসী দেশের সাধারণ মানুষ। বেশ তো, না হয় লেজাঁকে ডাকব। সে তো সেরা কমিউনিষ্ট। আমাদের কারখানায় কে ১৯৩৬ সালে ধর্মঘট চালিয়েছিল আমি কি আর জানি না! কিন্তু লেজাঁ পাকা ইঞ্জিনিয়ার। তার উপরে শিক্ষাদীক্ষাও তার আছে। সবাই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে বলে কি আমিও হারাব? না, না! আমার চুয়ান্ন বছর বয়েস, আমাকে ঢেলে সাজা চলবে না। আর কাকে বলা যায়? অধ্যাপক দ্যুমা। সাবাকে বলতেই হবে। হাঁ, এই ক'জনই যথেষ্ট…হাঁ, হাঁ…আমি অধ্যাপককে কথা

দিয়েছিলাম ওঁর এক অদ্ভুত আবিষ্কারকে একদিন নেমতন্ন করব—দাঁড়াও, ওর নাম যেন কোথায় লিখে রেখেছিলাম···। হাঁ, মাদাম আনা রথ্‌স্‌চেকই হবে।—অথবা হাঙেরীর লোক, কি জানি ঠিক মনে পড়ছে না। স্পেনে লড়েছে মেয়েটি। না, না, ঘাবড়ে যেও না, ভারি চমৎকার মেয়ে! ছ্যমার ওখানে কয়েকবার দেখা হয়েছে। রুশ-ছোকরা ওকে দেখে খুশিই হবে—"

দরজার কাছে গিয়ে লাঁসিয়ে থামলেন।

"তাইতো কমিউনিষ্টদের ভিড় যে বেড়ে গেল।" তিনি হেসে উঠলেন—"দেখেছো মার্সেলিন, ওদের ছোঁয়াচ আমাদের গায়েও লেগেছে। না, না, এত সাবধান হবার দরকার কি! এ যেন মন্ত্রীসভা তৈরী করতে যাচ্ছি। সামান্য ভোজের আয়োজনে অতো ভাবনার দরকার নেই।—"

লাঁসিয়ে তাঁর অতিথিদের কয়বেইয়ের ঐশ্বর্য দেখাতে ভালোবাসেন; তিনি আলমারী খুলে পুরনো যুগের অস্ত্রশস্ত্র, কাজ-করা নস্যিদানী বার করেন, দেয়ালের ছবি দেখবার জন্য আলো জ্বেলে দেন, তারপরে অতিথিদের নিয়ে যান বাগানে; চলতে চলতে মন্তব্য করেন—এইটে মার্কীন দেশের এল্‌ম—এই নোয়ালিসের গোলাপ ফুল—এই সুদানের ছাগল।—সার্জি নতুন অতিথি, তাই তিনি সার্জিকে নিগ্রো রাজার তানপুরা আর ভালেরীদের হাতের লেখা দেখিয়ে খুশিই হলেন। বৃষ্টি এল, তবু লাঁসিয়ে নিরস্ত হলেন না —তিনি রুশ-ছোকরাটিকে সুদানের ছাগলটি না দেখিয়ে কি পারেন?

অন্যান্য অতিথিরাও বহু পরিচিত দ্রষ্টব্যগুলির প্রশংসা করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু লাঁসিয়ের এ দুর্বলতা শীগ গিরই তাঁরা ক্ষমা করলেন; অতিথি-আপ্যায়নে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। লাঁসিয়ে তাই প্রায়ই বলেন: "মাদাম ক্যুরী কি রেনোয়া, বেশি-সেদ্ধ মাংস আর শুকনো আলু দিয়ে অতিথি সৎকার করলেও করতে পারেন, কিন্তু আমি মরিস লাঁসিয়ে তো আর কেউকেটা নই? আমার উপস্থিতিই কারো আনন্দের কারণ হবে না। অবিশ্যি মার্সেলিন আছেন বটে—।" তাঁর বিছানার ঠিক উপরে বইয়ের তাক, সেখানে লাঁসিয়ে তাঁর প্রিয় বইগুলি রেখেছেন, সরু সরু কবিতার বইযের সারের ভিতরে একখানা পাকপ্রণালীও সেখানে মিলবে। ছত্রে ছত্রে দাগানো বইখানা অতি-পঠনের পরিচয় দেয়। তিনি যে রন্ধনবিদ্যা শুধু শুধুই শেখেন নি তার প্রমাণ অতিথিরাও পেয়ে থাকেন।

আর একটা কারণেও ভিলা কারবেইয়েকে মরূদ্যান বলা যায়, গৃহের কর্তার মনের শান্তি অতিথিদেরকেও সংক্রামিত করে। এ বছর আসন্ন যুদ্ধ ছাড়া কারো মুখে আর কোনো কথা নেই। হয়তো যুদ্ধ যে আসছে, এ কথা বিশ্বাস খুব কম লোকেই করে, তবু একই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা যাচ্ছে, 'যুদ্ধ এল বলে।' এতে শান্ত মানুষরাও অস্থির হয়ে উঠেছে, কিন্তু কারবেইয়েতে সে আবহাওয়া নেই। এখানে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।

"বৃষ্টি, আবার বৃষ্টি সুরু হোল!" শিল্পী রোজের সাঁবা বিরক্ত হয়ে উঠলো। দীর্ঘ বর্ষাধারার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে বিড় বিড় করে বললে: "আবার সেই যুদ্ধ—জার্মানরা হুমকি দিচ্ছে, আমাদের এরা ভয় না পাবার ভান করছে। আমরা যদি প্রাহার জন্য না লড়ি, ডানজিগের জন্য কে লড়তে যাবে? বাজে, বাজে—সব বাজে! অলস কল্পনা!"

সেই পাগলা আলপের্ত (ছুটি নিয়ে যাবার আগে) বলেছিল: "আজ বিশ বছর ধরে পারীতে কি হচ্ছে জানেন? প্রথমে এল সর্বশেষ যুদ্ধের সমাপ্তির অধ্যায়, চিরশান্তির জিগীর উঠলো! পুরুষদের বেশভূষার পরিবর্তন এল, স্যুট-প্যাণ্টের আমদানি হোলো, তার পরে ফক্সট্রট নাচ আর পল মোরাঁর 'সাররাত ধরে খোলা' গল্প; বলশেভিকরা এল, 'দাঁতের ফাঁকে তাদের ছুরি।' তারপর শব্দের হেঁয়ালি, ক্ষতিপূরণ, মুলাটো জোসেফাইন বেকার সেনেটের সভ্যদের পাগল করে দিলেন, এইফেল-টাওয়ারে দেখা দিল সিৎরোনে গাড়ির উজ্জ্বল আলোর মালায় বিজ্ঞাপন। জহুরী মেস্তরিনো একজন শেয়ার বাজারের দালালকে খুন করলো, তারপর ওস্তারিক-কেলেঙ্কারী। তারপরে সংকট, সুগন্ধিদ্রব্য নির্মাতা কোতি—'জনগণের বন্ধু,' ট্যাক্সিতে পেশাদারী মেয়ের দল, কুমারী ভায়োলেট বাপকে বিষ দিল, ষ্টাভিস্কী কেলেঙ্কারী দেখা দিল, ছেলেছোকরারা পাগল হয়ে বাসে আগুন ধরিয়ে দিল, মেয়েরা বেগুনী রংএর কলপ দিতে শুরু করলো চুলে। স্ফিঙ্কীস্ নাম দিয়ে আধুনিক বেশ্যালয় বসলো, এল মনঃসমীক্ষা, স্যুররিয়ালিষ্ট, ধর্মঘট, এমন কি কবর-খুঁড়িয়েরাও ধর্মঘট করে বসলো। তারপরে যুদ্ধের কথা—"জিরেদ্যুর 'আর ট্রয়ের যুদ্ধ হবে না'-র প্রথম রজনী, নিষ্প্রদীপের পোষাকী মহড়া, মিউনিক আর আলোর মালা। আবার যুদ্ধের কথা··· এখন কথার মোড় ফেরানো উচিত। বরং

স্যুররিয়ালিষ্টদের উপরে যায় এমন কোনো দল নিয়ে মাতামাতি করা কি আর একজন ভায়োলেটের আর্সেনিক খাইয়ে মারা নিয়ে গল্পগুজব করাও এখন ভালো…"

কিন্তু সাংবাদিকরা তাতে সায় দিলেন না। তাঁদের মত আলাদা। প্রতিদিন মানুষ আসন্ন যুদ্ধের কথা পড়ছে কাগজে। তাই খবরের কাগজের কর্কশ চীৎকার থেকে পালিয়ে কারবেইয়েতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য আশ্রয় পেলেও কত আনন্দ! এখানে যদি তর্ক ওঠে তো সে পল ক্লদেল না পল ভ্যালেরী, কে বড় তাই নিয়েই ওঠে। যদি বিরোধ আসে তো, তাহলে রন্ধনপ্রণালী নিয়েই আসে। অতিথিরা যদি চেক, পোল বা মস্কোর সঙ্গে কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা তোলেন, লাঁসিয়ে তখনই তার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে যান বর্তমান চালু নাটকের প্রথম রাতে, নয়তো ওয়াতোর সৌন্দর্যে মুখর হয়ে ওঠেন। কখনো বা চলে যান আবহাওয়ার দিকে—কখন এই বৃষ্টি থামবে—অসহ্য! যুদ্ধ হবে না। কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে কি সমুদ্রতীরে যাবারও তাড়া নেই—সেখানে হোটেলে বসে থাকা তো বিরক্তিকর—বসে বসে দেখতে হবে বৃষ্টি ভেজা খেলোয়াড়ের দলকে…।

"বন্ধু, আপনি কি বৃষ্টিকে ভয় পান?" লাঁসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সাজি হেসে বলল:

"বরং ভালোবাসি, ভারি আনন্দ হয়।—গ্রীষ্মের বৃষ্টি অবশ্য—জোর শব্দ, ঝরঝর করে পড়ে।"

মাদো হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠলো, সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল নিজের কথা শুনে:

"মস্কোতেও তাহ'লে এমন লোক আছে!"

লাঁসিয়ে তার দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তাকালেন: অতিথিকে কি করে অপমান করল মাদো?

সাজি নিরুত্তর। মাদোর মুখ, তার ভাবভঙ্গী তাকে আকর্ষণ করছে। চোখে চোখ মিলল। সার্জি অবাক হলে মাথাটা পিছন দিকে এলিয়ে দেয়, ধূসর চোখ দুটো কুঁচকে যায়। তখন তার ভাবময় মুখে ফুটে ওঠে ঔদ্ধত্য।

"আমার দিকে অমন করে ও তাকাচ্ছ কেন?" মাদো মনে মনে ভাবলো। "ওকি আমাকে ঘৃণা করে? কেন? আমার সঙ্গে কথাও তো

হয় নি—ওরা বুঝি সবাইকেই ঘৃণা করে। লের্জা সেদিন বলছিলো, 'এখানে সবকিছু পচে গলে গেছে—'বেশ তো, আমিও ঘৃণা করতে জানি। কিন্তু ওর মুখখানা ভারি সুন্দর—কিন্তু ওকি মুখ না মুখোস?—"

মাদো সার্জির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইলো, কিন্তু বার বার তারা পরস্পরের দিকে তাকালে। দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাদো লাল হয়ে উঠল, চোখা চোখা কথা ছুঁড়ে মারলো তার বাবা অতিথিকে তার আঁকা কয়েকখানি স্থিরচিত্র দেখাতে চাইলেন, কিন্তু সে তীব্র প্রতিবাদ জানালো:

"মঁসিয়ে ভ্‌লাকভকে বাজে জিনিষ দেখিয়ে বিরক্ত করে লাভ কি?"

লঁাসিয়ে এবার পুরনো বিবর্ণ ফটোগ্রাফের সংগ্রহ দেখালেন। ভেলেই ন র‍্যাবসিস্থের গেলাসের সুমুখে বসে আছেন, জোলা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোটরে চলেছেন। সার্জি এবার জিজ্ঞেস করলো:

"আপনার ছাত্র বয়েসের ফটো আছে?"

"বাবাকে ঠাট্টা করছে লোকটা"—মাদো ভাবলো। লঁাসিয়ে শিশুর মতোই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন: একগাদা ফটোগ্রাফ বার করে আনলেন; এক উৎসাহ-দীপ্ত তরুণের ছবি, গাঁয়ে তার জোব্বা, পেছনে ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপের পটভূমিকা। সার্জি অজান্তে তাকালো গৃহস্বামীর দিকে। লঁাসিয়ে হাসলেন:

"এখন আর আমার সঙ্গে মেলে না। একদিন দু-দিন করে তিরিশটি বছর তারপর চলে গেছে!"

খাবার টেবিলে বসে লঁাসিয়ে বার বার নিভেলের নিষ্প্রভ মুখের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালেন। নিভেল নীরব। সুপক্ক ভোজ্য, পুরনো বার্গাণ্ডিও আছে; তার প্রভাব তো কম নয়। নিভেল চাঙা হয়ে উঠলো, মুখে রং ফিরে এলো। অতিথিদের মধ্যে সু ভোজনের পরে তৃপ্তির গুঞ্জন উঠছে, লঁাসিয়ে কান পেতে শুনলেন।

নিভেল শুরু করলো:

"শিল্প অতি বিশিষ্ট ঘটনা, কল্পনা বা অনুভূতি নিয়েই শিল্প বেঁচে আছে। লাখো লাখো মানুষ যা ভাবে, আমি যদি তাই ভাবি, তাহলে সে ভাবনা তো নগণ্য হয়ে গেলো। সে তো শিল্প হোল না।"

"কিন্তু আমার মতে শিল্পের অতি-বিশিষ্টতা বলে কিছু থাকবে না—" রোজের সাঁবা বাধা দিলেন, "বোধ হয় ফ্লবেয়ারই একখানা নভেল লিখবেন ঠিক করেছিলেন, তাতে কিছুই ঘটবে না। দুর্ভাগ্য, তিনি সে নভেল লেখেন নি। বনার্দ্যা এক কুঞ্জবন এঁকেছেন—মার্কে এঁকেছেন মাছভরা নদী, উৎরিলো এঁকেছেন কবুরের গলিঘুঁজি। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে শিল্পীর আঁকবার বিষয়বস্তু নেই—বরফের নদী শিল্পের উপজীব্য নয়। আপনার এই অতি বিশিষ্ট অনুভূতি আলপস্ পর্বতের মতোই মস্ত ব্যাপার। মানুষ যদি জ্ঞানলাভ করতে পারে, সে তখন অতি-বিশিষ্টের প্রতি মোহ হারিয়ে ফেলবে। খবরের কাগজগুলোর কথাই ধর না—ওরা কি নিয়ে লেখে? হয় কেলেঙ্কারী নয় তো, খুন-জখম। এখন আর একজন অতি-বিশিষ্ট মানুষ এসে জুটেছে সে হিটলার, কিন্তু আমাদের কাছে এই অতি-বিশিষ্টদের চাইতে অনেক বেশী আবেদন, ঐ যে উইসটারিয়া ফুল ফুটেছে তার। আমাকে যে গোয়ালিনী মেয়ে দুধ জোগায়, সেই লুসি বিয়ে করেছে, এ খবর আমার কাছে অনেক বেশি কৌতূহল জাগায়। আমাদের মুক্ত প্রান্তর, রেনোয়ার ছবি—তাদের আবেদন তো আমার কাছে কম নয়।"

"তাহলে সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থা আপনার পছন্দ হবে, সেখানে অতি-বিশিষ্টের স্থান নেই। যৌথ প্রথায়, প্রতিভা হচ্ছে ক্ষমাহীন ছাপার ভুল, ওদের প্রথম শ্রেণীর প্রুফ-সংশোধন করা ভুল শোধরাবার জন্য কলম উঁচিয়েই আছে।

লেজঁা বাধা দিলেন,

"আপনি সরল সমাধানে বিশ্বাসী মঁসিয়ে নিভেল। জার্মানীর কথাই ধরুন। ওরা নিটশেবাদকে পূজা করছে। কিন্তু আমরা যদি সেই পর্বতের চূড়ার দিকে তাকাই কি দেখতে পাব? মানুষ কোথায়? একপাল ভেড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যৌথ কথাটা আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আমি রাশিয়ায় যাই নি, কিন্তু এটুকু আমার বিশ্বাস আছে যে, যৌথকরণের জন্য সত্যিকারের মানুষ দরকার, যাকে তাকে দিয়ে সে কাজ হয় না।"

"যৌথকরণ—নয়তো, এ যেন পরিপাটি করে দুরমুস করা জমি। সুন্দর কিন্তু ভারি একঘেয়ে, যা কিছু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, সব সমভূমি হয়ে গেছে। ফ্লবেয়ারের কথা মঁসিয়ে সাঁবা বলছিলেন না? হাঁ, তিনি সাধারণ

মানুষের কথাই লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অসাধারণ করেই তা' লিখেছেন। আর সোভিয়েৎ রাশিয়ায় ওরা সাধারণ বিষয় সাধারণ ভাবেই লিখেছেন। না, ফ্লবেয়ার ওখানে একজনও জন্মাননি, আর জন্মাবেনও না। এমন কি তাঁর সিকি প্রতিভা নিয়েও কেউ আসবেন কি না সন্দেহ। আপনি হয়তো বলবেন…"

"আমি এই কথাই বলব, ফ্লবেয়ারের আট ভাগের একভাগ প্রতিভাও আজ ফ্রান্সে কারো নেই।"

"ঠিক ঠিক! কিন্তু আপনি যা বলছেন তার মানে এই যে, ফ্রান্সের আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসছে, ওদিকে রাশিয়ায এখন যৌবনের ফুল ফুটেছে।"

"গাছে ফুল ফোটে তার পরে আসে ফল।"

"কিন্তু আমার তো মনে হয়, ফল ধরেছে, কিন্তু বুনো ফল। হয়তো আমারই ভুল। আমাদের রুশ অতিথি যদি আমার ভুল শুধরে দেন তো আমি খুশিই হব।"

নিভেল অতিরিক্ত ভদ্রতা করেই বললো, তারই আড়ালে তার বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো। সাজি তবু শান্ত।

"আমি এ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। আপনারা শিল্পী, আর আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। মঁসিয়ে লাঁসিয়ের এক গোত্রের মানুষ। তবে কবিতা কখনো লিখিনি… আপনি হয়তো সত্যি কথাই বলেছেন, আমরা এখনও আমাদের শিল্প-কলায় পৃথিবীকে চমকে দিতে পারি নি।—আমরা সময় পাইনি…কিন্তু আর এক দিকে চমক লাগিয়ে দিয়েছি—আমাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। আপনারা জার্মান বা ইংরেজের শিল্পকলা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক করছেন না, বরং আমাদের শিল্প নিয়েই আলোচনা করছেন, এতে আমার কি মনে হয় জানেন, আপনারা আমাদের শিল্প নিয়ে তো তর্ক করেছেন না, আমাদের অস্তিত্বই আপনাদের আলোচনার বিষয়। আমি লক্ষ্য করেছি, এখানকার বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অনুভূতি প্রচার করতে চান না, তাঁরা বাঁধাধরা বুলি আওড়ান, পাণ্ডিত্যের বচন ঝাড়েন। আপনাদের কাছে ব্যাপারটা হয়তো হাসির মনে হবে, কিন্তু আমাদের দেশেও জুলিয়েৎরা রয়েছেন, তবে কি করে তাঁদের ভালোবাসা ভাষায় রূপ দিতে হয় তাঁরা তা জানেন না। আমার কথাটা আপনারাই বিচার করে দেখবেন। সত্যিকারের জুলিয়েৎ, যে নিজেকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না—সে ভালো, না, এক অনুভূতিহীন ছায়াময়ী জুলিয়েৎ ভালো, যে

পুরনো বিয়োগান্ত নাটক থেকে স্বগতোক্তি আওড়ে বেঁচে থাকে—বলুন তো ?"

মাদো তার সরু ভ্রূজোড়া তুলে জোরে বললো :

"আমরা আর কি করতে পারি ? এখন নীরব-জুলিয়েৎদের কাছে মাথা নোয়ানো ছাড়া আমাদের তো আর উপায় নেই। আর শিল্প ? সে না হয় ত্রিংশ শতাব্দীর জন্য মুলতুবি রইলো।"

"মাদো, থামো", লাঁসিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। "কি বলছ তুমি ? রুশরা এরই মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন কি করে দেশকে গড়ে তুলতে হয়। কত বড় বড় সব বাড়ি উঠেছে ও দেশে।"

অধ্যাপক ছ্যমা সায় দিলেন :

"শুধু বাড়ির ব্যাপারই নয়। কয়েকটি রুশ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে ; ওরা চাষী। আমাদের বন্ধু নিভেলের মতো ওরা লিখতে না জানুক, ভাবতে জানে। হাঁ, ওরা জানে—"

তাকে বাধা দিলেন একটি মহিলা। সুশ্রী কিন্তু রুগ্না তিনি। এতক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলেন নি।—

"ওরা মরতেও জানে বইকি। আমি দেখেছি..."

"কোথায় ?"

"স্পেনে।"

মুহূর্তের ছেদ ; সবাই নীরব ; আবার নিভেল শুরু করলো :

"ফরাসীরাও মরতে জানে। মঁসিয়ে লাঁসিয়ে তা ভালো বলতে পারবেন। ভার্দেনের কথা এখনো তাঁর মনে আছে।"

"ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা যায় না"—লেজঁ। প্রতিবাদ জানালেন—"আমি রূঢ় সত্যিটাই বলছি : আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, ফরাসীরা মরতে জানাটাই ভুলে গেছে, তারা কিছুই উৎসর্গ করতে রাজি নয়, বিশ্রামের আরামটুকু ছাড়তে তারা রাজি নয়। যেদিন মিউনিকের খবরটা এলো সেই সন্ধ্যের কথা আমার মনে পড়ছে। কি হৈ-হল্লা ; স্ফূর্তি আর..."

টেবিল-ন্যাপকিনখানা তাল পাকিয়ে নিভেল উঠে দাঁড়ালো।

"বাজে বক্তৃতা আমি পছন্দ করি না। সেদিন ভীরু আর মূর্খরাই হৈচৈ করেছিলো। মিউনিক এক ভয়ংকর ট্রাজেডি, কিন্তু কমিউনিস্টরা ক্ষমতা পেলেও

ঠিক অমনিই করতো। আপনারা কি মনে করেন, রুশরা যুদ্ধ করবে? ওতো বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই নয়। তা ছাড়া যুদ্ধ করতে ওরা জানেও না—ট্যাঙ্ককে ইস্তেহার দিয়ে কেউ এখনো বাধা দেয়নি। বোলসেভিকরা হিটলারকে অর্দ্ধেক রাশিয়া দিয়ে তবে প্রাণ বাঁচাবে।"

লাঁসিয়ে দেখলেন শান্ত আবহাওয়া আর নেই। সবাই চেঁচাচ্ছে, কেউ কারো কথা শুনছে না, এমন কি গৃহস্বামীর কথাও না। তিনি তাদের উত্তেজনা শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ফল হোল না। কিন্তু সার্জি শুরু করতেই তর্ক থেমে গেলো।

"বোধ হয় জার্মানরা ছাড়া কেউ যুদ্ধ করতে চায় না...কিন্তু আপনি ভুল করেছেন মঁসিয়ে নিভেল—আমি শিল্প সম্বন্ধে না জানতে পারি কিন্তু নিজের দেশের মানুষকে জানি, চিনি। আমার দেশের মানুষ কখনও আত্মসমর্পণ করবে না। আমরা আক্রান্ত হলে লড়াই করবো, আর সে এমন লড়াই যে আপনারা কল্পনায়ও শিউরে উঠবেন—"

সার্জি সরে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালো। এখনো তেমনি জোরে বৃষ্টি পড়ছে। এবার বসবার ঘরে অতিথিরা চলে গেলেন; লাঁসিয়ে কথাবার্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন, সার্জি শুনলো কে যেন বলছে; "জিরেছ্যার সংলাপ কিন্তু চমৎকার—"

মাদো সার্জির কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো:

"দেশের কথা ভাবছেন বুঝি?"

"না, অন্য কথাই এখন ভাবছি। কিছুদিন আগে বাইজান্তীয় যুগের ইতিহাস পড়ছিলাম। যখন তুর্কীরা এলো নগরের ফটকে তখন তারা কি করছিলো জানেন? লাল না নীল, কোন্ রথখানা এবার প্রতিযোগিতায় জিতবে তারই তর্ক-বিতর্কে মত্ত হয়েছিলো।"

"আমাদের ভাগ্য নিয়ে আপনার এত দুশ্চিন্তা কেন?"

"আমাদের শত্রু যে এক—তাই।" "তাছাড়া"—সার্জি একটু চুপ করে থেকে বললে, "আমি বেশি দিন এখানে আসিনি, কিন্তু পারীকে আমি ভালো বেসে ফেলেছি..."

মাদো অভিভূত। তার ইচ্ছে হোল মানুষটির হাতে হাত নিয়ে তাকে বলে, এখানেও খাঁটি মানুষ আছে। অনেক বাজে কথাই সে আজ বলেছে, কিন্তু তা

দিয়ে তার বিচার যেন সে না করে, সে তার জন্য নিজেই দুঃখ পাচ্ছে, হয়তো আর এক মুহূর্ত পরে ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলবে।...কিন্তু সে—কাঁদলো না, বরং ঠাণ্ডা স্বর ঝরে পড়লো তার :

"ওরা বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন, কফি দেওয়া হয়েছে।"

এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলো :

"মঁসিয়ে গ্যাস্টন রয় এসেছেন।"

যার সম্বন্ধে তিনি আজকাল সব সময়ে ভাবেন, তাকে করবেইয়েতে নিমন্ত্রণ করেছেন—একথা লাঁসিয়ে স্ত্রীকে জানান নি। মার্সেলিনকে হয়তো তাঁর দুর্ভাবনার কথা শোনাতে তিনি ভয় পান। তবু তাঁর হবু অংশীদারকে সবাই কেমন ভাবে নেয়, তিনি দেখতে চান বই কি! রয়কে তিনি পছন্দ করেন না। তাই তাকে ভোজের পরে কাফি-পর্বে ডেকেছেন। 'এক পেয়ালা কাফির নিমন্ত্রণ মাত্র।'

বসবার ঘরে এসে ঢুকলো একজন ছোটখাটো মানুষ, ছাঁটা গোঁপের সরু রেখা তার মুখে, পরিপাটি করে উলটে-দেওয়া চুলে টা॰ ঢাকবার বৃথা প্রচেষ্টা। লাঁসিয়ে আগন্তুকের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। এবার আনা রথ-এর কাছে তাঁরা এলেন।

সে বললে :

"ম সিয়ে রয়কে আমি চিনি।"

অতিথি যেন কথাটা শুনতে পাননি এমনি ভাব দেখালেন, অথচ কথাটা বেশ জোরেই বলা হোল। মাদোর সঙ্গে একটু গায়ে পড়ে মিশতে গেলেন রয়; মরিস শেভালিয়ে আর অর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথা পাড়লেন। কিন্তু কেউ তাতে সায় দিলে না। আলাপের ফাঁকে ফাঁকে বিরতি এসে দেখা দিয়ে বার বার জানিয়ে দিলো, বিদায়ের সময় হয়েছে। গ্যাস্টন রয় এক পেয়ালা কাফিতে শেষ চুমুক না দিতেই সাঁবা উঠে পড়লো; তারপরে তার সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই।

দ্যুমা চলে গেলেন লেজাঁর সঙ্গে, সার্জি মাদাম রথকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইলো। সবার শেষে বিদায় নিলেন গ্যাস্টন রয়। লাঁসিয়ে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু লুই বোকার মত বলে বসলো, বাপকে বিব্রতই সে করলো :

"ঐ রুশটিকে আমার ভালো লাগলো। এর আগে কখনো জলজ্যান্ত বোলশেভিক দেখিনি, রাজনীতিরও ধার ধারি না, কিন্তু আমাদের র‍্যাডিকালদের থেকে ওরা অনেক ভালো বলেই মনে হয়, হাঁ, অনেক বেশি মজবুত! আর ঐ রয়—ওকে কোথেকে জোটালে? লোকটা খাঁটি অভদ্র।"

লাঁসিয়ে অবাক হয়ে ভাবলেন, তিনি যে-কথা এতদিন ধরে ভাবছেন, আজ তাই কিনা লুইও জিজ্ঞেস করে বসলো। তাইত—কোথা থেকে এল রয়?... তিনি বিড় বিড় করে যেন আপন মনে বললেন:

"ওঁর সঙ্গে ব্যবসার কথা হচ্ছে, উনি ইকনমিক ইনফরমেশন এজেন্সির প্রতিনিধি।"

আর কেউ রয়-এর কথা তুললো না বটে, কিন্তু লাঁসিয়ের তার সম্বন্ধে ভাবনার শেষ রইলো না। বেশ বোঝা গেলো, এই হবু অংশীদারটিকে অতিথিদের কারো ভালো লাগে নি। তাই যেখানে আরো ঘণ্টাখানেক অতিথিরা থাকতেন, কিন্তু তার আগেই তাঁরা উঠে পড়লেন। হাঁ, লোকটা অভদ্র—কিন্তু তিনি কি করবেন? তাঁর হাত থাকলে ভালো অংশীদার তিনি জোটাতেন, কিন্তু তাঁর তো সে স্বাধীনতা নেই। এখন বোধহয় মার্সেলিনকে সব বলাই উচিত? তা সে তো বলবে, "গেলিনো বিক্রি করে দাও"—আর মার্সেলিন একবার যা বলবে, তার আর নড়চড় হবে না। সহজেই ব্যাপারটার সমাধান হয়ে যাবে। একটা জমিদারী রেখে এমন লাভই বা কি? গ্রীষ্মে তো নরম্যাণ্ডি যাওয়াও চলে। হাঁ, তা চলে বইকি—কিন্তু মার্সেলিনের কাছ থেকে এ তো কেড়ে নেওয়া—সন্তানদেরও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। রোস্ আইনে দেউলে হয়ে যাক্ না—কিন্তু বিষয়ের দাম তার চাইতে অনেক বেশি। কিন্তু একি মুহূর্তের দুর্বলতা নয়? অভদ্র? তাতে কি? তাঁদের তো পরস্পরের দেখা হবার দরকার নেই। ব্যবসায়ীরা সবাই অভদ্র। কিন্তু গেলিনো থাকবে তো!—প্রথম কথাটি শুনেই ঐ রুশ-ছোকরাকে তিনি ঠিক চিনে নিয়েছেন। যাক্ ভালোয় ভালোয় ব্যাপারটা চুকে গেছে, এমন কি নিভেলেরও ভ্লাকভকে ভালো লেগেছে। আর অমন পুলার্ড খেয়ে নিভেল তো অবাক—চমৎকার রান্নার মাল-মশলা আর ধরণ নিয়ম!...গ্যাস্টন রয়কে ভুলে গিয়ে লাঁসিয়ে এবার মার্সেলিনকে বললেন:

"ভোজটা ভালোই হয়েছে, কি বলো?"

মার্সেলিনের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো, এই হাসিই ওঁর সৌন্দর্য। তাঁর মনে পড়লো, তরুণ মরিস এমনি গর্বভরেই তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন: "কবিতাটা বেশ ভালো হয়েছে, তাই না?"

লঁাসিয়ে এবার গেলেন মাদোর কাছে:

"তোমার বোধহয় রুশ-ছোকরাটিকে ভালো লাগে নি, আমার তো মনে হয় খাসা ছেলে, ব্যবহারেও ভারি ভদ্র।"—

"আমার তা মনে হয় না। এর আগে এমন জুলিয়েৎ নিয়ে আত্মহারা মানুষ দেখি নি—"

"না, না, কেমন সংযত হয়ে কথা বলছিল! কিন্তু তুমি অমন চটে গিছলে কেন?"

"একটুও না—আমি চটবো কেন? রয় আর ভ লাকভ ব্যবসার ব্যাপারে তোমার পরিচিত হতে পারেন—কিন্তু আমার কে? আমি শুতে চললাম, বড্ড মাথা ধরেছে…"

## তিন

করবেইয়ের এই পাঁচমিশেলী ভিড়ে সার্জি আর আনা পরস্পরের কাছে এসে পড়লো, সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলো। দুখানা জাহাজ যেন একই পতাকা উড়িয়ে চলেছিলো, তাদের মিলন হোল উদার সমুদ্রের বুকে। কথা বেশি হয় নি, তবু তারা পরস্পরকে চিনলো, কিন্তু জানা তো তেমন করে হোল না। তার কারণ, জীবনের ধারা যে তাদের সম্পূর্ণ আলাদা।

ট্যাক্সিচালক থেমে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, কোনদিকে ঘুরবে: ওরা তখন প্লাস ফলগেয়ার-এ আনার ছোট্ট হোটেলের কাছে এসে গেছে।

আনা বললে,

"যদি ক্লান্ত না হয়ে থাকেন তো আসুন ভিতরে। দুটো কথা বলি—"

একটা ছোট্ট কাফেতে তারা ঢুকলো, আশে পাশের বাসিন্দারা এর খদ্দের। এসব কাফে যেমনটি হয় ঠিক তেমনি। পরিচারিকা তেমনি মোটাসোটা, মুখে গোঁফের রেখা; একটা হুলো বেড়াল বসে আছে কাউন্টারের

উপরে, ছুটো ছিটগ্রস্ত মানুষ বসে সীন না মার্নে—কোথায় ভালো মাছ ধরা যায়, তাই নিয়ে দুপুর রাত ধরে তর্ক করছে, কখনো বা আবার বার্গাণ্ডি আর শ্যাভয়ের খোসবাই নিয়েও মেতে উঠছে। একেবারে চিরাচরিত পরিবেশ।

প্রথমে তাদের কথাবার্তা অসংলগ্ন ভাবেই শুরু হোল, যে যার খেয়াল-খুশি মাফিক বলে চললো—মস্কোর মেট্রো থেকে পারীর জন-বিক্ষোভ, কৃষি-প্রদর্শনী আর প্রাহার ভীতির রাজ্যে ঘুরতে লাগলো কথাবার্তা। এবার আনা শুরু করলে স্পেনের কথা:

"বুলগেরিয়ার একজন ছিলেন আমাদের দলে, চমৎকার মানুষ। যখন ওরা আমাদের ঘিরে ফেললো, তিনি আমাদের উপকূলে নিয়ে গেলেন। বেশ চমৎকার গানও তিনি গাইতেন···আমাদের দলে ফরাসী, জার্মান, যুগোশ্লাভ, চেক আর হাঙেরীর মানুষ ছিলেন। আমরা যখন লড়াই করতাম, দশটি ভাষায় ইণ্টারন্যাশনাল গাইতাম, চমৎকার না? আমার কি মনে হয় জানেন, স্পেন হচ্ছে পরিশিষ্ট।"

"কেন? বরং প্রস্তাবনা বলা যায়।"

"সেই সেখানে দেখেছি পুরনো দিন, ঠিক গত শতকের বিপ্লবের কাহিনীর পরিবেশ। সরলতা আর বোকামি দুই-ই ছিল, আর ছিল পবিত্রতা। আবার কি তা-ই ঘটবে?"

"না, এবার আর ততোখানি ভাবাবেগ থাকবে না, আগের চাইতে আরো সাবধান হবে।"

"আপনাদেরই দেশের একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো সেখানে, সে আমাকে বলত, এ সংগ্রাম সমানে সমানে হচ্ছে না। ভাবাবেগই এখানে যথেষ্ট নয়, কিন্তু তবু স্পেন বাধা দিলে, কতদিন টিকে রইলো! তাই তো মনে হয়, আধুনিক মারণাস্ত্রই সব নয়···। তার নাম জানতাম না, সবাই তাকে 'রুশো' বলে ডাকত—আমাদের ভাবপ্রবণতা নিয়ে সে ঠাট্টা করত, কিন্তু সে নিজেই ছিলো ভাবের মানুষ। সে স্পেনকে ভালোবাসত তার মানুষের সরলতার জন্য···"

"আমারও স্পেনে যাবার ইচ্ছা ছিলো, আমারই এক সংপাঠী সেখানে মারা যায়—"

"আমরা 'রুশোকে' এক জলপাই গাছের নিচে কবর দিলাম, কবরের উপর

কোনো ফলক এঁটে দিইনি—আমাদের ভয় ছিলো, শত্রু এসে কবর ভেঙে-চুরে ফেলবে। সে কবর কোথায় জানি। আবার সেখানে গেলে···কিন্তু সে-বিশ্বাস তো আমার নেই···”

“আমরা আবার সেখানে যাব বই কি। তবে আর এক পথে। বার্লিনের ভিতর দিয়ে।”

“শুনে খুশিই হলাম। এখানে হতাশা দেখা দিয়েছে। সবাই হিটলারকে ভয় করছে। আর জার্মানী—ভয়ংকর শক্তি সে। আমি জানি, তারা তৈরী হচ্ছে। সোভিয়েতের উপর ঝাঁপিয়ে তারা পড়বেই—ক্ষমতা বজায় রাখতে হলে তাদের এ ছাড়া কোনো উপায় নেই।”

“আমরা সে-কথা জানি বলেই আমাদের এত শক্তি। আমার কথাই ধরুন না—ছেলেবেলা থেকে শুধু এই কথাই শুনেছি : ‘এমনিধারা হবেই।’—প্রথমে শত্রুরা বলত ঘিরে ফেলার কথা, তারপর এল ফ্যাসিবাদ—আমাদের শত্রুদের চুম্বকের মতো সে আকর্ষণ করলো ? আমরা জানি সংঘাত আসবেই। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, আমরা পশ্চিম ইউরোপের দিকে কত আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। সেদিন বিপ্লবের কথা ভাবতাম···”

“কিন্তু এখন তো সে মোহ ভেঙে গেছে তাই না ?···”

“না,—ইতিহাস ঘুরে ঘুরে চলে। যুগযুগান্ত কেটে যায় বিপ্লব আসতে—এখন আমাদের নিজেদের উপরই নির্ভর করতে হবে।”

“কিন্তু আমরা কার ভরসা করব ?”

“আপনাদের নিজেদের উপর, আর আছি আমরা।”

যখন বন্দী-শিবিরে ছিলাম, মস্কোর কথা কত ভেবেছি, আপনারা সেখানে কেমন আছেন, তারই ছবি কল্পনায় আঁকতে বসেছি—কিন্তু আঁকা ভারি শক্ত—সচিত্র কাগজগুলোতে দেখি কৃশ মেয়েরা সব সময়েই হাসছে—”

“হাঁ, তারা হাসে আর সে হাসি সুন্দরও বটে। তবে যত হাসতে চায় ততো পারে না।” সাজি হেসে উঠলো। “এই তো, আমি যত হাসতে চাই, ততো কি পারি ? আমাদের জীবন বড় কঠোর। আমার তো মনে হয় মাচার উপরেই আমাদের থাকতে হবে,—সুন্দর বাড়ি আর চোখে দেখব না। না, না, নালিশ করছি না। এই মাচা কারো সঙ্গে বদল করতে আমি রাজি নই। লোকে যা ভাবে তার চাইতেও জটিল আমরা। ডিকেন্স-এর বইয়ে আপনারা

হয় নরক, নয়তো স্বর্গ—দুটোর একটা পাবেনই—কিন্তু আমাদের জীবনধারা অতো সোজা নয়। বরং পাঁচ-মিশেলী তাকে বলতে পারেন।"

"একবার মস্কোর এক কমরেডের সঙ্গে দেখা। তখন আরগেল থেকে সবে ফিরেছি। আপনি আরগেলের কথা নিশ্চয়ই পড়েছেন, পড়েন নি? সেখানে তখন রোজ কত মানুষ যে মরছিলো! সে আমাকে স্পেনের কথা জিজ্ঞেস করলো? আমি আরগেলের কথা বললাম। তারপরেই কমরেড জিজ্ঞেস করে বসলো, লা ফাযেৎ না প্রিনতেম্‌ কোথায় ভালো পোষাক পাওয়া যায়, কি রকম মোজা সে কিনবে, এমনি নানা কথা। আমি এগুলো ঠিক বুঝি না—"

"আমি কিন্তু বুঝি। না, না. ভয় পাবেন না, কোথায় মোজা কিনব—আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না। আমার স্ত্রী নেই. তাছাড়া ঘুরে ঘুরে সওদা করা আমার ধাতে সয় না। আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—স তাই আপনারা আমাদের বুঝতে পারেন না—আপনারা লড়াই চালাচ্ছেন, জেলে যাচ্ছেন, সেখানে মরছেন—কিন্তু একপ্রস্থ পোষাক কেনা আপনাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়—আপনারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, আমাদের কারখানাগুলির জন্য আমরা কত সয়েছি? তাই আমরা যখন কোনো দোকানে যাই, আমরা দিশে পাই না। আমাদের তরুণী স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, তাঁর নতুন পোষাক চাই—না, এতে প্রশংসা বা নিন্দে করবার কিছু নেই। কমরেড আপনাকে মোজা কেনবার কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু দরকার হলে তিনিই ট্যাঙ্কে চড়ে বীরের মতো প্রাণ দেবেন। সব কিছুই বড় জটিল—তাই না? ধরুন আমি, যখন কাগজে পড়ি, আমরা এত জোড়া মোজা তৈরী করেছি, ভারি খুশি হই—মনে হয় যেন আমরা আর একটা যুদ্ধে জিতেছি। জিজ্ঞেস করতে পারেন মোজার আমাদের কাছে দাম কি? দাম এইটুকু যে, আমরা সেগুলো তৈরী করেছি আমাদেরই কারখানায়।"

"সত্যি আপনাদের হিংসে হয়! আপনারা জনগণ কথাটার মানে জানেন।"

"জনগণ তো আপনার দেশেও আছেন।"

"তাদের আমরা চিনি না, জানি না।—আপনি জটিলতার কথা বলছিলেন, কিন্তু আমি তো দেখছি আপনাদের দেশে সব কিছুই সহজ সরল। এই তো আপনারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য মোজা তৈরী করেই খুশি হয়ে উঠতে

পারেন! আমার কাছে সোভিয়েতের মানুষ মাত্রই গুরু: সে আমার থেকে বেশি জানে, বেশি কাজ করতে পারে। কিন্তু আমাদের অনুভূতি তো আলাদা। আপনার কথা শুনে নিজেকে বুড়ি বলেই মনে হচ্ছে, এক দীর্ঘ দুঃখের জীবন টেনে চলেছি—আমার কাছে সব কিছুই জটিল···আপনার নিজের দেশের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়ে একবার বুঝতে চেষ্টা করুন আমাকে···সে এক আলাদা পৃথিবী। এক ইহুদীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। সে হেনরিক। নিজেকে সে জার্মান বলেই জানত। তার বন্ধুরা ছিলো জার্মান, সে বিয়েও করেছিলো এক জার্মান মেয়েকে। আমি এক পাদ্রির মেয়ে।—সবার মতোই সে খেটে রোজগার করত—সে ছিলো রাসায়নিক, রাজনীতির দিকে তার ঝোঁক ছিলো। হিটলার ক্ষমতা পাবার একবছর আগে সে হোল কমিউনিষ্ট তখনই আমাদের প্রথম দেখা—আমি তখন একেবারে ছেলেমানুষ। অবাক হবেন না, এখন আমার বয়স মাত্র পঁচিশ বছর···। অন্তে কেমন করে ভালোবাসে আমি জানি না, বইয়েই শুধু সে কথা পড়েছি! কিন্তু ওকে আমি এত ভালোবেসেছিলাম যে, রাতে ঘুমোতে পারতাম না, ভয় হোত, ভোরে উঠে ওকে হয়তো আর দেখতে পাব না। স্টার্টগার্টের কাছে এক গ্রামে আ'রা দু সপ্তাহ এক সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। সুখ কাকে বলে জেনেছি তখন—তরপর হিটলার এলো; সবাই এসে আমাকে বললো স্বামীকে ত্যাগ করতে: "তোমার বাবা মা অমন মানী লোক আর তুমি কিনা—" তাদের কথা শুনে হাসতাম, আমার স্বামী তখন মার ওখানেই লুকিয়ে ছিলো কিনা। এবার দুজনকেই লুকোতে হোল। হেনরিক হামবুর্গে কাজ করত, আজও সেখানে গোপন আন্দোলন চলছে। তারপর এলো বিশ্বাসঘাতকতার পালা—ক'জন বিশ্বাস ভঙ্গ করলে: আপনি একজনকে তো দেখলেন, এখন সে আলাদা সুর গাইছে। আমি নাম ভাঁড়িয়ে জার্মানীতেই রইলাম। খুব কমই তার সঙ্গে দেখা হোত, যাও হোত সেও মানুষের ভিড়ে। উনিশ শো চৌত্রিশ সালের আগষ্ট মাসে সে ধরা পড়লো। তারা আটদিন ধরে তার উপর অত্যাচার চালালো, যাতে সে সাথীদের নাম বলে দেয়। আমি সে কথা শুনলাম, ঝঞ্ঝা-বাহিনীর এক সৈনিকের কাছে। সে বললে: 'তোমাকে আমি ধরিয়ে দেব না, তোমার বাবাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার স্বামীর কথা ভুলে যাও, তাকে আমরা ইহুদীদের শুয়োরের কিমা

বানিয়ে ছাড়ব'—আমার স্বামীর নামেই ছিল ওর নাম। মনে হোত পাগল হয়ে যাব। তার ওপর অত্যাচার চলত, আর সে অত্যাচার যেন অনুভব করতাম নিজে। ওরা হেন্‌রিকের কাছ থেকে কিছুই বার করতে পারলো না।—আধমরা করে ওরা ওকে ডাসাউতে পাঠিয়ে দিলো। আজও ভাবি ওর কথা, মনে আশা জাগে, স্বপ্ন দেখি—সে হয়তো বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে আসবে—হাঁ। স্বপ্নই দেখি! কিন্তু হায় বৃথা আশা! সে তো আর বেঁচে নেই। স্পেনে তাই আমি সহজেই মিশে গিছলাম স্পেনের মানুষের সঙ্গে, ফরাসীদেরও ভালো লাগত কিন্তু জার্মানদের আমি এড়িয়ে চলতাম। কি বিশ্রী ব্যাপার! অথচ আমার স্বামীর মতো অমনি চমৎকার জার্মান সেখানে ছিলো, কেউ বা হয়তো তারই বন্ধু। আপনি বুঝতে পারছেন না নিশ্চয়ই, বোঝাতেও আমি পারবো না। আর একটা যুদ্ধ আসছে, আর আমার কাছে তার মানে কি জানেন?

"...আপনাদের কাছে তার সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমার কাছে তো তা নয়। আমি জার্মানীকে ঘৃণা করি, আবার ভালোও বাসি। আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু বাবা আছেন সেখানে। তাঁর খোঁজ নিতেও ভয় হয়, তিনি গ্রেফ্‌তার হবেন সে-ভয়ে নয়। ওরা আগেই হয়তো তাঁকে গ্রেফ্‌তার করেছে। কিন্তু আবার এ ভয়ও তো আছে, হয়তো তিনি হিটলারকে বিশ্বাস করেছেন, হিটলারের দলে নাম লিখিয়ে বসে আছেন। যদি তাই-ই হয়, তাহলে বাবাকে আমার নেই বলেই জানব। আমি আজকাল জার্মান ভাষাও ভুলে যাচ্ছি। হিটলার ঐ ভাষায় কথা বলে, তাই বিশ্রী লাগে। অথচ ঐ ভাষায় মানুষের সংস্কৃতির ভালো যা কিছু—তাই তো পেয়েছি।... যে গ্রামে হেনরিকের সঙ্গে একপক্ষ কাটালাম তার কথা শুনবেন?

"সাধারণ একটি গ্রাম। লাইম গাছ, কাঁচা আর টক আপেল...ছোট্ট ছেলের দল, মাথায় তাদের চকচকে চূড়াওয়ালা টুপী...বুড়োরা জড়ো হয়েছে স্কিটল খেলায়।...এই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাক—এই কি আমি চাই?... স্পেনে জার্মানদের এড়িয়ে চলতাম, কিন্তু যখনই ওদের কেউ মারা যেত, বুকখানা যেন ফেটে যেত। আহা, ওরা তো আমারই আপনজন! আমারই মতো ওরা কত সয়েছে! আপনার সঙ্গে কথা বলছি আর ভাবি—

আজ যদি জার্মানরা হিটলারের পক্ষে যায়, আপনারা নিশ্চয় তাদের সবাইকে ঘৃণা করবেন, ঘৃণা করবেন তাদের ভাষা, তাদের গ্রাম···তাদের সব কিছু—সব কিছু···! যখন তাই ভাবি, নিজেকে কত দুঃখী, কত নিঃসঙ্গ মনে. হয়!···"

সার্জি নীরব। ওর দুঃখের গভীরতায় নাড়া লেগেছে তার মনে—সে বুঝতে পারছে—আনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তার জানা নেই, আর তা ছাড়া কথার প্রলেপ তো সে চায় না, দরকারও বুঝি নেই। সার্জি তাই তার হাত চেপে ধরে আস্তে আস্তে বললে; আপন মনেই যেন বলে গেলো:

"হাঁ, আমি ওদের ঘৃণা করি, কিন্তু তাই বলে সবাইকে কি? আমরা তো ফাসিস্ত নই! সবাই যদি ওরা আজ হিটলারকে অনুসরণ করে—তবু আপনার কথা আমার মনে থাকবে·· না, না, সবাইকে তো নয়···"

পাশের টেবিলে দুজন বসে আছে; কয়েক পাত্র নিঃশেষিত,—কথা তারা জোরে বলছে না—কিন্তু স্বরে তাদের ক্লান্তির আমেজ। ঠিক অভিনেতাদের মতোই। হাত দিয়ে তারা শূন্যে বৃত্ত আঁকছে কথার সঙ্গে

"মরতিয়ে বলে, যুদ্ধ আসছে তাই, কিন্তু আমি তো জানি, তার খোঁড়া মেয়েটাকে দেজ্যার ঘাড়ে গছাবে তাই। আর যুদ্ধ এখন থাক, এস আর এক পাত্তর টানা যাক।

"বেশ তো আর এক পাত্তর নাও। ঐ মরতিয়েটা বদমাসের ধাড়ি। আগেরবার হেমন্তকালে ও আমার পয়েণ্টার কুকুরটা দুদিনের জন্যে চেয়ে নিয়ে গেলো। দুদিন পরে ফিরে এসে বললে, কুত্তাটা নাকি কোন নেড়ির পেছু পেছু আমেরিকায় ধাওয়া করেছে। একটা কথা মরতিয়ে কিন্তু ঠিকই বলেছে। যুদ্ধ হবেই, তার কারণটা······"

"হুঁ, কারণটা কি শুনি?"

"কারণ আবার কি? আমি বলছি।"

"কিন্তু তুমি তো নও, ওকথা বলেছে মরতিয়ে। কিন্তু যুদ্ধ হবে না, একটা যুদ্ধ এই সেদিন হয়ে গেছে।"

আনা বললো:

"দেখছেন তো! কেউ বিপদের কথা ভাবছে না…"

"লাঁসিয়ের মতো মানুষও বিশ্বাস করেন, যুদ্ধ যদি হয়ও, সে হবে করবেইয়ে থেকে বহু বহু দূরে।"

"লোকটি বোকা; কিন্তু বেশ ভদ্র।"

"আর ওঁর মেয়ে?"……সার্জি তখুনি অপ্রতিভ হোল, কি বোকার মতো প্রশ্নটা সে করেছে!

"ওকে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু বড় বাজে বকে। কিন্তু সে দোষ তার নয়, যে-পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে তারই দোষ। ওরা জানে না, মৃত্যু চলেছে ওদের পাশে পাশে। মেতারলিঙ্কের একটা নাটকের কথা মনে পড়েছে। একটা দৃশ্যে দেখা গেলো একটা বাড়ি। এক সুদৃশ্য ঘরে ক'জন বসেছে খেতে, বাইরে জানালার ধারে কারা যেন ফিসফাস করছে—ওরা বাড়ির মালিকের মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে এসেছে, সে ডুবে মরেছে। এক মুহূর্ত —তারপরেই ওরা দরজায় ঘা দেবে…কিন্তু এ যে তার চেয়েও ভয়ানক। ডিনারের পরে যে লোকটি এলো—তাকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন? ঐ যে গোঁপ-ছাঁটা মানুষটি। ওর কথা আপনাকে বলছি। যখন পারীতে এলাম, কাজের ভার নিয়েই এলাম। নাৎসীরা তখন ইনটারন্যাশনাল ব্রিগেডের সাথীদের নানা মিথ্যে অজুহাতে জার্মানীতে পাঠাতে চাইছে। এখানে এসে আমি কাজ নিলাম ইউরোপ ট্রাভেল বুরোতে। এইখানেই ছিলো ওদের কেন্দ্র। আমি চারমাস টাইপিষ্টের কাজ করেছি সেখানে। ব্রিগেডের সাথীদের কথা জানতে পারিনি বটে, কিন্তু জেনেছি অন্য কথা। সেখানেই রয়-এর সঙ্গে দেখা। সে দুবার এসেছিলো আর্জেন্টিনা যাবে তারই টিকিট কেনার ব্যাপারে খোঁজ নিতে। একটা সেরা কেবিন ভাড়া নেবার নাম করে দোতলায় সে শার্কের সঙ্গে দেখা করে।…মনে হয়, লাঁসিয়ে ওকে সন্দেহ করেন নি। তিনি তো মৌমাছির মতো কাব্যের জগতে গুণগুণ করে বেড়ান আর ভাবেন, তার পরিবেশের চারধারে সৌন্দর্যের পাড়-বসানো, অথচ সে তো পাড় নয়, মাকড়সার জাল। আপনাকে দেখে আজ বড় খুশি হলাম। স্নায়ু আমার বিকল। ঘুমোতে পারি না, কেমন যেন একটা ভয় আমাকে ঘিরে আছে। আজ আপনাকে দেখে আমি পেলাম শান্তি…"

বিদায় নেবার সময় সাজি মৃদু কোমল স্বরে বললে :

"শুভরাত্রি সাথী!"

তারপর সে পথের পর পথ পার হয়ে চললো। বৃষ্টি-ভেজা পথ রাতের আলোয় চকচক করছে। মোটরগুলো নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিঃসঙ্গিনীরা, রুজের স্থূল প্রলেপ তাদের পাঁশুটে মুখে প্রকট হয়ে উঠছে। সাজির মাথায় সব কিছু যেন তাল-গোল পাকিয়ে গেলো। আনার দুঃখ, ট্রাভেল ব্যুরো, কাব্য, পথ, সমুদ্রের গন্ধ, গ্রাম—সব কিছু। যখন সে এসে পৌছলো তার আবাসে—তখন আকাশে দেখা দিয়েছে তারা। ল্যাম্পপোষ্ট নেই তার বাড়ির সামনে—আছে আকাশে তারা, অনেক তারা। আগে সে তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসত, খুঁজে খুঁজে বার করত তার প্রিয় তারাদের—নামও জানত···এখানে আকাশও যেন ভিন্ন—দক্ষিণের আকাশ। "ঐ যে মস্ত সবুজ তারাটা—কি যেন ওর নাম? যদি কবি হতাম, ওদের নিয়ে লিখতাম। হাঁ, তারা আর ভালোবাসা—সে ভালোবাসা ঐ ক্ষীণা মেয়েটির স্বামীর প্রতি ভালোবাসার মতোই বলিষ্ঠ। সব কিছুই জটিল, প্রতিকার নেই,—আনা হারিয়েছে হেনরিককে। কিন্তু নিভেল কবিতা লেখে। সে তো ভালোবাসার আস্বাদ পায় নি, জানে না তারাদের রহস্য।···শুধু কথা···আর কথা! কি হবে তা দিয়ে? কি সুন্দর আর বিষাদিতা রাত! ঐ মেয়েটি—বিষণ্ণ যার চোখ—ক্ষণে ক্ষণে সবুজ দ্যুতি ঝলসে ওঠে—মুখে খেলে যায় চপল হাসি—কি যেন ওর নাম? মাদো। ও পারীর মেয়ে, পারীতেই আছে। আমিও তো এখন পারীতে। কিন্তু আজ থেকে একবছর পরে কি হবে? ঐ মস্ত তারাটা—সবুজ তারাটা—ওতো অমনিই থাকবে··"

## চার

লাঁসিয়ে হাসলেন, তিক্ত সে হাসি। তিনি 'কালো বুধ' আর 'শুক্রবারের' কথা পড়েছেন, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে বৃহস্পতিবারটাও 'কালো' হয়ে দেখা দিল। এক সপ্তাহ আগেও তিনি ছিলেন শান্ত, সমাহিত, পুলাম্বের্র যাদু দেখাতেন,...কিন্তু ঘটনা দ্রুত ঘটে গেলো, তাঁর পক্ষে বেশ দ্রুতই। লাঁসিয়ে আবার তড়ি-ঘড়ি ভালোবাসেন না। একবার তাকে লণ্ডন থেকে বাধ্য হয়ে এরোপ্লেনে ফিরতে হয়েছিল। তাই নিয়ে বহুদিন তাঁকে প্যান-প্যান করতে শোনা গেছে। "কি আর! শুধু মেঘ আর মেঘ, আর নিজে কত ছোটো, তাই-ই তোমার মনে হবে। মানুষগুলো গতি গতি করে পাগল হয়ে গেলো, ওদের সামনে যে মৃত্যু সেকথা বোঝে না, বরং তাকে পুরস্কার বলেই ভাবে—অমরতার পাত্র যেন সে এগিয়ে এনে দেবে। হাঁ, তাড়াতাড়ি খাও, প্রেমিকা বদল কর, এক নিঃশ্বাসে বই পড়, তারপর তাড়াতাড়ি চোখ বোজ..." আর সেই বিলাসী লাঁসিয়ে একদিনে সারা জীবনে যে ধকল পোহান নি—তাই পোহাতে হোল।

গ্যাস্টন রয়কে উত্তর দিতে হোল: হাঁ, দেনা অনেকদিন আগেই শোধ করার কথা। লাঁসিয়ে গা-ঝাড়া দিলেন, বললেন: 'বেশ!' পরদিন ভোরে উঠেই য়্যাটর্নির কাছে গিয়ে সব ঠিক করে ফেললেন। এক ঘণ্টা পরে ভলাকভ-এর কাছ থেকে এলো ফোন। লাঁসিয়ে বুঝলেন, রুশ-ছোকরাটি অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কথাবার্তার শুরুতেই লাঁসিয়ে রয়কে বলে নিয়েছিলেন রোস্ আইনের হাতে কটা কাজ আছে। রয় তার উত্তরে বেশ জোর দিয়েই বলছিল: "রুশদের সঙ্গে কারবার চলবে না। ও চুক্তি বাতিল করতে হবে। এক দিনের তো খদ্দের! সবে তো চুক্তি হয়েছে ওরা নালিশ করুক না, ওরাই হারবে। আমাদের বহু খদ্দের আছে, আর তারা একআধ-দিনের জন্য নয়, ভবিষ্যতেও বহু কাজ দেবে। এবার

মাল নেবে বিলবাও..." লাঁসিয়ে এ নিয়ে বহু তর্ক করেছেন, কিন্তু রয় না-ছোড়। লাঁসিয়ে কি আর করেন, চুক্তি ভাঙতে সায় দিয়েছেন। এদিকে ভ্লাকভও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কি দুর্ভাগ্য যে চুক্তিটা ভাঙতে হোল! সম্পর্ক গেল চুকে! রয় আনাড়ি—সে ভাবে বিলবাও-এর ঐ জোচ্চোরের দল একটা মস্ত বড় রাষ্ট্রের থেকে বেশি বিশ্বাসী? আর লাঁসিয়ে কিছু না হোক আজ আটবছর ধরে রুশদের সঙ্গে ব্যবসা করছেন ...হাঁ, কিন্তু ওদের মাল সরবরাহ করা মানে রয়ের সঙ্গে ঝগড়া। আলপের্ত কেন এখন বাইরে—সে থাকলে একটা পথ বাতলে দিতোই...

লাঁসিয়ে তবু আসন্ন পরিণতিকে পিছিয়ে দিতে চাইলেন: হয়তো এরই মধ্যে আলপের্ত এসে যাবে, কিন্তু ভ্লাকভ উত্তর চায় এখুনি—একটু কেমন কড়া আর উদ্ধত যেন। তাই লাঁসিয়ে বললেন:

"আপনাকে রোস্ আইনের নতুন বিলি-ব্যবস্থার কথা বলেছিলাম—তা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। হাঁ, আমরা নতুন ব্যবস্থা করে ফেলেছি। লাঁসিয়ে আ্লপের্ত আর আমি নতুন অংশীদার নিয়েছি। গত বেস্পতিবার তার সঙ্গে আপনার পরিচয়ও হয়েছে—তিনি গ্যাস্টন রয়..."

"বুঝেছি", ভ্লাকভ বললো। "কিন্তু আপনাকে মাল সরবরাহ করতেই হবে, আমাদের য়্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করেই বলছি। তবে ভবিষ্যতে আর কোনো কাজ আমরা আপনাদের দেব না। যদি জার্মানদের কারখানার সঙ্গেই ব্যবসা করতে হয়, তাহলে একেবারে খোদ জার্মানীর সঙ্গেই করব—জার্মান সাহায্য-প্রাপ্ত ফরাসী কারখানার সঙ্গে নয়।"

লাঁসিয়ে জ্বলে উঠলেন:

"টাকাকড়ির ব্যাপারে আমি জড়িয়ে পড়েছি বলে আমাকে নিচু স্তরের মানুষ মনে করবেন না। আমি স্বাধীন ফরাসী। আপনি এমন করে আমার সঙ্গে কেন কথা বলছেন?"

"তার কারণ, আপনার অংশীদার রয় একজন গোয়েন্দা।"

লাঁসিয়ে প্রতিবাদ করলেন, জ্বলে উঠলেন। সার্জি হাসলো:

"ইওরোপ ট্রাভেল ব্যুরো সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?"

লাঁসিয়ে বিদায় না নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন, রুশটা পাগল হল নাকি! ওরা পীড়নের আশঙ্কায় পাগল, সবখানেই ওরা গোয়েন্দা

দেখে, রয় তো টাকা কোথায় পেল তা গোপন করেনি। অর্থনীতিক সংবাদ সংঘ থেকে টাকা জোগাচ্ছে। জার্মানদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? ট্রাভেল ব্যুরোকে এর সঙ্গে জড়ানো তো নিছক পাগলামি!…

লাঁসিয়ে ভেবে ঠিক করলেন, ভ্লাকভের কথার মূল্য কি! কিন্তু তবু যেন একটা খোঁচা বিঁধছে মনে…তিনি খেতে পারলেন না, মার্সেলিনের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসার উত্তরও তেমন দিলেন না; শুয়ে পড়লেন, আবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ফোন করতে ছুটলেন। রয় বাড়ি নেই, লাঁসিয়ে উদ্বিগ্ন··যদি ঐ রুশটির কথাই সত্যি হয়? আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি কিন্তু সে কিসের খোঁজ? শুধু তার অর্থের। হাঁ, টাকা তার আছে। কিন্তু কোথা থেকে আসে টাকা? এই তো সেদিন অর্থনৈতিক সংবাদ সংঘ টলমল করছিলো।

এমনই হয়—কত মানুষ ডুবে তলিয়ে যায়, আবার কেউ ভেসে ওঠে একেবারে উপরে—লাঁসিয়ে এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন—কিন্তু শান্ত হলেন না। বিকেলের দিকে রয়কে পেলেন: হাঁ, রয় যেন আজই দেখা করেন, এখুনি··· রয় জানালেন, কাল হলে কি অসুবিধে হবে। কিন্তু লাঁসিয়ে নাছোড়।

"বেশ! আর একটা ব্যাপার আছে, সেটা তাহলে আজ স্থগিত থাকবে, সিগোগ্‌নেতে আসুন—একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে।

গ্যাস্টন রয় তার নিজের নিয়ম-মাফিক চলে—তাই সব সময়ে সে সংযত। সে জানে জীবনটা নিতান্তই একঘেয়ে—একটা বাজে ব্যাপার—তার মাঝে মাঝে তাতে একটু আনন্দের ছিটেফোঁটা পড়ে। তাই খিদে তার কোনো ব্যাপারেই মন্দা হয় না, ঘুমও উবে যায় না। এই যে এখন, সিগোগ্‌নের রান্না তার কাছে চমৎকার মনে হচ্ছে—যদিও পরিস্থিতি এখন জটিল। লাঁসিয়ে যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে আছেন—মাতাল হলেন নাকি? কেন, এই তো আজ ভোরেই তারা ম্যার্টিনির ওখানে গেলেন—কথাবার্তাও ভালো করেই হোল। এমনকি লাঁসিয়ে গ্যাস্টন রয়কে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন বলে নিমন্ত্রণও করলেন।··· কিন্তু এখন? রেস্তোরাঁয় ঢুকে অংশীদারকে একটা সম্ভাষণও জানালেন না; হোটেলের পরিচারক সবিনয়ে খাদ্যতালিকা এনে সামনে ধরলে তিনি সেদিকে দৃকপাতই করলেন না। বসে পড়েই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন:

"রোস্ আইনের ছিল নাম, ছিল সাধুতা। আজ কেউ এসে আমাকে বোকা বানিয়ে যাবে তা আমি হতে দেব না। আমি ফরাসী দেশের মানুষ··· সম্মানের খেতাব লিজিয়ন অফ্ অনার আমি পেয়েছি !—ভার্দুনে লড়েছি আমি !—"

রয় ভ্রূ কোঁচকালে, তবুও স্বর তার মৃদু—সৌহৃদ্যের আমেজ তাতে আছে :

"বন্ধু, আগে কি দিয়ে সুরু করব বলুন ? আমি তো বলি লবস্টার দিয়েই সুরু হোক।"

লাঁসিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে—কেমন নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। তিনি পরিচারককে হাত নেড়ে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন, তারপর তার মুখ দিয়ে বেরুলো কতগুলো অসংলগ্ন কথা।

"কি হোল আপনার ?" রয় সাহস করে জিজ্ঞেস করলে।

"আপনিই তো কারণ।"

"আমি ?"

"হাঁ, আপনি। আমি জানতে চাই কোথা থেকে আপনি উদয় হলেন।"

কথাটা শুধু অভদ্র নয়, জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। গ্যাস্টন রয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লবস্টারের ঠ্যাং চুষতে লাগলো। আশা, লাঁসিয়ে শান্ত হবেন। কিন্তু আধ ঘণ্টা ধরে সমানে এই-ই চললো। অবশেষে লাঁসিয়ে চুপ করলেন।

"এক গেলাস রিসলিং নিন না ?"

"ধন্যবাদ, শরীরটা ভালো নেই। হয়তো একটু অভদ্রতাই করে ফেলেছি··· কিছু মনে করবেন না। আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। এখন এক আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আপনি আমার অংশীদার, আমাদের মধ্যে গোপন কিছুই নেই। আমি তো আপনাকে রোস্ আইনের সব কিছুই জানিয়েছি, কিন্তু আপনি আমাকে আসল কথাটাই বলেন নি ?"

"কিছুই তো বুঝতে পারছি না মঁসিয়ে ··"

"আপনার এই সংঘটি আসলে কি আমি জানতে চাই।"

"হা ভগবান্! একথা তো আপনাকে বহুবার বলেছি। আমরা ফরাসী দেশের শিল্পের খবরাখবর সংগ্রহ করি, তাদের সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করি।

"কেন ?"

"আমাদের কাগজের জন্তে। কেন, আপনি কি আমাদের কাগজ পান না ?"

পাই, সে কাগজ ছশো চলে, বার্ষিক চাঁদা তিনশো ফ্রাঁ, আপনি কি আমাকে বোকা ঠাওরালেন ?" লাঁসিয়ের স্বর চড়লো।

"এতো আপনি আগেও জানতেন।"

"তখন ভেবে দেখিনি।"

ছেদ পড়লো, রয় খুশি : আর নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণের আশঙ্কা নেই। সে ঢালা হুকুম দিলে, ভাঁপে সেদ্ধ গরুর মাংস চাই। রান্নাটাও চমৎকার! একটি মেয়ে একগোছা নার্সিশাস ফুল কিনতে বললে। তারার মতো দেখাচ্ছে ফুলগুলো। পাশের ঘরে নাচ সুরু হয়েছে, স্যাক্সোফোনে ভালোবাসার আকুতি। হঠাৎ লাঁসিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললেন…

"ইওরোপ ব্যুরোর ব্যাপারটা কি ?"

রয়ের মুখের উপর পড়ছে তার ঘন নিঃশ্বাস।

এমনি তিনি সংযত, আত্মস্থ, কিন্তু একটু বিব্রত না হয়ে পারল না রয়। তার কাঁটাটা প্লেট আর ঠোঁটের মাঝামাঝি থেমে গেল। এবার সে বুঝতে পারলে, লাঁসিয়ের চিৎকারের কি মানে। পরিস্থিতিটা সহজ নয়। সে যে কোনো খারাপ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, তা মনে হোল না। কিন্তু অংশীদার তার কৌশল জেনে ফেলেছে এতেই সে বিব্রত হয়ে পড়লো।

যদি—এ জার্মানীর টাকা হয়, আমি নেব না। বুঝতে পারছেন—আমি এ টাকা নেব না—ছোঁব না!

রয় বুঝতে পারলো, তার সুমুখে যিনি বসে আছেন তিনি ভাগ্যবান ব্যক্তি—জীবন তাঁর কেটেছে আত্মার শান্তিতে, এক নিষ্পাপ শিশু যেন—পৃথিবীর শঠতা আর লোভের ভিতরে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ওর কাছে সহজ সরল সত্য প্রকাশ করতে যাওয়া শক্ত। অথচ রয়ের মতে জীবনের সেই-ই একমাত্র আইন। এক দেউলে পুঁজিপতির সে ছেলে, আইন পড়ে ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিল—কিন্তু তার প্রতি মোহ ছিল না—তার জীবন এমনি ভাবেই গড়ে উঠেছে। বিলাসিতার দিকে তার ঝোঁক নেই, কিন্তু ভদ্রভাবে জীবন সে

যাপন করতে চায়। স্ত্রী বা সন্তানকে স্বাচ্ছন্দ্য থেকে সে বঞ্চিত করতে রাজি নয়। লাঁসিয়ের ব্যবহার তাকে যেন অপমান হয়েই বাজল। এই যে বোকাটা—একটা আফ্রিকার ছাগলের মালিক—তার চাইতে এ বড় কিসে?…সত্যি, গ্যাস্টন রয় ধনবান শ্বশুর জোটাতে পারে নি। নিজের সমান স্তরে বিয়ে করেছে, আর করেছে কঠোর পরিশ্রম-রয় ব্যক্তিগত জীবনে ভদ্রলোক; সে তার দেনা পরিশোধ করে ঠিক সময়ে, পরের কুৎসা রটায় না, তার গরীব ভাইপোদের সাহায্য করে, এমনভাবে সন্তানদের পালন করছে যাতে তারা বিগড়ে না যায়, চোর কি জোচ্চোর না হয়। কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে তার নীতিবোধ সে ভুলে যায়। সে প্রায়ই বলে, পনীরের গন্ধ শুঁকে লাভ কি?—কেন না সে তো আপনা থেকেই গন্ধ ছড়াবে। সে শার্কের সঙ্গে কাজ করছে, উৎসাহ তার নেই, তেমনি নেই লজ্জা। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর তার নজর, তাদের সঙ্কট সময়ে সে শার্কেকে খবর দেয়, রোস্ আইনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শার্কের হচ্ছে, লাঁসিয়েকে টাকা জোগানো: কোম্পানীকে নাভিশ্বাস থেকে উদ্ধার। রয় তো দালাল মাত্র, খুবই সহজ ব্যাপার, কেমন একঘেয়েও যেন। নিত্যিই এমনি হচ্ছে, কিন্তু যে জীবনকে ভাবে সুন্দর কবিতা—যার আছে বাঁধা আয়ের বন্দোবস্ত তাকে কি করে বোঝাবে এ কথা?..

"বুঝতে পারছি না আপনি কেন এত উত্তেজিত হচ্ছেন? টাকা—টাকা! এখানে তো কোনো ঢাকাঢাকি নেই—তাছাড়া চেক ফিরে আসবার ভয়ও নেই। আজকালকার দিনে কতরকম স্বার্থ থাকে মানুষের। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে পড়ে।…হাঁ, ইওরোপ ব্যুরোর সঙ্গে আমার ব্যবসায়-সম্পর্ক আছে বইকি। তাতে কি হয়েছে?"

"কিন্তু—তারা—" লাঁসিয়ের উত্তেজনায় স্বর ভেঙে গেছে, "তারা জার্মান!"

"দেখুন আগেই বলেছি ব্যবসার জগতে সীমান্ত বলে কিছু নেই। ওরা ভালো লোক জানি। তাদের জাতি নিয়ে মাথা ঘামাব কেন?"

"আপনি নিজেই স্বীকার করছেন ওরা জার্মান?"

"যতদূর জানি, জার্মানার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বাধে নি।…"

"আজ বাধে নি, কিন্তু কাল…"

"আপনি নিজেই তো এই গুজব শুনে হেসেছেন। আপনিই না বলেছেন একটা আপোস হবেই।"

"নিশ্চয়ই। যদি রিবেনট্রপ-এর সঙ্গে বনেৎ-এর বোঝাপড়া হয়তো খুব ভালো। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার—একেবারে ব্যক্তিগত···আমি ফরাসী, না তা নই?"

"আজ আপনার সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। আপনি একটা শুকনো গন্ধময় বিষয়ের ভিতরে অনেকখানি উচ্ছ্বাস আমদানি করে ফেলেছেন। যদি যুদ্ধই বাঁধে, আমি লড়তেই এগিয়ে যাব। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একজন লেফটেনাণ্ট। কিন্তু যুদ্ধ নেই—আর আমার বিশ্বাস যুদ্ধ হবেও না। এই আমার প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ইওরোপ ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ একমাত্র আমারই। রোস্ আইনে ফরাসী প্রতিষ্ঠান। কেউ তার ওপরে জোর করে কোনো দাবী চাপাতে পারবে না। আপনি কি আমার কথা অবিশ্বাস করছেন? কিন্তু মঁসিয়ে আলপের্তের কথাই ধরুন না—তিনি যে এখনো অংশীদার আছেন তাতে কি প্রমাণ হয়?···আমার কোনো সংস্কার নেই; আমার কাছে ইহুদী, ক্যাথলিক, বৌদ্ধ—সবই এক। কিন্তু জার্মানীতে ওরা অন্যরকম ভাবে। যদি শার্কে রো.স্ আইনের ব্যাপারে হাত দিতে যেতেন তাহলে প্রথমেই তিনি দাবী করতেন: মঁসিয়ে আলপের্তকে সরাতে হবে।"

"তারপর? হয়তো ভদ্রলোকেরা শেষে আমাকেই সরাবার দাবী জানাবেন?"

"উত্তেজিত হবেন না মঁসিয়ে। আবার বলছি: আমাদের ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।"

"থামুন! এই রাশিয়ার কাজটার ব্যাপারটায় হাত পড়লো কেন?"

"শার্কের এতে কোনো হাত নেই। আমিই নিজে সে দায়িত্ব নিয়েছি। আপনি জানেন, আমি রাজনীতির কারবার করি নে। তাছাড়া ব্যবসায়ে কোনো মতবাদ ঢোকাতে একেবারে গররাজি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, রাশিয়ার ঐ কাজটায় আমাদের লাভই হবে না। তাই বিলাও-এর ইলেকট্রার সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছি। ভুলও আমার হতে

পারে। তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কও চলতে পারে···কিন্তু ইওরোপ ব্যুরোর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার রাজনীতির জ্বরের ঘোরটুকু না থাকলে দেখতে পেতেন, জার্মানরা আমাদের ভিতরের ব্যাপার নিয়ে খুব কমই মাথা ঘামায়। তারা ডান্‌জিগ আবার ফিরে চায় বটে, কিন্তু আমাদের সরকারের কি চেহারা—তা নিযে একটুও ভাবে না। মনে রাখবেন, হিটলারের ভক্ত আমি নই। জার্মানীর পক্ষে সে হয়তো ভালোই, কিন্তু আমাদের এই দেশে এক হপ্তাও অমন রাজা টিঁকবে না। আমি শুধু বলতে চাই, হিটলার তার ভাবধারা রপ্তানি করতে চান না, বরং একচেটে করে রেখেছেন। তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদীও বলা যায়। ওদের দলের কথাই ধরুন না—জাতীয় কথাটাই প্রথম আছে। তার মানে একেবারে খাঁটি জার্মান ওরা। লোকে বলে, ওদের ভাবধারা নাকি প্লেগের মতোই বিষাক্ত। জানি না···আর যদি হয়ও বা, জার্মানরাই সে প্লেগে ভুগবে। কিন্তু মস্কৌর ব্যাপার একেবারে আলাদা···কমিউনিষ্ট কোথায় না আছে, এমন যে প্যাটাগনিয়া সেখানেও তারা গিস্‌গিস্ করছে। আর নিজেদের এলাকা নিযে রুশরা খুশিও নয়। আপনি শুনেছেন তো, আমাদের বোকারামরা চৌদ্দই জুলাই জিগীর তুলেছিল: সর্বত্র সোভিয়েৎ চাই!—এইখানেই রয়েছে আসল বিপদ···"

রয় এবার বলতে লাগলো শত্রুর ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা, ফ্রান্স শান্তি চায়, সে-শান্তি সে দেবে না। রয় অনুভব করলো ঝড় শেষ, লাঁসিয়ে শান্ত। একটু ভাঁপানো মাংসও খাচ্ছেন। ডিনারের শেষ দিকটায় শান্ত আবহাওয়া যেন বইছে। স্যাকসাফোনে এখন গীতি-বিলাপ। টেবিলের উপরে নাসিশাসের গোছায় ঘন সুগন্ধ।

রয় পরিচারককে ডাকলো, পাওনা চুকিয়ে দেবে। লাঁসিযে থলি বার করলেন—হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল—সব কিছু আবার মনে ভেসে উঠলো, তিনি ঘৃণাভরে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলেন: "জার্মান!" একটা তীব্র আক্রমণ—মাথা ঘুরছে, বমি পাচ্ছে। তিনি ল্যাভেটরীতে গিয়ে বমি করে ফেললেন। তারপর কষ্টেসৃষ্টে বেরিয়ে এসে পৌছলেন কোনো-রকমে। মার্সেলিন তার বিবর্ণ মুখ দেখে ভয় পেলেন। কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে:

"কিছু নয়...ভয় পেও না...সিগোগনে রব-এর সঙ্গে খেলাম...তারপর শরীরটা খারাপ হোল..."

"কি খেয়েছ? কি খেয়ে পেট গুলিয়ে উঠলো?"

"না,...না...সব স্নায়ুর ব্যাপার...আমি ক্লান্ত..."

ভিজে তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে বহুক্ষণ শুয়ে রইলেন। মার্সেলিনের ছায়া ঝলসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে সাদা দেয়ালে। কখনো ভাবেন নি, ঘড়ি এত জোরে শব্দ করে। স্ত্রী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছেন, "মরিস—"

তিনি ভেঙে পড়লেন।

"মার্সেলিন, ক্ষমা কর! সব কিছু আমি হারালাম—সব—সব—আমাদের গেলিনো বিক্রি করতে হবে। কি ভয়ানক! আমি চাইনি, তবু সবই ঠিক করে এলাম। রবের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে আজ ভোরে, কিন্তু সে তো অসম্ভব।—কিসের টাকা কারবারে আনছি জানো মার্সেলিন?"

মার্সেলিন ভয় পেয়ে তাকালেন।

"চুরির টাকা?"

"না, জার্মানীর টাকা।"

তিনি বলেই ভাবলেন: কেন বললাম?—জার্মানরা মার্সেলিনের কে? সে তো ভিন্ন জগতের বাসিন্দে।—তাছাড়া একটু কি বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না? রয় তো বেশ যুক্তি দিয়েই বুঝিয়ে দিলে, তখন তো উত্তর যোগায় নি। হাঁ, একথা সত্যি ও ওয়েন্দেলকে সবাই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আমি তো পারি না। আমার ঐ ধাত।—কিন্তু মার্সেলিন?

মার্সেলিন নিঃশব্দে কাঁদছেন, আমার হাতায় মুখ ঢেকে কাঁদছেন। টুকরো-টাকরা ছবি, অসংলগ্ন কথা মনে ঝলসে উঠছে যেমন শীতের রাতে চাঁদের আলো-ঝলা সবুজ আকাশে মাঝে মাঝে দেখা দেয় খণ্ড মেঘ বুড়...মরিস...তার পরনে একটা লম্বা কোট...দাড়ি কামায়নি...সবাই বলাবলি করছে ঐ হুণের দল পারী কেড়ে নেবে...ভগবান, যেন সত্যি না হয় ওদের কথা! সত্যিই মরিস কি পারবে? চোখের জল সংবরণ করে তিনি বললেন:

"তার চেয়ে সব কিছু বেচে দাও—এই করবেইয়ে...এই বইপত্র...সবকিছু। মরিস তোমার কি নয়েসির কথা মনে পড়ে?"

কতদিন আগের সে কথা! মরিস ছুটি নিয়ে ফিরেছেন। দুজনে ক'টাদিন কাটাবেন, এমন সময় তার এল নয়েসী থেকে—মরিসের ছোট ভাই রেনে—উনিশ বছর তার বয়েস—সে সেখানে হাঁসপাতালে। সাংঘাতিক আহত হয়েছে, যন্ত্রণাও ভীষণ। চারদিন ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বললো না, ঘুমোল না। রেনে মারা গেল, মরিস চলে গেলেন ভার্দুনে। লোকে বলে, মার্চের গানের কটা কলি শুনলে বুকে এখনো দোলা লাগে, একটা বুলেট-দাগী নিশান কি সমাধির উপর প্রায়-মুছে-যাওয়া নাম নাকি জাগিয়ে তুলতে পারে সেই দিনগুলিকে। লাসিয়ে আর মার্সেলিন দাঁড়িয়েছিলেন চুপ করে···বুক ফেটে যাচ্ছিল। রেনে, ছায়ার মতো রেনে, এপাশ-ওপাশ করছে জ্বরের ঘোরে। ওরা পরস্পরের হাত ধরলেন, চোখ খোলা—কিন্তু নিশি-পাওয়া মানুষের মতোই দেখতে তারা পেলেন না।···

লাঁসিয়ে গা এলিয়ে দিলেন কাউচে, বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতের উপর গাল রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু মার্সেলিনের ঘুম এলো না। অস্পষ্ট ভাবনা নিয়ে এল আশঙ্কা—কিছু একটা ঘটবেই। জীবন এতদিন কেটেছে নিরুদ্বেগে, কিন্তু একটা জিনিষের অভাব ছিল। সেটাই প্রধান—তারই স্বপ্ন দেখেছেন কুমারীকালে। কিন্তু কি সে জিনিষ? তিনি জানতে চান, অথচ পারছেন না—ভাবনা এলোমেলো হয়ে আসছে, নানা দিকে চলেছে। রেনে—রেনে—এপাশ-ওপাশ করছে বিছানায়···হঠাৎ মার্সেলিনের মনে পড়লো দেশের কথা—ফ্রান্সের কথা—এক মেয়ে যেন। কি আছে তার ভাগ্যে? কি হবে তার? শুধু মরিসই প্রতারিত হচ্ছে না···সবাই বলছে, যুদ্ধ হবেই—মার্সেলিন ভয় পেলেন: জাগাতে গেলেন মরিসকে। আবার ক্ষণিক ভেবে নিজেকে সংযত করলেন। এবার মোরগ ডাকছে—এই গ্রাম্য ডাক শুনলে মনটা খুশি হয়, কিন্তু আজ যেন ওর ডাকেও অশুভ ইঙ্গিত। একটা গ্রীষ্মের রাত—ক্ষণিকের আয়ু তার—অথচ এই এক রাতে ভাবাবেগের তুফান বয়ে গেল—সারা জীবনের আবেগ এক রাতে এসে হানা দিল। ভোরে মার্সেলিন জেগে উঠলেন, কি বিশ্রী হয়েছে তার চেহারা। যেন বুড়িয়ে গেছেন অনেকখানি।

লাঁসিয়েও জেগে উঠলেন। উচ্ছৃঙ্খল রাতের পর মাতাল যেমন জাগে, তেমনি তার অবস্থা। মাথা ভারি ঠেকছে। আগের দিনের ঘটনা মনে

আনতে চেষ্টা করলেন। হঠাৎ মাদোকে দেখলেন জানালা দিয়ে। একটা ভাঁজ-করা ইজেল নিয়ে সে চলেছে। সুন্দরী সে—বাপের কাছে আজ যেন আরো সুন্দর মনে হোলো। উজ্জ্বল দিন, আলোর খেলা দিকে দিকে। লাঁসিয়ে স্নানের ঘরে গেলেন। জল বেশ গরম, পাইনের গন্ধ উঠছে। দাড়ি কামালেন, সাবানের ফেনা মাখানো ব্রুশটা গালে স্নেহের পরশ যেন বুলিয়ে দিচ্ছে। আলমা, তার প্রিয় কুকুর বসে আছে প্রভুর প্রতীক্ষায়, লেজের ঝাপটা মারছে ক্ষণে ক্ষণে। "এই বেটা ঢাকী—দেখ না—লেজের ঝাপটা মারছে না যেন ঢাক পেটাচ্ছে—"

লাঁসিয়ে বললেন, মনটা কেমন শান্ত এখন। হাঁ, 'কালো বৃহস্পতিবার' চলে গেছে, কাল একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন বই কি।··· রয়-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু এখুনি নয়—আস্তে আস্তে কোনো কেলেঙ্কারী না করে। সবচেয়ে ভালো হয়, আলপেত না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা—সে এসে যা হয় করবে, আলপের্ত আগস্টের বেশি দেরি করবে না। থাক্‌গে ওসব! এখন তো প্রাতরাশটা সেরে নেওয়া যাক।···

তিনি কফির সুগন্ধ নাক দিয়ে টানলেন, কেমন চাঙা করে দেয় যেন। মার্সেলিন এবার এসে ঢুকলেন খাবার ঘরে। লাঁসিয়ে অনুতপ্ত—ওকে না বললেও চলতো। দেখ, কেমন হয়ে গেছে ওর চেহারা···

মরিস, যাও চোজারের সঙ্গে এখুনি দেখা করো, সে গেলিনো তাড়াতাড়ি বিক্রির বন্দোবস্ত করে দেবে।

লাঁসিয়ে তাং হাত তুলে ধরে চুমু খেলেন।

"বেশ···বেশ···শুধু অতো ভেবো না তুমি! সব ঠিক হয়ে যাবে।··· আলপের্তকে তার করছি।"

# পাঁচ

কিযেভ-এ বসে তার পেলেন লিও আলপের্ত। লাঁসিযে তার করেছেন, "রয়-এর সঙ্গে চুক্তির পর পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠানের সুনাম ডুবু-ডুবু, তাড়াতাড়ি এস।" অন্য কেউ হলে ঘাবড়ে যেত, কিন্তু আলপেত হাসলেন, প্রসাধন করতে বসলেন তিনি। তিনি বিশ বছরের ভিতরেও যে কিযেভ-এ আসবেন একথা ভাবেন নি। যদি বা এলেন, এসেই চলে যাবেন! প্রতিষ্ঠানের সুনাম! · যেন কোনো যুবতী মেয়ের কথা বলছেন লাঁসিয়ে। অতিরঞ্জনে তার ঝোঁক...

আলপের্তকে দমিযে দেওযা শক্ত। তিনি বিশ্বাস করেন যা কিছু ঘটছে, ভালোর জন্যেই ঘটছে। কেউ হযতো তাকে সৌভাগ্যের বরপুত্র ভাবতে পারেন, কিন্তু তা নয়। তার জীবন অদ্ভুত—ঝড়-ঝাপটাও গেছে।

বহুদিন আগে নাউম আলপেৰ্ত বলে এক দর্জি ছিল কিয়েভ-এর কাছে স্নোবোদকায়, তাকে লোকে বলত 'পাগলা'। দর্জি হিসেবে সে ছিল ভালোই, আর এমনি মেজাজটাও ছিল ঠাণ্ডা। কিন্তু এক দিকে সে ছিল আবার ভারি অদ্ভুত—নানা উদ্ভট কল্পনার জাল বুনতো। এক এক সময়ে সে চেঁচিয়ে উঠতো: "যদি গভর্ণর জেনারেল হতাম, স্নোবোদকায় একশোখানা বড় বাড়ি তুলতাম।" কখনো বা সে বলতো নিউ-ইয়র্কের কথা, যেন সেখানেই তার জীবন কেটেছে। নতুন খদ্দের ভাবতো: লোকটা আজ একটু বেশি টেনেছে; কিন্তু আলপেত ভদকা ছুঁতো না। সে খেত কড়া সুগন্ধি চা।

একদিন আলপের্ত পারী থেকে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের চিঠি পেল, নাম তার কিশকিন। সে লিখেছে, পারীতে দর্জির দোকান খুলে বসেছে, এখন সে খাটি ফরাসী আর তার জন্যে ভগবানকে সে বার বার ধন্যবাদ দেয়। এই চিঠি আলপের্তের সর্বনাশ করলো। সে ঠিক করলো স্নোবদকা ছেড়ে পারী যাবে। স্ত্রী প্রতিবাদ জানালো: মাকে ছেড়ে কি করে যাব? আর বিদেশে গিয়ে কি করব? কথা কইবার লোকই পাওয়া যাবে না! ঐ কিশকিন তোমার কেমন কুটুম কে জানে—কিন্তু ওকি আর

দিশী আছে! একেবারে বিদেশী বনে গেছে। এখানে যে সুখে আছি তা নয়, তবু লোকে আমার কথা বোঝে, পাগলা নিয়ে ঘর করছি এ কথা শুনলে একটু আহা, উহুও করে,…” কিন্তু বারো বছরের লিওভার কাছে বাবার এই মতলবটা ভারি ভালো লাগলো, সে লুব্ধ হয়ে উঠলো। যেখানে সেখানে জা'হির করে বেড়াতে লাগলো, কোথায় যাচ্ছি আমরা জানো? পারী—পারী! ক'মাস ধরে স্বামী-স্ত্রীতে চললো কথা কাটাকাটি, তারপর হঠাৎ এমন এক ব্যাপার ঘটলো—স্লোবোদকার সবাই অবাক, একদিন লিওভাকে নিয়ে চলে গেল 'পাগলা'টা। খুদে ওসিয়া রইলো তার মার কাছে। বিদায়ের সময় ঝরলো চোখের জল। নাউম বারবার বললে, পারী যদি কিশাকন-বর্ণিত স্বর্গ না হয় তো সে ফিরেই আসবে। হানাও পালটা রাজি হোলো যে, স্বামী যদি কিছু করতে পারে তো সেও সব বেচে দিয়ে মাকে ছেড়ে চলে আসবে।

কিন্তু পারী স্লোবোদকার দর্জির কাজে স্বর্গ বলে মনে হোল না। আলোময় পারী, ভালো ভালো বিলিতি কাপড়ও মেলে, বাড়ির ছাড়পত্রের জন্ম উদ্বিগ্নতাও এখানে নেই, কিন্তু এ স্বর্গে তার ঠাঁই নেই। কিশকিন আলপের্তকে ডিনারে ডাকলো, কেমন করে এখানে চলতে হবে সে পরামর্শ দিল। কিশকিনের ছেলে ফরাসী ভাষায় ছাড়া কথা কয় না, দর্জি ভাবলে, সে যে কেউকেটা হয়েছে তারই প্রমাণ দিচ্ছে।

আলপের্ত একটা ছোট্ট, আঁধার দোকানঘর ভাড়া নিলে একেবারে শহরের নোংরা পাড়ায়। বস্তি বাসিন্দাদের পোষাকে তালি মেরে তার দিন চললো। বাড়িমুখো হয়ে উঠলো মন, অভিযোগের গুঞ্জন শুরু হোলো: “পারীতে তেমন চা মেলে না, খাটি মানুষেরও অভাব।” বুড়িয়ে গেল সে, যেন একটা গাছকে তুলে এনে যা-তা করে পুঁতেছে। কিন্তু লিওভা ফরাসী শিখে ফেললো, বন্ধুও তার জুটেছে। এখন তার বাবা এক গেলাস রুশীয় চা খেতে চাইলে সে তাকে শুধরে দেয়: “না, চা নয়—ভদ্রলোকেরা কফি খায়।”

দর্জি বাড়ি ফেরবার জন্ম পাগল, কিন্তু বাইরে তা স্বীকার করতে নারাজ। আবার বিদেশেও আর থাকা যায় না। শেষে সে কিয়েভ-এ ফিরবে ঠিক করলো।

যুদ্ধ বাধা দিল। হানার চিঠি আর আসে না। কিয়েভ এখন নাগালের বাইরে। পারী অন্ধকার আর বিশ্রী: সমৃদ্ধ মহল্লা এখন পরিত্যক্ত। আলপের্তের প্রতিবেশীরা যুদ্ধে চলে গেছে, তাদের স্ত্রীরা দর্জিকে গালাগাল দিতে শুরু করেছে। বিদেশের রুটি খাচ্ছে অথচ তাকে রক্ষা করতে নারাজ। আলপের্ত দুনিয়ার রাজনীতির ধার ধারত না, কিন্তু গর্ব তার ছিলো। যে রুটিওলার কাছ থেকে সে নিয়মিত রুটি কিনতো, তার স্ত্রী যখন কেঁদে বললে, 'জেফ্‌ মারা গেছে, শার্লের গেছে একখানা পা, আজ পারীতে তোমার মতো ভীরু ছাড়া আর কেউ নেই।' কিশকিনদের কাছে গেল আলপের্ত।

"ওরা আমাকে অষ্টপ্রহর শোনাচ্ছে, আমি বেঁচে আছি, আমার দু'খানা পা এখনো আস্ত—আর তো সহ্য হয় না। লিওভার ভার তুমি নাও। একে তো তুমি আমার আত্মীয়, তাছাড়া তোমাদের ফ্রান্সকে রক্ষা করতেই যাচ্ছি।"

চার মাস পরে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর প্রাইভেট নাউম আলপের্ত শাম্পেনে নিহত হোলো।

কিশকিনরা খারাপ লোক একথা বলা বোধ হয় ভুল, কিন্তু লিওভা কখনো তাদের কাছে দুটো মিষ্টি কথা শোনে নি। যখন নাউমের হত হবার খবর এল, বুড়ো কিশকিন বললে, "তোমার বাবা বীরের মতো মরেছেন।" তারপর একটু থেমে: "ভয় নেই, আমরা তোমাকে পথে ছুঁড়ে ফেলব না।" লিওভা বিশ্বাস করতে পারল না, তার বাবা মারা গেছে। বহুদিন পরের কথা! কিশকিন একদিন তার স্ত্রীকে চা করতে বললে। চায়ের নাম শুনে সে তার ছোট্ট কুঠরীতে গিয়ে কাঁদলে, অঝোরে ঝরল জল।

দুর্ভাগ্য কিশকিনদের উপর এসেও হানা দিল। ভার্দুনে মারা গেল তাদের ছেলে। বুড়ো গুম মেরে গেল। স্ত্রী, দোকানের কাউণ্টারে বসে যে দোকানে আসে তাকেই বলে ভিক্টরের কথা। ছেলেবেলায় সে কেমন ছিল, আর কাঁদে। শেষে সেও বছরখানেক পরে মারা গেল।

লিওভা ভাবত: যুদ্ধ শেষ হলে আমি কিয়েভ-এ ফিরে যাব। দিন, মাস আর বছর চলে গেল। যুদ্ধ কবে শেষ হয়েছে, কিন্তু লিওভার কিয়েভ-এ ফেরা আর হয় নি। এখন সে আর আগের লিওভা নেই।

বেশভূষায় ছিমছাম তরুণ, পড়ছে অঙ্ক নিয়ে—খ্যাতির স্বপ্ন সে দেখে। পড়া শেষ করে তার ইচ্ছে হোল গীতি-নাট্য লিখবে। এর মধ্যে কিশকিন দেউলে হয়ে মারা গেলো। কয়েক বছর লিও জীবিকার উপায় খুঁজলো না, তখন তার উচ্ছৃলতা যায় নি। সব চেয়ে দুর্দশার সময়েও সে ছেলেবেলায়-শোনা গান গাইত।

বসন্ত যখন ফিরে আসবে
ভাগ্য তখন হাসবে···

এক মেয়েদের সাজসরঞ্জাম বিক্রেতার সুশ্রী মেয়েকে এবার সে বিয়ে করলো। ভাগ্যের কি খেয়াল, তারও নাম লিওনতাইন। এবার এল তার প্রতিষ্ঠিত হবার ইচ্ছে। বিফল নাট্যকার হয়ে উঠলো সফল এঞ্জিনিয়ার। তার একটা আবিষ্কার আমেরিকায় বিক্রি হোল। এবার যোগাযোগ হোল লাঁসিয়ের সঙ্গে; কোথায় যেন তাদের মিল আছে। হয়তো তাদের ঢিলেঢালা স্বভাবেরই এই মিল। বন্ধুত্ব হোল, লিও আলপের্ত হোলো পুরনো ফরাসা প্রতিষ্ঠান রোস্-আইন-এর একজন অংশীদার।

ফিয়েভ-এ ফেরার স্বপ্ন এতদিন সে দেখেছে, এবার এলো সেই সময়। মা আর ভাইয়ের কাছে হাজির হতে সে আর লজ্জিত হোলো না।

দাড়ি কামিয়ে সে উত্তর লিখলো: তুমি যা করবে তাই-ই হবে। উতলা হোয়ো না, শরীরের উপর নজর রেখো। আগস্টের গোড়ার দিকে ফিরছি।

পথের দিকে সে তাকাল অবাক হয়ে। বাড়ি আর মানুষগুলোকে দেখলো। হয়তো কিয়েভই বদলে গেছে। অথবা মানুষই কি এমনভাবে তৈরি যে, তার ছেলেবেলার স্মৃতি বদলে যেতে যেতে কল্পলোকের জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়? শহরটাকে চিনতে পারলে না লিও। মাকেও না। তার কাছে তাঁর ফটো আছে, তাতে সে দেখেছে এক তরুণীকে, মাথায় তার বড় কানাওয়ালা টুপি। কিন্তু আজ যিনি হোটেলে এসে ঢুকলেন, তিনি বুড়ী —পাখীর মতোই ছোট। তিনি ডাকলেন: "লিওভা", তারপর কেঁদে ফেললেন। তার শীর্ণ হাতে চুমু খেয়ে লিওভা ফরাসী আর রুশ-ভাষা মিশিয়ে বললে: "মা, সব ঠিক হয়ে যাবে···"

ভাইকে দেখে লিওভা হকচকিয়ে গেল—কি বলবে ভেবে পেল না। ওসিপও চুপচাপ। ওদের দিকে তাকিয়ে বলা মুশকিল যে ওরা ভাই। সাদৃশ্য কমই। লিও বেশ নধরকান্তি, চুল তার কোঁকড়া, মুখে সমৃদ্ধির ছাপ। তার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সে সবাইকে বিশ্বাস করতে পারে, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে নারাজ। ওসিপের কালো চুল, মুখে গাম্ভার্য, নাক চোখা, ঠোঁট দুখানা চাপা, ভারি চাপা, কথা বলে শুকনো নিরস স্বরে, প্রিয়জনকেও খবরের কাগজের ভাষায় সম্বোধন করে। উচিত-বক্তা হিসেবে তার খ্যাতি, এতে নিন্দে আর প্রশংসা দুই-ই মেলে। মাঝে মাঝে এর সৌন্দর্য অভিভূত করে, মাঝে মাঝে আবার নিষ্ঠুরতা পীড়া দেয়। জীবনের পথে সে সমান তালে চলেছে। কাল, আগামী-বছর, বা বিশবছর পরে সে কি হবে তাকে দেখলেই বোঝা যায়।

নিঃশব্দে ধূমপান চললো, অপরিচিতের মতোই তারা কথা বলছে—যেন হঠাৎ দুজনে এসে পড়েছে এক ঘরে। দু-চারটে কথা না বললেই নয়। লিও ক্ষুব্ধ। যে সে কোনো অপরিচিতের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। তবু কি ভাইয়ের সঙ্গে সে তা পারবে, মনের কথা কি বলা যাবে? ক'বার সে মিতালি পাতাতে গেল: স্বরে নিয়ে এলো বন্ধুত্বের কোমলতা, কিন্তু ওসিপ ঠাণ্ডা, কেমন যেন হাঁ, হুঁ উত্তর দিয়ে যাচ্ছে: অন্তরঙ্গতা ভরা 'তুই' তার কথায় মিলছে না, 'তুমির' পালাই চলছে।

ওসিয়া, তুমি রাজনীতিজ্ঞের মতো কেন ব্যবহার করছ বলতো। জানি তুমি কমিউনিষ্ট, কিন্তু তা দিয়ে আমার দরকার কি! আমার কাছে তুমি ভাই, আমার দিকে তাকিয়ে অমন মুখভঙ্গী কোরো না—আমি একটা সাংঘাতিক পুঁজিবাদী নই। আমাদের বাবা নাউম আলপের্ত আর যাই হোন, রথস্‌চাইলড কি ডিটারাডিং ছিলেন না। আমি অবশ্য এখন একটা কারখানার মালিক, কিন্তু সেও নিজের পছন্দে নয়। ভাগ্যের ভুলে এখানে এসে আমি পৌঁছেছি। যদিও ভুলটা মিষ্টিই। ভয় নেই, তোমাকে আমি খেয়ে ফেলব না। আর এখানে আমি বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রের জাল পাততেও আসিনি।

ওসিপ হাসলো, মুহূর্তের জন্য তার মুখে এল কোমলতা।

না, তা তুমি করবে না জানি, তবু তোমার সঙ্গে কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকছে। আমরা দুজনে একেবারে আলাদা। বাইরে আমি যাইনি,

কিন্তু এ কথা জানি সে এক আলাদা পৃথিবী। আমরা আলাদা থাকি, আলাদা ভাবি।"

"এটা কিন্তু তর্কের বিষয়। আমার তো মনে হয়, সবার অনুভূতি এক তারা ব্যথা পেলে কাঁদে—তাদের সুড়সুড়ি দিলে হাসে। আমি দেখতে এসেছি, তোমরা কেমন আছো।"

লিও বাড়ি যেতে চাইলেন, তার মা আর ভাই থাকে সেখানে। ওসিপ বললে, "আজ দেরী হয়ে গেছে···কাল তোমার জন্যে আমরা প্রতীক্ষা করব।"

হানা আলপের্ত ঘর দুটো সাফ করতে লেগে গেলেন ভোরে উঠে। তিনি আর নাতনী আলিয়া থাকেন এক ঘরে, আর একঘরে ওসিপ আর তার স্ত্রী রায়া। হানা একটা ট্রাঙ্ক থেকে বার করলেন একখানা পুরনো টেবিল ঢাকনা—ভাদের তোয়ালে নেই বলে আপসোসও করলেন। রায়াকে বললেন: "না, সুবিধে হোল না···ওতো আবার বিদেশী।" ঝাড়ন দিয়ে চোখ মুছলেন—তার খুদে লিওভা 'বিদেশী!' রায়া ভাবলো: "আমি হলে ওকে কিছুতেই এখানে আসতে দিতাম না!"

রায়া হানাকে সাহায্য করতে এল, কিন্তু বুড়ী বকতে লাগলেন। বাড়ীতে রায়াকে সবাই দুর্বল বলে জানে। তাকে বাজার করতে বা রাঁধতে দেয় না। খুদে মেয়েটি ভারি সুশ্রী—সোনালি চুল—গভীর কালো দুই চোখ। সিটি সোভিয়েৎ-এ সে কেরাণী। গান ভালোবাসে, নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। পঁচিশ বছর তার বয়েস, কিন্তু ছেলেমানষি এখনো আছে। স্বামীকে তার চাইতে অনেক বড় বলে মনে হয়, সেও তাই মনে করে। সে জানে স্বামী তার চেয়ে অনেক বোঝে, বহু তার অভিজ্ঞতা—তাই তার প্রতিটি কথা সে বিশ্বাস করে। কিন্তু আপন মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে: "আমি যেমন করে বাঁচতে চাই, ওতো তা বোঝে না।" হাঁ, সব কিছুই আমরা গড়ে তুলব, কিন্তু আমি তো আর যৌবন ফিরে পাব না···একদিন সে এক মার্কিন ছবি দেখলো, বিশ্রী লাগলো তার! কি বাজে গল্প! কিন্তু রাতে ভালো ঘুম হোল না—সারা রাত ধরে সে দেখলো মিয়ামি সৈকতের সেই ছবি—পাম গাছের আড়ালে ঘুরছে মেয়েরা, অলস বিলাসে মত্ত প্রেমিক-প্রেমিকা। ওসিপকে সে ভালোবেসেছিল তার আলাদা ধরণ-ধারণ দেখে। তার সাধুতা আর উদ্ধত পৌরুষ তাকে মুগ্ধ করেছিল। এমন পুরুষ পেলে, বিপথে যাওয়ার পথ বন্ধ। কিন্তু ওসিপ বলতে

পারে না, কেন সে রায়াকে পছন্দ করলো। চাপা তার স্বভাব, তাই ভালোবাসা সে জাগায় নি—নানা বিষয়ে কথা বলত—তাকিয়ে থাকত চুপ করে। রায়া কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারেনি—প্রথম চুমু সে-ই খেলো। রেজিষ্টি আফিস থেকে ওরা যখন ফিরে এলো ওসিপ বললে: "দেখ, দেখ মা —ভালুক আর গোলাপকে দেখ!" হানা ভেবেছিলেন, এ বিয়ে টিকবে না—রায়া ওসিপকে ছেড়ে যাবে···কিন্তু একটি মেয়ে হয়েছে। রায়া সামাজিক সান্ধ্য অধিবেশনে নাগরীবৃত্তি একটু-আধটু যে না করে তা নয়, কিন্তু স্বামীর প্রতি অটুট তার ভালোবাসা।

কিন্তু রায়া আজ যেন একেবারে আলাদা মানুষ; স্বভাবতই সে আমুদে, একটু বা চপল, কিন্তু আজ যেন কেমন চাপা, লিওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু কেমন বিরূপ হয়ে উঠছে। লিও তার জন্যে উপহার এনেছেন এক শিশি পারীর সুগন্ধি। সে শিশিটার দিকে চেয়ে বললে,

"ধন্যবাদ। আমাদের 'রেড পপি' আমার ভালো লাগে।"

হানা ভোজের সুষ্ঠু আয়োজনই করেছেন। ভোজের পেছনে যে গৃহিনীপনা আর চেষ্টার ছাপ আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ তার নেই। লিওর দিকে তাকিয়ে হানা ভাবছেন তার যৌবনের কথা, তার মৃত স্বামীর কথা।—নাউম যেন ও। লিও যখন বললেন, তার বাবা কড়া সুগন্ধি চা পছন্দ করতেন, হানার গালে চোখের জল গড়িয়ে গেল। লিও পারীতে বসে পারিবারিক পরিবেশে যে সাদর উষ্ণতার কল্পনা করতেন—সেই মুহূর্ত্ত দেখা দিল শুধু তখনি। আবার মিলিয়েও গেল। আবার তেমনি ঠাণ্ডা উদাসীন পরিবেশ।

এমন সময় ভালিয়া সতেশেস্কো ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলো:

আমাকে অভিনন্দন জানাও, রায়েচকা। মস্কৌ চলেছি···

অপরিচিতকে দেখে ভালিয়া অপ্রস্তুত হোলো, ওসীপ পরিচয় করিয়ে দিলে: মিঃ লিও আলপের্তের, 'মিষ্টার' কথাটার উপর জোর দিলে অকারণ, তারপর বললে, 'আমার বড় ভাই।'

লিও ক্ষুব্ধই হোলো। ভোজ শেষ হোলো কেমন গুমোট আবহাওয়ায়। রায়া ভালিয়ার সঙ্গে চলে গেল। হানা এবার লিওকে জিজ্ঞেস করলেন:

"বৌয়ের ফোটো আছে তোমার কাছে?"

লিও ফোটো দেখালো : সমুদ্রের ধারে তোলা তার নিজের ছবি, সঙ্গে একটি সুবেশী যুবতী। হানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন :

"আমার ছেলের বৌ এমন হবে কখনো ভাবিনি।"

লিও বুঝতে পারলেন না, এ প্রশংসা না নিন্দা।

একটি ছোট্ট মেয়ে এবার ঘরে ঢুকলো। কেমন সন্দেহ ভরে তাকাচ্ছে লিওর দিকে।

"কি গো আলিয়েঙ্কা? কাকে ভয় করছ? বোকা মেয়ে! ও যে তোমার জ্যেঠামশাই লিওভা।"

লিও মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলে, হাসতে হাসতে তার হাতে গুঁজে দিলে একটা মস্ত বড় বাণ্ডিল। আলিয়া বাণ্ডিলে কি আছে, তাকিয়েও দেখলে না। সে ভারি লাজুক : কিছুক্ষণ পরে সে ছুটে গেল পাশের ঘরে। বাণ্ডিল খুলে ফেলে হাসলো?

হানা ক্লান্ত, শুয়ে পড়লেন। দু ভাই মুখোমুখি বসে রইলো নিঃশব্দে।

"ওসিয়া, আমার জন্যে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"না।"

"আমাকে ওর সঙ্গে মিঃ আলপের্ত বলে পরিচয় করিয়ে দিলে কেন?"

"জানি না, হঠাৎ বেরিয়ে গেল···বোধ হয় তুমি আমাদের কেউ নয়, এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।"

"ভাই যদি অপরিচিত হয়, তাহলে আত্মীয় কে? আমি তো বুঝতে পারি না। তোমরা কি পারিবারিক বন্ধন স্বীকার করতে চাও না?"

"হাঁ, চাই। কিন্তু তা ছাড়াও আর এক বন্ধন আছে—মাতৃভূমির সে বন্ধন। আর সেখানে তুমি অপরিচিত! তুমি বেছে নিয়েছ—না, তুমি নও—বাবা বেছে নিয়েছিলেন···তাই তুমি আমাদের কেউ নও···"

"তাহলে তোমার মতে, এক ভাই যদি পারীতে থাকে আর এক ভাই ব্রাসেলস্-এ—তারা পর হয়ে গেল?"

"তুমি বুঝবে না···পারী, ব্রাসেলস্··নিউইয়র্ক সবই এক, কিন্তু এখানে আমরা একেবারে পৃথক—শুধু দূরত্বই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে নি··· আমি কি কল্পনা করতে পারি তোমার জীবনের?"

"বেশ তো, আমি তোমাকে বলব আমার জীবনের কথা। কেমন জীবন

কাটাচ্ছি, কেমন কাটিয়েছি আগে। তারপর তুমি বলবে তোমার কথা। কেমন ?"

'লিওর কাহিনী যেন এক দুঃসাহসিক অভিযান—ওসীপের তাই-ই মনে হোলো। সে কৌতূহলী হয়ে শুনলো, অবিশ্বাস এসে দেখা দিল। তার ভাই সত্যিই বলছে, কিন্তু যে জীবনের সে বর্ণনা দিচ্ছে, সে তো অবাস্তব—কল্পনায় যাকে মেলে। ওসীপের পালা এল এবার। শুষ্ক নীরস বাস্তব সে বলে গেল। অমুক তারিখে সে বিয়ে করেছে, অমুক জায়গায় সে কাজ করেছে। লাখো লাখো মানুষের মতোই তার জীবন। স্কুলে সে পড়লো, তারপর কলেজে : সে এখন একজন অর্থনীতিবিদ্, খসড়া করে, কাজ বেশ শক্ত। সে বুঝতে পারলো, ভাই খুশি হয় নি। সে এবার শুরু করলো পেৎলিউরার দলের কথা। তারা যখন হানা দিল…

"আমি আর মা খড়ের গাদার নিচে লুকিয়েছিলাম চারদিন।"

"তারপর ?"

ওসীপ চুপ। বিদেশীকে সে বলতে পারবে না সেদিনের সেই উপবাসের কথা। সাবৎনিকের কথা। কি উৎসাহ তাদের মনে ! ঠাণ্ডা ঘরে তারা কাটিয়েছে, তারপর এলো কুলাক ধ্বংসের দিন…গড়ার পালা… দৈনন্দিন সংগ্রাম ! সবাইকে সে-কথা বলা যায় না—তারা নিজেরা জানে, বিদেশী বুঝতেও পারবে না।

এই-ই সব ? লিও জিজ্ঞেস করলেন।

কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না…এখনো আমরা গরীব . কিন্তু তবু খুশি।

"তুমি মনে কর দারিদ্র্যে আমি ভয় পাই—তাই না ? আমি নিজেও তো বছরের পর বছর সে-জীবন কাটিয়েছি। তোমার এই অবস্থা দেখে পারীর বহু মানুষ তোমাকে হিংসে করবে। হাঁ, অনেকেই। আমি ভয় পাচ্ছি অন্য কারণে। তোমরা সবাই যেন কেমন নিষ্ঠুর, কঠোর। ফ্রান্সে যারা পুলের তলায় ঘুমোয়, সেই মুশাফিররাও ফূর্তি করতে জানে। সুখের চাবিকাঠি কি ? সব দুঃখ ভুলে যাওয়া, একটু বা বোকামি করা—এই তো তারা বলে। তাই শিশুর মতো তারা সুখী। আর তোমরা এখানে ভাবছো ভবিষ্যতের ভাবনা। শুধু ভবিষ্যতের জন্যই তোমরা বেঁচে আছ। কিন্তু বল, শুধু ভবিষ্যতের সুখের কথা কি বলা সম্ভব ?"

ওসীপ ঘাড় নাড়লো :

"আমি বর্তমানেই সুখী—এই মুহূর্তে আমার সুখ উপচে পড়ছে। শুধু কি বিশ্রামে আর আমোদ-প্রমোদেই সুখ? সংগ্রাম—সে তো অনেক বড় সুখ…"

লিও চলে গেলেন। ওসীপ ভারি ক্লান্ত—ভারী বোঝা সে যেন এতক্ষণ বয়েছে। আলিয়া তাকে আলস্য থেকে ঠেলে তুললে। একটা খেলনা উট টানতে-টানতে ঘরে ঢুকে বললে: "চলে গেছে, চলে গেছে!"

রায়া এলো তারপরে। চিন্তা করছে, কেমন আনমনা যেন। ওসীপ জিজ্ঞেস করলে, ভালিয়া কখন রওনা হবে। সে নিরুত্তর রইলো। আলিয়ার সঙ্গে খেলা পর্যন্ত করছে না। ওসীপ এবার সব ভুলে গিয়ে ডেস্কে বসলো কাজ করতে। এবার রায়া শুরু করলো: লিওর বিরুদ্ধে সে ফেটে পড়লো :

"ও অমন নিশ্চিন্ত কেন ওসীপ? 'পারীর মানুষ আমরা, আমাদের পারীতে'—এসব কথা শুনে শুনে তুমি অস্থির হয়ে উঠবে। ভালিয়া এসে ভালোই করেছিলো…'হঠাৎ স্বর তার বদলে গেল। কেমন মিঠে স্বর—রিণমিণ করে ওঠে: "আহা, আমি কি পারী, দেখব না? সাঁজে লিজে—তুলেরী …শুধু পড়ে কি আশা মিটবে! দেখতে কি পাব না!"

হানা পর্দার আড়ালে কাউচে গা এলিয়ে নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছেন—"বেচারী লিওভা, কী বদলে গেছে ও!"

লিও চলেছেন: বিষণ্ণ মন। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের ভিন্ন ছবিই তিনি এঁকেছিলেন। হয়তো ওসীয়া ঠিকই বলেছে। কিন্তু এরা মানুষ, নয়, পাথর।…পারীর কথা তার মনে পড়লো। পারী…তার আলো, গান—হালকা আবহাওয়া। হাঁ, হালকাই তো! দুঃখ যেন সেখানে পাখীর পালকের মতোই হালকা·· একটা বাদাম গাছ দেখে সে হাসলো: অবশেষে জুটলো বন্ধু! আমার নিজের শহরে একমাত্র বন্ধু—ঐ বাদাম গাছটা, ঠিক পারীর বাদাম গাছের মতোই। তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাবেন। তাছাড়া লঁাসিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

বিদায়ের আগে লিও তার ভাইকে তার সঙ্গে শ্লোবোদকায় যেতে বলেছিলেন। তার শৈশব যেখানে কেটেছে, সে-বাড়ি তিনি দেখবেন। কিছুই পরিবর্তন হয় নি। পথঘাট তেমনি। একটি স্ত্রীলোক ভিজে কাপড় মেলে

দিচ্ছে : অপরিচিতের দিকে সন্দেহের চোখে সে তাকাল ; একটা কুকুর-ছানা ডেকে উঠলো। ওরা বাড়ির কাছে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লো। লিও বললেন :

বাবা এখানে বসতে ভালোবাসতেন। কেন জানি না, ওরা তাকে পাগলা বলত। তিনি স্বপ্ন দেখতেন জেগে, আর সে স্বপ্ন কথা হয়ে ঝরে পড়তো। তার স্বপ্ন ছিল : তিনি এখান থেকে কোথাও চলে যাবেন : অথবা এই স্লোবোদকা একদিন নিউইয়র্ক হয়ে উঠবে। সেদিন মারামারি হানাহানি থেমে যাবে : সত্যকার-উৎপীড়ন আর থাকবে না। কিন্তু তাকে মরতে হোল যুদ্ধে। আমাকে একজন বলেছিল : "তিনি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ছুটে গেলেন। গুলী এসে বিঁধলো তার বুকে···"

"আহা! তিনি বিপ্লবের আগেই চলে গেলেন! থাকলে তিনি বুঝতেন। আজ আর অমন ধারা মানুষকে কেউ পাগল বলে না।"

"কিন্তু এ জীবন বাবার হয়তো ভালো লাগত না। তিনি ছিলেন শিশুর মতো। তোমরা তো তা নও···তোমরা যেন ফরিয়াদী পক্ষের উকীল—হাঁ—তাই। কালই আমি চলে যাব ওসীয়া···শুধু একটা অনুরোধ তোমার কাছে···তোমার সঙ্গে ছেলেবেলা এই বেঞ্চে বসে থাকতাম। তোমার মনে নেই, তোমার পাজামা ভিজে যেতো···তাতেও কি কোনো বন্ধন সৃষ্টি হয় নি? তবে আমার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছ কেন?"

"না, দূরে আমি সরিয়ে নিচ্ছি না। এইটেই যেন স্বাভাবিক। বিশ্বাস করো, এতে আমার দুঃখই হচ্ছে—যখন তুমি লিখলে এখানে আসছ, খুশিই হয়েছিলাম। ভাইকে পাব—সে যে কত সুখ! কিন্তু যখন তুমি এলে—বুঝতে পারলাম তুমি বিদেশী। আমাদের ভিতরে একমাত্র বন্ধন শুধু মা—আর কিছু নয়। ভান করে কি হবে? যদি তোমার অভাব থাকতো, হয়তো সম্পর্ক বদলে যেত। কিন্তু তোমার তো কোনো দৈন্য নেই।"

"শুধু স্নেহ ছাড়া আর কোনো দৈন্য নেই।"

"কিন্তু সে তো ফরমায়েস করে মেলে না। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, খুঁটিয়ে জানতে চেও না··আমরা অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে এসেছি। সে স্মৃতি তিক্ত। হয়তো আরো কিছুদিন চলবে তারই পালা। কিন্তু

তবু এই তিক্ততা আমাদের নিজস্ব। তুমি একজন বিদেশী দুদিনের জন্য এসে আমার সেই পরিচয় চাইছ?

"আমি দেয়াল ধসিয়ে দিতে চাই, আর তুমি তাকে খাড়া রাখতে চাইছ।" ওসীপ চুপ করে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে বলল:

"আমরা অক্ষম—দেয়াল রয়েছে আমাদের মনে।"

ভারসৌ থেকে তার কামরায় সহযাত্রী ছিলেন প্রতিনিধি পরিষদের সভ্য শাউমিয়ে। তিনি তাকে রাশিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

চমৎকার দেশ। সে-দেশ যে দেখে এসে খুশিই হয়েছি লিও উত্তর দিলেন, আমরা একশো বছর ধরে যা না করতে পেরেছি, ওরা বিশ বছরে তাই করেছে। যুদ্ধ বাঁধলে, জার্মানদের হারিয়ে ওরা দেবেই—হাঁ সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ওরা মানুষ নয়, পাথর ···

শামিয়ে হাসলেন সন্দেহভরে।

ট্যাঙ্ককে তো পাথর দিয়ে ধ্বংস করা যায় না মঁসিয়ে। আমি মিলিটারী কমিশনের বিবরণী পড়েছি—আপনাকে ওরা শুধু বাইরেটাই দেখিয়েছে। লড়াই করতে ওরা জানে না, সৈন্য ওদের তেমন নেই, নেই শৃঙ্খলা, যান-বাহনের সুবিধে।

ফরাসী সীমান্তে প্রবেশ করে লিও একটা রেলষ্টেশনে নেমে পড়লেন, পা একটু টান করে নিতে। বৃষ্টি থেমে গেছে, বাতাস ওইস্তারিয়ার গন্ধে মন্থর। একজন টেলিফোন অপারেটার গান গাইছে গুণ গুণ করে 'মিমি, মিমি··· আমাকে নাও গো নাও···' কে যেন বলছে: "একমাসের ভিতরে লড়াই বাঁধবে—কাগজগুলো তো রটাচ্ছে···" একটি মেয়ে আরশীতে মুখ দেখছে ··রুজ মাখছে ঠোঁটে। শান্ত দৃশ্য—বিষণ্ণ—আবার সুন্দরও। লিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন: যাক—বাড়ি ফিরলাম।

## ছয়

"আমাকে টেনে নিয়ে এলে বলে ধন্যবাদ," রায়া বললে। "মূক অ'ভনয় দেখলে তো?"

"বিশ্রী ?

"না তো, বিশ্রী হবে কেন ? চমৎকার মানুষ বলেই তো মনে হয়। এক শিশি সুগন্ধি উপহার দিয়েছে আমাকে—কিন্তু কি নিয়ে কথা বলব ?…তোমার বরাত খুব ভালো ভালিয়া— মস্কৌ চলেছ !…

শেস্তেস্কোর বাড়ীতে তরুণীদের ভিড় জমে। আলেক্সী নিকোলেভিচ মেয়ের বন্ধুদের পুরণো যুগের শিষ্টাচার দেখাতে ভোলেন না। নিজের ঘরে চলে যান। তার স্ত্রী আন্তোনিয়া প্রেত্রভ্না, অতিথি সৎকারের জন্য বিখ্যাত; দুঃসময়েও তিনি আপেলের জ্যাম্ খাওয়ান মেয়ের বন্ধুদের, কখনো বা দেন ডুনাটস্। সেদিন তিনি ভারি ব্যস্ত ছিলেন ভোর থেকে: উৎসবের কারণও ছিল— ভালিয়া মস্কৌর সিনেমা ইন্ষ্টিটিউটে ঢোকবার স্বপ্ন দেখে আসছে বহুকাল ধরে—আজ সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। তার একমাত্র মেয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে সেই ভাবনাও তিনি করছেন। কিন্তু আবার প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে! কে জানে ভালিয়ার প্রতিভাই হয়তো আছে ? ··

ভালিয়া সুন্দরী নয়, কুশ্রীও নয়। তার মুখখানা অতি সাধারণ— কিন্তু যখন সেই মুখে অস্পষ্ট হাসি খেলে যায়, হয়তো ভালোই লাগে। তার সব কিছুই যেন আবছা, জোরালো ভঙ্গী তার নেই, সুষ্টু কিছু করতেও সে পছন্দ করে না। তাই মা বলেন: "এমন ঘুমন্ত মেয়ে আমি দেখিনি বাপু। কখন জাগবে তুমি!" বহু যুবক ওর সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সে তো এক সন্ধ্যের বা এক সপ্তাহের প্রেম—তার বেশি কিছু নয়। সে তাদের ভাগিয়ে দেয় নি, আবার ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠে নি। তার এই প্রেমিকদের কাছে সে রয়ে গেছে একটা আবছা সুখস্মৃতির মতো। একদিন রায়াকে সে বলেছিল: "লোকে বলে ঘরের শান্তি পেতে হলে জবরদস্ত মেয়ে হলে চলে না, কিন্তু আমি জবরদস্ত নই, তবু একাই আমাকে থাকতে হবে। আমি যে কেমন অদ্ভুত…"

এখন সেই ভালিয়া চলে যাচ্ছে। শীগ্‌গিরই পুরণো বন্ধুদের আর কারো দেখা মিলবে না। স্কুলে ওরা ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল পিকউইক সংঘ—'বরিয়া পিক-এর সম্মানে এ নাম। আলেক্সী নিকোলেভিচ ঠাট্টা করে বলতেন: চারটি মেয়ে আর একটি প্রেমিক। মেয়েরা শুনে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতো…বরিয়া প্রেমিক! তার মুখখানা যেন একতাল কাদা—শিল্পী সবে তার উপরে কাজ করতে শুরু করেছে। সব কিছু যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—তার মাংসল নাক, চোয়ালের হাড়, ঘন ভ্রূ—আর এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আশ্চর্য দুই চোখ। বরিয়া মিস্ত্রীর কাজ করে, কবিতা লিখে, কিন্তু কাউকে দেখায়নি সে-কবিতা। শহরতলীতে থাকতো তার মার সঙ্গে। বিয়ের পরেই মা বিধবা হন—গৃহযুদ্ধে মারা যান স্বামী। সন্তানকে নিয়ে তিনি তারপর জীবন কাটিয়েছেন। ভারি নম্র স্বভাব, লেখাপড়া একটু-আধটু জানেন—কিন্তু মানুষের অনুভূতি সম্বন্ধে ছিলো প্রগাঢ় জ্ঞান। পিকউইক সংঘ তারই গরীবানা ভাবে সাজানো-গুছানো ঘরে বসত, মেয়েরা অবাক হয়ে যেতো তার বুদ্ধি আর অনুভূতির প্রখরতা দেখে। একদিন ভালিয়া রায়াকে বলেছিল: "আমরা স্কুলে যাই, পড়ি, বুঝতে চেষ্টা করি—কিন্তু ভেরা-প্রাতোনোভ্‌না কিছুই পড়েননি—কিন্তু তিনি সব কিছুই বোঝেন।…"

"ভালিয়া, সত্যি তোমার কি বরাত!"

আন্তোনিনা পেত্রোভ না মালাগার বোতল নিয়ে এলেন।

ক্লিনোচ্‌কা কোথায়?"

"এখুনি আসবে।"

জিনা মিত্রফানভা একটু সংযত, গম্ভীর কিন্তু আত্মগোপন করে থাকতে ভালোবাসে। তাই লোকে তাকে বলে, 'অহঙ্কারী'। কিন্তু তার বন্ধুরা তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, তার ব্যক্তিত্বের প্রশংসাই করে। এখন সে উপাধির জন্য প্রবন্ধ লিখছে। কি অদ্ভুত বিষয় সে বেছে নিয়েছে…পুরাতন মহাকাব্যে মৃত্যুর পরাজয়। একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে সে থাকে শহরতলীতে। ভারি মিতব্যয়ী জীবন কিন্তু অভিযোগ নেই। কি দৃঢ়-চরিত্র তার—আন্তোনিনা পেত্রোভ্‌না মাঝে মাঝে ভাবেন,—ক্ষুধার্ত জিনা কেমন করে সুখাদ্য ঠেলে দিয়ে বলে: কিছু মনে কোরো না…এইমাত্র খাওয়া-দাওয়া সেরে এলাম। একাই সে থাকে; চার বছর আগে মারা গেছেন

মা, বাপকে সে চেনেই না। সে যখন সবে 'বাবা' ডাকতে শিখেছে, তখন মার সঙ্গে সম্পর্ক তার ছাড়াছাড়ি হয়। শোনা যায়, একজনের তিনি বাগ্‌দত্তা ছিলেন, কিন্তু সে আর সেখান থেকে ফেরেনি। হয়তো এ গুজব—' জিনা বন্ধুদের গোপন কথা শোনে, উৎসাহ সে দিতে পারে, সান্ত্বনা সে দেয়, কিন্তু নিজের গোপন কথা কাউকে বলে না।

"ঐ তো এসেছে!"

না, জিনা নয়, গালোচ্‌কা—ওরা তাকে বলে, 'হাস্নী মেয়ে', কিন্তু গালোচ্‌কা এখন হাসছে না তো!

জিনার ভারি বিপদ। বাবাকে নিয়ে একটা বিশ্রী ব্যাপার ছিলো—সে তো তোমরা জানো? সেই ব্যাপার আর কি। যুব কমিউনিষ্ট সংঘ থেকে ওর কাছে একটা বিবৃতি চেয়েছিলো। ও তাতে লেখে, বাবাকে সে চেনে না, তার সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই—কিন্তু বোধ হয় ঠিক হয়নি, তাই ওরা তাকে আবার বিবৃতি দিতে বলে। কেউ বোধ হয় ওর নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছে। অবিশ্যি, ওরই দোষ—আমরা ওর বন্ধু, সাথী—আমাদের কাছে সব পরিস্কার করে বলাই উচিত ছিল।...ওরা সভা ডাকে, ঐ সভায় কে একজন—সে বুঝতে পারেনি বা ভালো করে শোনে নি—ওকে 'শত্রু' বলে বসলো।...জিনা তো জ্বলে উঠে বললে: "আমার কার্ড আপনারা ফিরিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু আমি কমিউনিষ্ট আছি, আর তাই-ই থাকব।"

"তারপর কি হোলো গালোচ্‌কা?"

"সে কিছু বলবার মেয়ে নয়। আমি ওর কাছে গিযে বললাম, চল ভালিয়ার ওখানে যাই, সে না বললে। কত সাধাসাধি করলাম, কিন্তু তার এক কথা! নাঃ তাতে আমারও ভালো, তোমাদেরও ভালো। তারপর বললে, জানো, নিকিতিন আমার সঙ্গে কথা কয় না। তারপর আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে বললে, আমার কাজ আছে, তুমি যাও। সত্যি বলব কি, মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে।"

"কাল আমি ওর কাছে যাব." রায়া বললে। "একটু হয়তো রাগই করবে··· সে বলে, যারা করুণা চায় তাদের সে বুঝতে পারে না।"

একটা বিষণ্ণতা নেমে এল ঘরে। বরিয়া এল, সেও চুপচাপ। গালোচ্‌কা আবার পুনরাবৃত্তি করলো। বরিয়া মন দিয়ে শুনলো, তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে,

কিন্তু কিছু বললে না। এবার সে তার ছেঁড়া কোটটার একটিমাত্র বোতাম এঁটে দিয়ে একটা গেলাস তুলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে :

"তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলাম ভালিয়া। এবার যাচ্ছি—" গেলাসটা ঠোঁটে না ছুঁইয়ে সে নিঃশব্দে চলে গেল। গালোচ্‌কা দুঃখিত, কিন্তু তবু সে হাসি থামাতে পারলে না। ভালিয়া বললে :

"হাসির কথা নয়। ওযে এল, এতেই আমি অবাক হয়ে গেছি। তোমায়া ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। সে নিজেই তো বললে। আজ দু'বছর হোলো, ওর সঙ্গে পাগলের মতো প্রেমে পড়েছে, আর যখন প্রস্তাব করতে যাবে..."

"আমি তো ওর আশা ছেড়ে দিতে বললাম, কিন্তু ও শুনলো না। সুন্দর চেহারার জোরে ওকে মুগ্ধ করেছে তোমায়া। হাঁ একেবারে দেবদূতের মতো সে সুন্দরী ..."

"কিন্তু ঐ 'দেবদূত' ওকে কি বলেছিল জানো : তোমার নাম নেই, টাকাকড়ি নেই, মাথা গোঁজবারও ঠাঁই নেই—আর তুমি বিয়ের প্রস্তাব করতে সাহস কর? নিজের চেহারাখানা আগে আরসীতে দেখলে ভালো করতে। যার ভিক্ষের পাত্র সম্বল, তার আবার বিয়ে করবার সাধ কেন? সাধ হয়তো একটা একটা ফাঁসের যোগাড় দেখ! ভারি মুখরা মেয়েটা না!"

"ভারি বিশ্রী!..."

ভালিয়ার বাবা-মা চলে গেছেন বহুক্ষণ, এখন তিনজন ঘরে—ভালিয়া, রায়া, গালোচ্‌কা। কথাবার্তা চলছে : কখনো বা জিনার ব্যাপার, কখনো বা বরিয়ার প্রতি ব্যবহারের কথা—কখনো বা আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখ। যাই হোক ওরা ম্লান হয়ে গেছে; এমন কি মালাগার মধু এখন ওদের কাছে তেতো। ওরা সবে জীবনের অঙ্গনে পা দিয়েছে, কিন্তু রাতের অরণ্যের মতো ভয়াল হয়ে উঠেছে সে। গালোচ্‌কা নিজেকে প্রবোধ দিল :

জিনার ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় চুকে যাবে, আর বরিয়ার কথা। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে—এখন তো ও বুঝতে পারবে তোমায়া কি চিজ...ছেলেটা কিন্তু ভারি ভালো। কেন জানি না, ওর ভিতরে জিনিস আছে বলে মনে হয়।...ভালিয়া আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন বিজ্ঞাপনে পড়ব : প্রধান ভূমিকায় ভালেন্তিনা সেভ্তেকো। সিনেমায় গিয়ে দেখব তোমার অভিনয়।

কিন্তু পিকউইক সংঘকে তুমি ভুলে যাবে। না গো না, একবারও অন্তত তুলোর অফিসের 'হাসুনি মেয়ে' কে মনে কোরো।"

"কি বোকা আমরা·· ! ডালিয়ার চোখে জল ঝরছে···আমাদের ছেলেখেলা শেষ হোলো। কি চমৎকার! মেঘের ভিতরে আছি, অথচ এখনো তার ছোঁয়া লাগেনি। রায়া এ অনুভূতি তো তোমাদের চেনা। রায়া, তুমি ঝিমোচ্চ—হঠাৎ বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠলো! একটা ভয়ানক কিছু ঘটলো·· আমি তাই শুধু ভাবছি···কথন বিস্ফোরণের মুহূর্ত্ত আসবে। ··"

"কি ?"—গালোচ্কা জিজ্ঞেস করলো।

"জানি না। আমার এই বুক···এই সুখ···"

গালোচকা শুনলো, বুঝতে চেষ্টা করলো, গেলাসটা কনুইয়ের ধাক্কায় উলটে গেছে। সে কেঁদে ফেলে আর কি!

"দেখ, দেখ—কি করলাম!"

ডালিয়া আর রায়া হেসে উঠলো—"দেখ কেমন করছে মেয়েটা!"

কিছুক্ষণ পরে তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। মনে বিষণ্ণতার ভার নেই, আবার আনন্দও নেই—উচ্ছল জীবনের অনুভূতিময় তারা। তাতে আছে মোহময় উদ্বিগ্নতা—তা হয়তো প্রথম পাতা পড়তে না পড়তে উবে যাবে, উবে যাবে প্রথম অক্ষরে—অথবা সে হয়তো থাকবে, ঘনীভূত হয়ে উঠবে, রূপান্তরিত হবে আত্মিক ঝড়ে।

## সাত

ডালিয়ার বাড়ি থেকে বরিয়া সোজা গেল পোদোল-এ, জিনা এখানে থাকে। নিপারের উঁচু পারের উপর এসে সে থামলো; এই নদী তার মনকে টানে। ভাগ্যের মতো সে মহান—আবার সাধারণী। ওরই মতো—বহুদিন আগে, কত প্রেমিক আর বীর, কত নামহীন উন্মাদ এইখানে দাঁড়িয়ে ঐ নদীর দিকে চেয়ে থাকতো·।···

জিনার বাড়ির নম্বর সে ভুলে গেছে, বহুক্ষণ ধরে সে খুঁজলো। ও যখন ঢুকলো ঘরে, জিনা অবাক। তবু সে বাইরে প্রকাশ করলো না।

"এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম..

"কোথায় যাচ্ছিলে ? কোথা থেকে আসছ···?···বেশ, বোসো।"

বহুক্ষণ চুপচাপ দুজনে। অবশেষে বরিয়া বললে :

"জিনা, সুখে তুমি বিশ্বাস কর ?"

"হাঁ।"

"আমিও। কিছুদিন হোল, একটি মেয়ে আমাকে বলেছে, সুখ সে গড়ে তুলবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন করে? সে বললে, সে একজন বিখ্যাত নাট্যকারকে খুঁজে নেবে, খুঁজে নেবে উচ্চপদস্থ এক জীবকে—থাকবে এক সাজানো ঘরে, সোচিতে যাবে···"

"বিশ্রী!"

"বোকামিও বলতে পার। সাজানো ঘর আজ আছে, কাল নেই··· সুখ যেন কাউকে এনে দেওয়া যায়, আবার কেড়েও নেওয়া যায়। না, তা নয়, সুখ তোমার নিজের জিনিস।"

"সে দুঃখ দেয়, যত সুখ, ততোই তার দুঃখ।"

"আর বছর শীতকালে আমি বাগরিৎস্কার লেখায় পড়েছিলাম।

তুমি চেয়েছিলে রাইফেলের চোখের দিকে।

মৃত্যু এসেছিল পুরুষের মতো···

আমি পড়তে পড়তে ভাবছিলাম : আহা, বিশ বছর আগে কেন জন্মাইনি ? কিন্তু কথা তা নয়। প্রতি যুগ আত্মাকে তার নিজের ধরণে পরীক্ষা করে। যুগটা বড় নয়, আত্মাই বড়। সে কথা আজ বুঝি।··· আমাদের যুগটা দাগী—আমরা শিক্ষা পেয়েছি, থিয়েটারে আমরা যাই, বিভিন্ন নাটকের গুণ বিচার করি, ভালোবাসি, বিয়োগান্ত প্রেমের নাটকে নায়ক সাজি—হয়তো তেমন সফল না হতে পারি, তবু···আমরা রাইফেলের চোখে চোখ রাখি না, খুঁজে বেড়াই মেয়ের চোখ। কিন্তু তাই বলে আমরা নিকৃষ্ট কিসে ? সব কিছু তো এক লহমায় বদলে যেতে পারে···"

"তুমি কি যুদ্ধের কথা বলছ ?"

"সবকিছুর কথাই বলছি, হাঁ, যুদ্ধ যদি বল—তাই। আমরা আনন্দে গেয়ে উঠি : 'আগামী কাল যদি আসে যুদ্ধ'···কিন্তু এর তো 'যদি' নেই, এতে আনন্দও নেই···কাল সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম

—ক'জন আমরা চিহ্নিত হলাম? মনে কোরো না, সমাপ্তির কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন। আমরা মজবুত মানুষ। আমি হৃদয়ের কথা বলছি। তুমি প্রবন্ধের নামটা চমৎকার বেছেছ। মৃত্যুকে পরাজিত করা। ঠিক খাপ খেয়ে গেছে! কবিতার মতো মনে হয়।"

"কিন্তু বোরিয়া, আমি নিজে মৃত্যুকে ভয় করি।"

"সবাই তাই করে। এমন কি বীরের দলও। ইয়ারশভ বলেছিলো, হাসান-এ তখন ওরা···ওরা ভয় পেয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনে প্রাণও দিয়েছে। কেমন করে? এও এক কাব্য। বহুদিন পরে, তিরিশ শতকে আর এক জিনা হয়তো এরই উপরে লিখবে এক নতুন প্রবন্ধ। কিন্তু জিনা, তুমি সাহসী। না, না, তর্ক করো না আমি জানি—তুমি সাহসী—সত্যিকারের কমিউনিষ্ট তুমি।"

এমনভাবে সে বললে, জিনা লজ্জা পেল। দুজনেই নীরব। পাতলা পার্টিশনটার ওপাশ থেকে ছেলেমানুষের স্বর ভেসে আসছে: 'যদি ক ত্রিভুজকে গ ত্রিভুজের উপর বসানো হয়'—বৃষ্টি এল—বড় বড় ফোঁটায় ঝরছে। জিনা খোলা জানালায় বসে আছে। সে হেসে মুখ মুছলো, কিন্তু সরে এলো না। তারপর ঘটলো এক অদ্ভুত ব্যাপার। বরিয়া শোনাতে লাগলো কবিতা। কারো কাছে সে শোনায় নি। কেউ সে কবিতা লেখে কিনা জিজ্ঞেস করলে রাগ করেছে। সে কিনা নিজেই বললো! জিনা শোনো, বাঁধো বাঁধো ছন্দ, অথচ আলো ঝরছে—তার নিজের চোখের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে, মিশে গেছে। জিনা পরে মনে করতে চেষ্টা করলো লাইনগুলো। গাছের কথা, বিরাট, জীবন্ত গাছের কথা সে লিখেছে —গাছ আহত হয়েছে কুড়ুলের আঘাতে, কিন্তু তবু নুয়ে পড়বে না। পাইন, লাইম আর বাদাম গাছ···কিয়েভ-এর গাছ···যুদ্ধেরও কি সে কবিতা? ভালোবাসার?···না, না। তবে কিসের? সুখের? জানি না···যখন সে পড়ছিল—সে ভাবতে পারে নি। শব্দের ঝড়ে সে তখন নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে—ছন্দের অনুভূতিতে সে মগ্ন—যেন স্তেপের উপর হাওয়ার মতো সে এলো, এলো বৃষ্টির মতো। এখনো যেন শার্সিতে তার ঝাপটা—সে বয়ে চলেছে পথ ভাসিয়ে রাতের পৃথিবীর আঁধারে। বরিয়া বিদায় নেবার সময় সে তার উত্তপ্ত হাত চেপে ধরল। পৌরুষ-ভরা সে হাত—কর্কশ কঠোর তার অনুভূতি।···

## আট

ইয়াসচেঙ্কো বললে :

"কেমন জটিল অবস্থাটা দেখছো তো! মস্কো থেকে ওরা তো বসন্তকালের কথা বলছে। আমরা কয়েক দিনের জন্ত তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি। তারপর ভেবে দেখা যাবে। আমি প্রথমে ইগনাতিউককে বলেছিলাম, কিন্তু তার নাকি পরিবারে কি সব ঝামেলা চলছে। তাছাড়া চল্লিশের উপরে তার বয়েস, ওখানকার জল হাওয়াও সইবে কিনা কে জানে। তাই তোমার কথাই মনে পড়ল, এখন তুমি··"

কথা শেষ না হতেই ওসাপ বলে উঠলো :

"বেশ তো, আমিই না হয় যাব। ইগনাতিউকের পথে কষ্টই হবে। কিন্তু তোমারও তো স্ত্রী আছেন—তাই না?"

"হাঁ, তাকে নেওয়া সম্ভব হবে না। আমার বুড়ী মাকে কে দেখবে?"

"হাঁ, তাও বটে। বুড়ী মার কথাও ভাবতে হবে"—ইয়াসচেঙ্কো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। "ওদের কথা অবশ্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরাই সব বন্দোবস্ত করব।"

ওসীপ মানচিত্রের দিকে তাকাল, দেয়ালে উচুতে টাঙানো—যে জায়গাটা সে দেখতে চায়—সেটা একেবারে উপরে—সবুজ রং যেখানে ঠিক তারই মাঝখানে। মাথা উঁচু করেই সে দেখলো। ভ্রূ কোঁচকালো ওসীপ—চিঠিপত্র ওখানে পৌছতে দেরিই হবে···এবার সে কাজে লেগে গেল, আসন্ন বিদায়ের দিনের কথা আর ভাবলো না।

রায়ার চোখের দীর্ঘ পলক নড়ে উঠলো

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে? ইগানাতিউককে ওরা যেতে দিলেনা···কোথায় যে জায়গাটা তোমার ধারণাই নেই। শীতকালে সেখানে নিঃশ্বাস ফেলাই দায়।"

"কিন্তু তবু তো মানুষ নিশ্বাস ফেলে—একা আমি থাকতে পারব না। ইয়াসচেঙ্কো সব ব্যবস্থা করবে বলেছে।"

"আমি সে কথা বলিনি…"

সে তার দিকে তাকালো, কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। লজ্জার রক্তিমতার মতো ভালোবাসার অনুভূতিতে ছেয়ে গেছে তার মুখ, তার ছোট্ট দুখান হাতে সে চুমু খেল। সান্ত্বনা দেবার পথ খুঁজছে।—হঠাৎ মনে পড়লো—' আটটায় সভা। কাটলেট কোনোক্রমে মুখে পুরে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

কেন ও উত্তরে যাবে—রায়া ভাবছে। অজিয়া হলেও বা কথা ছিল—সে যেত তার সঙ্গে। কিয়েভ ছাড়তে দুঃখই হবে। কিন্তু ওতো যাবেই—কিন্তু অজিয়ায় তো নয়।… মানুষ ইচ্ছে করে কখনো ওখানে যেতে চায়? ও পাগল! অমন বোকামি না করেও কি মানুষ ভাল হতে পারে না? কেউ তো জোর করে ধরে বেঁধে ওকে নিয়ে যাচ্ছে না, ও গেলে কেউ বাহাবাও দেবে না। বরং দরকার-মাফিক না বলতে পারলে মানুষ তারিফই করে। ওরা ইগনাতিউককে পাঠালেই পারে। কারোৎকভও তো আছে? ওসীপ যেন ফরমায়েসের চাকর, মুখ থেকে হুকুম খসালেই হোলো, আর ও ছুটবে গুলীর মতো। আমার কথা তো ভাবেই না। একা এখানে কি করব? জিনার মতো… পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো—এই তো কোনোরকমে নাকে মুখে খাবার গুঁজে ছুটলো—ফিরবে সেই কত রাতে। কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলবে, "রাযা মাথাটা এত ঘুরছে, কি বলছ বুঝতে পারছি না।" তারপর ঘুমিয়ে পড়বে: আজ পাঁচ বছর ধরে এমনি চলছে! আর আসল কথা হচ্ছে, কেউ তাকে এসব বাধ্য করে করায় না, বরং ও নিজেই ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে ভালোবাসে। ও তো বুঝবে না, আমি কি করে দিন কাটাই, অথচ মনে করে: আমাকে ও ভালো বাসে…না, না যেতে দেব না। বলব, আমি মরে যাচ্ছি, ওসীপ, শুনছ,—আমি মরে যাচ্ছি!

কিন্তু ওসীপ অনুপস্থিত—রাযা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। হানা নাতনীকে বলছেন: হাত আমাদের ধুতে হয়। কত নোংরা হয়ে থাকে দেখ না। যদি ওসীপ তাড়াতাড়ি ফেরে! কিন্তু বৈঠকে আজ বেশ দেরিই হয়েছে। সে তো জানে না, রায়া তার আশায় বসে আছে: তাকে তার চাই।

হাঁ, সে তা জানতে পারলো না। অথচ অনেক কিছুই সে জানলো, রায়ারই ভুল: ওসীপ অভিজ্ঞ আর উৎসাহী কারিগর বলে প্রশংসা পেয়েছে। সে বাধাকে

জয় করতে জানে, খাবার আর ঘুম সে বাদ দিয়েই চলতে পারে—সব কিছু থেকেই নিজেকে বঞ্চিত রাখতে পারে। রাযা যখন অবাক হলো, সে ঘাড় নেড়ে বললে: "অন্য কি উপায ছিলো বল? আর এটা এত দরকারী দপ্তর"...সে জানে ঝড় আসছে। ছেলেবেলা থেকে সে শুনে আসছে, পড়েছে, ভেবেছে। সময ও বটে! সে জন্ম নিলো এমন সময়ে যখন বড় কড়াকড়ি—কাজ আদায করে নেবার, কঠোর হুকুম দিচ্ছে এই সময। তাই রাযাকে তার বুঝি চেনা হযনি। তার আত্মিক জগত তো তেমন জটিল নয—তবু সময সে পাযনি। তার অনুভূতি জড়িয়ে আছে একটার সঙ্গে আর একটা—সে দেখতে পায়নি। তাই যখন হঠাৎ বিষণ্ণতা থেকে আনন্দের দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে অবার ক্ষনিকে ছেয়ে যায হতাশা—সে অবাক হয়ে যায। কেন তাকে রায়া বার বার জিজ্ঞেস করে: "আমাকে তুমি ভালোবাস? কেন এই অবিশ্বাস? সব কিছুই তো পরিষ্কার। সে স্ত্রী—তাদের আছে একটি মেযে। যখন রাযা ভালোবাসার অভাব নিযে অভিযোগ করে সে তার হাতে চুমু খায, খায ঘাড়ে—বব করা চুলে...কখনো বা স্নেহে উচ্ছ্বসিত হযে ওঠে—কখনো বা বিরক্তি আসে। এ যেন উপন্যাসের মতো। স্কুলে যখন পড়ে—তখন সে দশ-বিশ খানা উপন্যাস পড়েছে—কিন্তু আজ সব ভুলে গেছে—উপন্যাসের আর সময নেই। তবু উপন্যাস কথাটা যেন তার মনে একটা মধুর অনুভূতি নিযে আসে—রহস্য তাতে আছে—কিন্তু ভারি বিরক্তিকরও বটে। রাযা সম্পর্কে সে নিজের অনুভূতিকে চেনে না—এ যেন সোনা লুকিযে আছে পাথরের ভিতরে।

"আমার পঁচিশ বছর বযেস হোলো ওসীপ। কি ভ্যানক! আর দু-এক বছর পরে বুড়িযে যাব।..."

"দূর! আমার তিরিশ, কিন্তু এখনো বুড়ো হইনি।"

"তুমি যে পুরুষ।"

"এর সঙ্গে পুরুষ আর মেযের সম্বন্ধ কি? আমি তো বুঝি না...আমরা কিছুই বুঝি না। বলছি, শোনো। সব সমযেই নিজের গোঁ নিয়ে চলেছ—একবার আমার কথা শোনো। একা যেও না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।"

"রাযেচকা, সে তো সম্ভব নয়। আমাকে বিশ্বাস না কর, ইয়াসেক্কোকে জিজ্ঞেস কোরো।"

"কি জিজ্ঞেস করবো তাকে ? কি করে ভালোবাসতে হয় ?...আমার বুকে কি হচ্ছে—সে কথা অপরিচিতকে কি করে বলব ? হোক সেখানে ঠাণ্ডা, আমি গ্রাহ্য করি না। নিঃসঙ্গতার ঠাণ্ডা তো তার চেয়েও ভীষণ।..."

কেঁদে ফেললো রায়া। ওসীপের বুকে তীক্ষ্ণ এক ব্যথা। এই-ই তো হয়। রায়া তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেঁদে ওঠে, একথা সে জানলেও মন তো মানে না। তার চোখের জল দেখলে তার মাথা ঠিক থাকে না। দুহাত দিয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করতে গেল : কিন্তু কথা খুঁজে পেল না। তার চোখের সুমুখে ভাসছে সবুজ রংঙের একটি টুকরো। কি করবে সে ? রায়ার আবহাওয়া সহ্য হবে না, কিন্তু তাকে যেতেই হবে।

"আমি হয়তো বসন্তের প্রথমেই ফিরে আসতে পারব।"

উত্তর নেই। রায়া উত্তর দিতে পারছে না—মনে হচ্ছে কথা যেন এক বিরাট শূন্যে ডুবে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। সে হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কি বলছে সে নিজেই জানে না।

"তোমার কাজ আমি ঘৃণা করি।"

পুরণো কিয়েভ-এর পাহাড়-কাটা পথ দিয়ে চলেছে তারা ; হাঁফ ধরে যায় চলতে চলতে—এত উঁচু—কিন্তু ভারি সুন্দরও। পাশে পাশে বাগান, সেখানে বাদাম, মেপল আর লাইমের ভিড়—সোনালি তাদের রং। এখানে ওখানে নিচু কুঁড়েঘরগুলি—সেখানে জীবন চলেছে অনাহত হযে—অদৃশ্য কিন্তু পথিকের কাছে তারা দুর্বোধ্য নয়। কোথাওবা শোনা যাচ্ছে তরুণীর হাসি, ছেলেমেয়েদের কোলাহল, কোনো বুড়োর কাশির শব্দ—বুড়ো ভাবছে—অর্দ্ধ শতাব্দী আগে এমনি খাড়া পাহাড়ী পথে প্রিয়াকে নিয়ে সেও বেড়াতো—হাঁফ ধরে যেত তার।

রায়ার ভাগ্য যেদিন নির্দ্ধারিত হোলো, সেদিনও ওরা এইখানেই দেখা করেছিলো। ওসীপ এনেছিল এক গোছা ভায়োলেট—আস্তিনের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিল লজ্জায়—যেন স্কুলের ছেলে সিগারেট লুকোচ্ছে। রায়া সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে গম্ভীর হযে বললো :

"আর স্বপ্ন দেখবার মতো কিছুই হয়তো নেই ? হয়তো আমরা সুখীই হয়েছি—তাই না ?"

"হাঁ, খুবই সুখী, অন্তত আমার কথা তো—"

সে এমনি করে জানাতে চাইলো কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা। কিন্তু রায়া

সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। তাহলে সেই প্রথম সপ্তাহের আনন্দ উবে গেছে, হয়তো সুখ তার নাম নয়! এখন কি আছে সুমুখে?...ভালিয়া খ্যাতির স্বপ্ন দেখতে পারে...কিন্তু রায়ার তো কিছুই নেই। সুমুখের দিকে সে কি নিয়ে তাকাবে? এক বছর পরে ফিরে আসবে ওসীপ, অফিস থেকে ফিরে এসে যেমন সম্ভাষণ জানায়—তেমনি জানাবে—তারপর ছুটবে সভার সমিতিতে। ভালিয়া বলে: "কেন, তোমার তো গান আছে।" কারো কারো কাছে গানই জীবন, কিন্তু তার কাছে এতো ভুলে থাকবার উপায়। শুধু স্বপ্ন নিয়েই কি বেঁচে থাকা যায়? —যদি তাই-ই হয়—তাহলে ঘুমের ওষুধ গিলে একেবারে না জাগলেই তো হয়—শিউরে উঠলো সে—একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন নামছে শিরদাঁড়া বেয়ে—সে অজান্তে স্বামীর কাছে ঘেঁসে এলো। না, না, নিছক পাগলামি! সে বাঁচবে বই কি! শুধু বাঁচার জন্য সে বাঁচতে চায় না, কিন্তু মৃত্যুও যে ভয়ংকর—

"রায়া, তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না—"

মুহূর্তে সে চাঙা হয়ে উঠলো: সে বুঝতে পারেনি ওকে: ও ওতো সইছে—? তাই না?—কি সুন্দর সন্ধ্যা! আর সুন্দর কিয়েভ—সে বাঁচতে চায় না—এতো সত্যি নয়। সে চায় বাঁচতে—কিন্তু বড় কঠোর জীবন—

নদীর পারে তারা এসে পৌঁছলো; দূরে আলোর সার। নতুন কাটা খড়ের গন্ধ বাতাসে। পারিবারিক কথা তারা বলছে:

"আগে আলিয়াকে এক জোড়া জুতো কিনে দিও—"

"তোমার নীল সোয়েটারটা দিতে ভুলে গেছি, ওখানে তো খুব ঠাণ্ডা।"

"চিঠিপত্র হারিয়েও তো যায় শুনি, যদি তাই-ই হয় উদ্বিগ্ন হয়ো না।"

রায়া ভাবলো: "আচ্ছা ভাবনা তো: একটা চিঠি হারিয়ে যাক না, ক্ষতি নেই। কিন্তু ভালোবাসা যদি হারিয়ে যায়?"

ওসীপ পরদিন চলে গেলো।

ভ্রমণের প্রথম প্রহর নিয়ে এলো বিষাদ: রায়ার কল্পনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। কি করছে এখন রায়া? তার ঠাট্টা-তামাসা-খেয়াল-তার বিরক্তি—সব কিছু মনে পড়ছে। কিয়েভ-এ ভাবনার সময় পায় নি। এখন সে বিদায় নিয়ে এসেছে—বেশি করে আজ মনে পড়ছে রায়ার কথা। যেন মুখোমুখি বসে আলাপ করছে।

এবার সে ভাবনা ঝেড়ে ফেললো—জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে—সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ চলছে—স্টেশনে স্টেশনে নেমে ঘুরছে। সবকিছুই যেন কৌতূহলজনক: প্রান্তর: নতুন জাতের আপেলের কথা বলছে কারা:। পারী আর লণ্ডনের সঙ্গে চুক্তির কথা: ঝুড়ির খেজুরের টুকটুকে রং: কারখানা বাড়ি—আলোয় আলোময়।

মস্কৌতে সে অভিভূত হোলো মানুষের ঢেউয়ে, আলো আর গোলমালে, পিপল'স কমিসারিয়েটের লম্বা করিডোরে সে ঘুরে বেড়ালো, সবকিছুই ভালো লাগলো: ঐ গোলমাল, এমন কি ডেপুটি কমিশারের নীরস স্বরও বুঝি! তিনি বললেন: "মনে রেখো: এ এক গুরু দায়িত্ব—"

তারপর আবার বন, নদী, কারখানা। ট্রেণ ছুটছে বিপরীত দিকে। জংশন স্টেশনের হট্টগোল মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে আপন মনে ভাবলো: এ এক মানচিত্র—শুধু দেয়ালে টাঙানো নয়—জীবন্ত। এই বিস্তার তাকে মুগ্ধ করলো, চোখ দিয়ে অনুভব করলো, কান আর ফুসফুস দিয়েও। এই যেন প্রথম সে অনুভব—তাই সবকিছু নতুন লাগছে, এমন কি ফারগাছগুলিও—চার কি পাঁচ দিনের দিন রাতেও ঝিমুনির ভিতরে রায়ার কথা মনে পড়লো। দুঃখই হোলো, আজ সে তার পাশে নেই। ট্রেণের দোলায এলো ঘুম। ভোরে আবার সেই প্রকৃতির আশ্চর্য: মেপল আর নয়, এবার বার্চ, আসপেন আর ফার। গাড়ির ভিতরে উদ্ভিদতত্ত্ববিদের জায়গা দখল করে বসেছেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। নতুন ধরণের ক্রেনের কথা বলছেন। ওদিকে কারা জার্মানরা যুদ্ধ করবে কি করবে না তারই আলোচনায মশগুল। ওসীপ খুশিই হোলো: এ যেন এক মস্ত বাড়ি—আর সে-বাড়ির সেও একজন।

রায়াকে চিঠি লিখবে ভা'লো···পৌঁছে তো একমুহূর্ত অবসর মিলবে না। ···এক অসংলগ্নতাভরা চিঠি। অন্য সহযাত্রীরা গোলমাল করছে; পেনসিল হোঁচট খেতে খেতে চলেছে কাগজের উপর।

"চমৎকার লাগছে। মার কথা মনে পড়ছে: তিনি যখনই বাইরে যেতেন, ফিরে আসতেন উচ্ছ্বসিত হয়ে। এসে বলতেন! লিপকিকে আর চেনা যায় না। নতুন বাড়িটা শেষ হয়ে গেছে—একটা প্লাস্টিকের কারখানা বসেছে—এমনি নানা কথা। তার ছেলেবেলায় তিনি দাদুর বাগানে ঘুরে ঘুরে এমনি নাকি দেখতেন। আমিও দেখছি আর খুশি হয়ে উঠছি। রায়া

তুমি বলবে বর্তমান পরিস্থিতির এ এক বিবরণ মাত্র, কিন্তু আমি একথা লিখছি আমার মনের কথা। তুমিও এমন করেই ভাব—এই আমার ইচ্ছে। আমার জন্য ভেবো না। আমি এখানে শীতার্ত মানুষদের দেখছি। কিয়েভ-এ ওরা একটু বেশি করেই এখানকার আবহাওয়ার কথা বলে তোমাদের কেমন দিন কাটছে, তাই-ই ভাবি। আলিযাকে জুতো কিনে দিয়েছো তো? মাকে একটু শরীরের ওপর নজর দিতে বোলো। আর তুমি তো একা এখন—তাই বলে মন খারাপ কোরো না। তুমি আমাকে বলতে, তোমাকে পেয়ে খুশি হয়েছি কি না। আজ তো আমি তোমার কাছে ফিরে গিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাই। ছাখো, কল্পনা-বিহীন যে মানুষ সেও কেমন কল্পনায় ডুবে যেতে পারে। প্রিয়া, মাঝে মাঝে চিঠি দিও।"

রায়া চিঠি পড়লো। করুণায় ভরে গেল তার মন। ওসীপের বেশি বয়েস হয় নি বরং ছেলেমানুষই···। বুঝি আলিযার চেয়েও ছেলেমানুষ! ···আবার বিরক্ত হোলো: আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়: এতে ওর অবাক হবার কি আছে? না, সে ওকে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না—ভালোবাসা তার ধাতেই নেই। এ যেন একত্র থাকবার শর্ত—হাঁ তাই · হয়তো বা বয়স্ক মানুষের প্রেম এমনি ধরণের? যাক্—তার জন্যে যে ভাবছে—এই-ই যথেষ্ট। · কিন্তু সে তো অন্য স্বপ্ন দেখে ··জীবন এখন আর তার কাছে পিকউইক সংঘ নয়, তা বোঝবার ম'তো সময় এসেছে, এখন উত্তাপহীন জীবন, কর্তব্যময় জীবন—হয়তো সে জীবন স্বাভাবিক, সহজ।

ঠিক সেইদিনই সন্ধ্যায় ওসীপ ভাবছিল রায়ার কথা: বড় কোমল রায়া! কতদূরে সে—যেন আর এক গ্রহের বাসিন্দে! বিষাদে ভরে গেল মন। কিয়েভকে মনে পড়লো, মনে পড়লো ক্রেচাতিকের আলোর মালা। আরাম সেখানে আছে, আছে বহু বসতি, মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপ, বাগান আর কালো আকাশ আর বড় বড় তারা। কিন্তু এখানে সবই অদ্ভুত: গাছপালা, ভাষা আর রাত—সবই। নিজের ওপরে রাগ হোল তার: হঠাৎ এ বিচ্ছেদের পাণ্ডুতা তাকে ছেয়ে ফেললো কেন? এ যেন উপন্যাস··· আমি কি এখানে বিদেশী? এ সব তো আমারই—মস্কৌ—এই জন্মভূমি—ঐ সেদিন যে কারখানার মিস্ত্রীটি ঠাট্টা করে বলছিল: আমার মাথার ভিতর যেন

হাতুড়ী ঘা মারছে—সবই তো আমার। আর—আর আছে রায়া—সে ফিসফিস করে বলে উঠলো। কেমন এক আশঙ্কাময় বিষণ্ণতা তাকে চেপে ধরেছে।

"রাইসা, মিখাইলোভনা, আনাকারেনিনার টিকিট করে এনেছি।"

হানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। না, রাজি না হয়ে উপায় নেই। ফোমিচেভ লোকটা ভালো, সুযোগ নিতে সে চায় না। রায়াকে সে একটু আনন্দ দিতে চায়। রায়া একা…হানা জানেন স্বামীহীন জীবন কেমন। নাউম যখন বিদায় নিয়ে যান, তিনি তো তখন স্বামীর কথায় উঠতে-বসতে রাজি ছিলেন। তবু সময় তখন ছিল অন্যরকম। থিয়েটারে তিনি যান নি। মানুষ তখন ভগবানে বিশ্বাস করত। হযতো বোকামি, কিন্তু মানুষ ভয় করত—কিন্তু আজ রায়াকে বাধা দেবার কি আছে? ফোমিচেভকে তার ভালো লাগে: কাল কেমন উদ্বিগ্ন হযেই জিজ্ঞেস করলো: কেউ কি আমাকে ফোনে ডেকেছিল? তার পনেরো মিনিট পরেই ফোমিচেভ ডাকলো। সে ভদ্র, কিন্তু বয়েস তার কম—রায়ারই বযেসী হবে—হানা ওসীপকে বলতে চেয়েছিলেন, পুরো একবছরের জন্য অল্প বয়েসী বৌকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু ছেলে রেগে গেল। অবিশ্যি, ওসীয়া নিজেই সব বোঝে—চালাক ছেলে সে—কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্য—রায়াচ কার থেকেও এর মূল্য অনেক বেশি।—কিন্তু ওসীয়ার টান আছে—আলিযাকে পেয়েছে। পরিবার ছাড়া আবার জীবন কি!—নাউম তো ছিল পাগল—সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে চলে গেল। কোথায় গেল কে জানে! তার ওপরে আবার বিদেশে গিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো—বেচারা নাউম—মাটির পৃথিবীতে কখনো সে থাকেনি—ছিলো কল্পলোকে। লিওবাও বাপেরই মতো—শুধু বরাত ভালো: জন্ম থেকেই মুখে রূপোর চামচে ছুঁইয়েছে। ওসীয়া কিন্তু এমনি শান্ত—কিন্তু মনে কি আছে কে জানে? রায়া তো বলে, ও পাগল, নইলে কেউ সাধ করে উত্তরে যেতে যায়।—হয়তো ওসীয়াও নাউমের মতো? ওরা বলে ভগবান নেই, কিন্তু ভগবান ছাড়া কে বুঝবে মানুষের মন?

হানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আলিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

আনা কারেনিনা ভালো লাগলো না। রায়া সঙ্গীর কথা ভুলে গিয়ে কাঁদলো।

## নয়

• রয়কে লাঁসিয়ে পাকা কথা দেওয়া স্থগিত রাখলেন, যদিও মার্সেলিনকে জানালেন: সব ঠিক, বোস আইন-এর মান বাঁচলো। রাশিয়ার মাল সরবরাহ করলেন—সেটা নিজের সম্মানের ব্যাপার (আমি পুতুল নই!) কিন্তু রয়-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারলেন না। এদিকে গেলিনো বিক্রি করেও কোনো সুরাহা হবে না। লাঁসিয়ে তাতে খুশিই হলেন। ভালোই হোলো! মার্সালিনকে কি করে বঞ্চিত করব ? · হঠাৎ একটা কিছু ঘটে যাবে সে আশাও নেই। লাঁসিয়ে ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন, রয়-এর সঙ্গেই তাকে কাজ করতে হবে। তা, লোকটা খারাপ কিসে? ·· তিনি নিজেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন: বড় বেশি রং চড়ানোও হয়েছে। জার্মানরা যদি আমাদের ব্যবসায় টাকা খাটায় তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই লড়তে যাবে না। অবশ্য জার্মান—জার্মানই। ··তা আমি তো শারকে বা তার মতো কাউকে করবেই—এ নিমন্ত্রণ করে আনছি না! আর ব্যবসার ব্যাপারে একটু-আধটু গলতি থাকেই ··

লাঁসিয়ে এমনি করে নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। কিন্তু মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো। রয়কে এড়াবার পথ খুঁজতে লাগলো—এখানে ওখানে দেখা শুনা চললো। অবশেষে ঠিক করলেন যোসেফ বার্তের পরামর্শ নেবেন। লোকটার প্রতি একটু ঈর্ষা তার আছে। আগে যে লাঁসিয়ের কাছে আসতো, ছিলো বন্ধু, কিন্তু হঠাৎ আসা বন্ধ হয়ে গেছে। লাঁসিয়ে তবু ঠিক করলেন তার কাছে নিজে যাবেন। লোকটা বুদ্ধিমান পরামর্শ ভালই দেয়। তার বিষয়ে যাই-বলুন না আপনারা—নেভিলের কাছে সে কৌশলী বক্তা। লেঁজা তাকে জানে প্রচ্ছন্ন ফাসিস্ত হিসেবে—লোকটা আসলে শক্তিমানই বটে। তার সেই উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া একটা ভাঙা কারখানার কথা মনে করলেই তো যথেষ্ট। এখন সেই কারখানাই ফ্রান্সে সবার সেরা। এহেন কারখানার যে মালিক, সে-ইতো বলতে পারবে, কেমন করে সে রয়এর হাত থেকে রেহাই পাবে।···তাছাড়া বার্তে খাটি ফরাসি এত ইউরোপ ব্যুরোর ব্যাপারে নিশ্চয়ই মার্সেলিনের মতোই সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে।

সত্যিই বার্তে চালাক লোক, তার লম্বাটে মুখ যেন ফোকের ছবিকে মনে করিয়ে দেয়। মুখে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির ছাপ: সংযমও তার আছে: মাঝে মাঝে নাক কুঁচকে বিরক্তির ভাব দেখান। তিনি একা থাকেন একটা ছাড়া বাড়িতে—বাড়িটা দেখতে অমনি। আসবাব তেমন নেই। তিনি ওসব ভালোবসেন না, তাই করবেইযে তার কাছে 'মাছির বাজার', অবশ্য লাঁসিয়ের সামনে বলেন না নিজের কাজ ভালোবাসেন, তার কারখানার চারপাশে সুন্দর কতগুলো বাড়ি তৈরী করে দিয়েছেন মজুরদের জন্যে একটা স্কুল ও হাসপাতালও আছে। একবার চেমবার অফ ডেপুটিস থেকে একজন সদস্য দেখতে গিছলেন মজুরদেব সেই গ্রাম। তিনি সব দেখে শুনে বলেছিলেন, "এখন থেকে সাবধান না হলে আপনি শীঘ্রই কমিউনিষ্ট বনে যাবেন"···বার্তে হেসেছিলেন, "বোধ হয় না। প্রথমে আমি পুঁজিবাদী কিন্তু যারা সবটুকু বাঁচাতে চায, সবকিছু হারাবার ভয তাদেব বেশি—সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে।" তিনি জন্মেছিলেন উনিশশো সালের পয়লা জানুয়ারী তাই ঠাট্টা কবে বলেন, অবশ্য গর্বের মিশেলও তাতে থাকে: "আ ম আর বিশ শতক একই সঙ্গে এসেছি। আমি তো তারই প্রতীক।" সবাই বার্তেকে চেনে, কিন্তু তার প্রকৃত বন্ধু নেই। অবিশ্যি তিনি সে বিষয়ে উৎসুকও নন। কেমন যেন গোপন জীবন যাপন করতে চান—তাই কেউ কেউ ওকে রহস্যময় বলেই ভাবে—কিন্তু কাজে তিনি যুক্তিবাদী, মাথাও তার ঠাণ্ডা।

তাই নিজের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করে তিনি একটু দমে গেছেন—মাদোর সম্বন্ধে তার দুর্বলতা। যখন তিনি বুঝতে পারলেন, লাঁসিয়ের বাড়িতে ঘন ঘন আনা গোনার কারণ কি—নিজেকে ভৎসনা করলেন: একি নির্বুদ্ধিতা ও আমার উপর উদাসীন বলেই আমি মজলাম, ও সুশ্রী, বুদ্ধিমতী মেয়ে—একথা অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু ওর মত সুশ্রী আর বুদ্ধিমতী মেয়েব কি অভাব আছে? ওর যদি কিছু মৌলিকতা থাকে—সে ওর বাবা আর মার কাছ থেকে পাওয়া দেহের আর মনের খুঁতগুলো: মেয়েটা পাগল, আলসে: আবার রূপকথার ড্রাগনের মতো জ্বলেও ওঠে। অমন মেয়ে নিষ্ঠুরই হয়, স্বামীর সর্বনাশ করে, কখনো বা দেখা দেয় মনের বিকার—রিভলভার উঁচিয়ে ধরতেও দেরি হয় না। চরিত্রের এই বিশ্লেষণ ভারি খাপ খেয়ে যায়

ওর সঙ্গে, কিন্তু মন তো তাই বলে সায় দেয় না। তিনি মাদোর কথা ভাবতে লাগলেন। উন্মাদনা আছে, আর আছে উগ্রতা আর বিষণ্ণতা। কিন্তু কখনো তার এই আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন নি, বরং লাঁসিযেদের ওখানে যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন। মাদো তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বা ক্ষুব্ধ করেছে সে জন্যে নয়, তিনি দেখাতে চান: মাদোকে ছাড়াও তার চলে যাবে।

লাঁসিযের মনের অবস্থা অন্যরকম থাকলে বুঝতে পারতেন, বার্তে যার মাথা ঠাণ্ডা বলে নাম আছে, তিনিও কেমন বিব্রত হযে পড়লেন, যখন তিনি বললেন: "আমাদের ভুলে গেছ বলে আমরা খুব রাগ করেছি, মাসে লিন মাদো ..সবাই...কিন্তু লাঁসিযের মনের অবস্থা তেমন নয়, কথাবার্তার ফল ভেবে তিনি দমে আছেন। গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে তাকে—বলতে হবে তার আর্থিক সমস্যার কথা। লাঁসিয়ে আসল স্বীকৃতির আগে একবার থেমে নিঃশ্বাস নিলেন। বার্তে বললেন:

"গুজব শুনেছি বটে.. বন্ধু, তুমি বেশ পরেই জন্ম নিযেছ। তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা বেশ উঁচু. কিন্তু সময বদলে গেছে—একবার তুমি আমাকে ষোড়শ লুইযের সময়কার বন্দুক দেখিযেছিল। সুন্দর জিনিষ—কিন্তু গুলী ছোঁড়া যায় না—তুমি গত শতাব্দীর রীতি নীতি বজায় রাখতে চাও কিন্তু আমরা যে এখন বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তোমার কাছে রোস আইনে করবেইযের সঙ্গে যুক্ত। তার ফলও ফলেছে—এক ভাবে ব্যবসা করা আজকাল চলে না—হয় বড় হতে হবে, নয়তো ভেঙে পড়বে।"

'ভেঙে পড়বে' কথাটা শুনে লাঁসিযে শিউরে উঠলেন। কথাবার্তার মুখ পাতেই ট্যাড়া পড়লো, কিন্তু তিনি কি আশা করেছিলেন? বার্তেও চতুর, তিনি বাঁধাধরা পথে চলছিলেন না। কিন্তু তবু লাঁসিয়ে কোনোরকমে নিজের দুঃখের কাঁদুনি শেষ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, জার্মানদের এই দুরভিসন্ধি বার্তেকে ঘাবড়ে দেবে, কিন্তু সে শুধু মাঝে মাঝে মাথা নাড়লো আর হাসলো।

"তুমি কি কখনো কল্পনাবও আনতে পেরেছ...?"

"কিন্তু মসিয়ে লাঁসিযে, আমি তো আশ্চর্য হবার মতো কিছু এর ভিতরে দেখতে পাচ্ছি না। তারা অন্যদিক গুলোতেও তো এই একই ব্যাপার করছে আর সেইটাই তো স্বাভাবিক, আমি এর জন্যে তাদের দোষ দিতেও

তো পারি না—তারা বাঁচতে চায়, আমরা যে ঘুমিয়ে আছি, এতো আর তাদের দোষ নয়।"

"তুমি যে আপস করতে রাজি এতো জানতাম না..."

"আমি আপস করতে চাই—একথা বলেছি নাকি? তাহলে শুনুন—আমি জার্মান, রুশ, এমন কি পাপুয়াদের সঙ্গেও ব্যবসা করতে রাজি—অবিশ্যি যদি পাপুয়ারা ব্যবসা করতে রাজি থাকে—বা করতে পারে। আসল কথা কিন্তু তা নয়... জার্মানরা দেশে ঢুকছে বলে আমরা আজ সর্বনাশের শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছিনি—আমাদের নিজেদের একতা, আশা আর প্রেরণার অভাব বলেই তা সম্ভব হয়েছে। রাশিযার কথাই ধরুন না কেন। বোলশেভিকরা তাদের দেশের মানুষকে কমিউনিজমের বিজযের আশায় উদ্বুদ্ধ করে রাখছে, আপনার আমার মতো মানুষ সেখানে নেই—আক্রোষ থাকলেও কারো উপরে ফলাবার উপায় নেই—এমন কৌশলের তারিফ করতে হয় আমেরিকায় ওরা অন্য-ভাবে মানসিক শক্তি জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, সমৃদ্ধির পরে ওখানে আসে সংকট, আবার সংকটের পরে সমৃদ্ধি। আপনি আজ ক্ষুধার্ত হতে পারেন, কিন্তু যে টার্কির মাংস খাবেন, তাকে হৃষ্টপুষ্ট করার উপায় বার করা হচ্ছে, আপনি আজ কাদা ভেঙে চলেছেন, কিন্তু যে গাড়ীতে চড়ে আপনি আটচল্লিশটি রাষ্ট্রে চক্র দিযে বেড়াবেন, সে গাড়ী তো এখন কারখানায় তৈরীর পথে। যদিও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য এনে বসানো এ নয়, তবু তারই একটা ছোটখাটো সংস্করণ আর বাস্তবতাময়ও বটে। হিটলার যার করেছেন আর এক প্রতিষেধক একে তৃতীয উপায বলে ধরা যাক। তিনি বলেন, আমাদের ইউরোপ জয করতেই হবে, তাহলে প্রতি গরীব জার্মানের খাবারের হাঁড়িতে কিছু ক্ষুদ-কুঁড়ো মিলবে হাঁ, তাহলে সবকিছু ভোজবাজীর মতো বিরাট হয়েই দেখা দেবে। জার্মানরা পাবে আস্ত একটা হাঁস, হাঁড়ি ভর্তি হয়েই থাকবে। তা ছাড়া নাৎসীরা মানুষকে আগেই হুঁশিযারী দিযে রাখছে, জার্মানী যদি হারে তাহলে শূন্য হাঁড়িও বরাতে জুটবে না। এরাই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি? মন্ত্রীদের সংকট, শেয়ার বাজারের কেলেংকারী, ধর্মঘট চালাচ্ছে এমন সরকার—এই তো! তারা চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করছে, অথচ একথা ভালো করেই জানে যে সে চুক্তির শর্ত রাখা

সম্ভব হবে—না। যে-হাতিয়ারের অস্তিত্বই নেই তাই-ই তারা তুলিযে আস্ফালন করছে, এ যেন মেলার ভাঁড়ের দল। একথা শুনে অবাক হচ্ছেন না তো ?"

. লাঁসিযে বুঝতে পারলেন বার্টি ভুল করছে, কিন্তু এর উত্তর কি দেবেন ? লোকটার যুক্তি সাংঘাতিকই বলা যায়…

"আমার মনে হয, তুমি বড বেশী রং চড়াচ্ছ। আমরা ফরাসীরা যদি জেগে উঠি, লড়াই আমরা করবই। ভার্দুনের কথা এখনো আমার মনে পড়ে… না, না, ফ্রান্স ধ্বংস হবে না, হতে পারে না !"

তিনি চুপ করলেন, বার্টিও চুপচাপ। হঠাৎ লাঁসিযেব মনে পডলো, তিনি কেন এখানে এসেছেন।

"রাজনীতির তর্ক করতে আমি এখানে আসিনি…আমার ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কথাও তো ও জিজ্ঞেস কবল না। ভালই হোলো—আর কিই বা জিজ্ঞেস করবে ? রয-এর সঙ্গেই আমাকে কাজ করতে হবে," লাঁসিযে উঠে পড়লেন। বার্টি বাধা দিল :

"এখনো তো কথাই শেষ হোলো না…এবার আমরা রোস্ আইনের কথায় আসছি। তারপর কি ঠিক করলে ?"

"জানি না। গেলিনো বিক্রি করতে চাইছিলাম, তা ওতে তো হবে না। তাছাড়া মাসেলিনের সম্পত্তি বিক্রি করারও আমার অধিকার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমি কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

লাঁসিয়ের মনে হোলো, তিনি ভুল শুনেছেন। বার্টি উত্তর দিলে,— "পথ একটা আছে। কোনো দাবী-দাওযার কথা না তুলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি। বন্ধুত্বের প্রতিদান মাত্র, এখানে অন্য আইন তো খাটে না।"

লাঁসিযে বার্টির হাত নিজের দু'হাতে চেপে ধরে রাখলেন বহুক্ষণ। ঠাণ্ডা, শীর্ণ হাত। রোস্ আইনের কথা তখন তার মনে পডলো না, তিনি বার্টির এই আন্তরিকতায মুগ্ধ, অভিভূত হযে গেলেন। এমন মানুষ আজও আছে ফ্রান্সে, তবু ওরা বলে ফ্রান্স ক্ষযের পথে নেমে চলেছে। সেখানে নেই পতিব্রতা পত্নী, নেই বিশ্বাসী বন্ধু ··

## দশ

লিও আলপের্ত, খুব সাবধান হয়েই মার্সেলিনের কাছে তার স্বামীর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মার্সেলিন উত্তর দেবার আগেই বসবার ঘরে হাসতে হাসতে ঢুকলেন লাঁসিয়ে।

"শেষে এলে! আমি তো ভাবলাম, তুমি আর ফিরবেই না।...বাঃ খাসা চেহারাটা বাগিয়ে এনেছ! তোমার দেশের হাওয়ার গুণ আছে।...যদিও আমার মনে হয়, সব কটি ফরাসীকে একত্র করলেও তোমার জুড়ি মেলা ভার। তুমি ফরাসীদের থেকেও আরো বেশী ফরাসী। তারপর কেমন লাগলো? তা ভালই হবে। আমি তো এর মধ্যে এক রুশ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে ফেলেছি। ভারী ভদ্র মানুষটি! আমার ছবির সংগ্রহ তাকে সেদিন দেখালাম, সে তার ভিতরের সেরা ছবিটি ঠিক বার করলে—তুমি তো জানো—সেই যে সবুজ ঘোমটা ঢাকা মেয়েটি।... একটু কেমন যেন ক্ষ্যাপা, ওরা সবাই তাই—কিন্তু ভারী ভদ্র, নম্র আর প্রাণখোলা মানুষ। সে তো শুনেছি আজব দেশ। কি দেখে এলে বল?"

"সব কথার এক সঙ্গে কি করে উত্তর দেব বল! আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হোলো। তুমি ঠিকই বলেছ, ক্ষ্যাপামি আছে। কিন্তু চমৎকার, পরিশ্রমী ছেলে, সুশ্রী বৌ আর একটি মেয়ে নিয়ে সংসার করছে। সে আমাদের বোঝে না, বুঝতেও চায় না...কিন্তু মরিস, এখানে কি ব্যাপার বলো তো?"

"লুই তো এখন বিমান বিভাগের সহকারী লেফ্‌টেনাণ্ট, ভারী খুশী হয়েছে সে। আমি অবিশ্যি খুশি হতে পারি নি, আরো বিশেষতঃ এই অবস্থায়।... তাছাড়া সবই তেমনি আছে..."

আলপের্ত অবাক্। তার মুখের দিকে চেয়ে লাঁসিয়ে হেসে উঠলেন।

"এই দেখ, আবার রেগে যেওনা লিও। আসল ব্যাপারটাই তোমাকে বলা হয়নি। সব ঠিক হয়ে গেছে। এ যেন প্রাচ্যের রূপকথা—বার্টি সব মুসকিল আসান করে দিয়েছে। কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই—বন্ধুত্বের প্রতিদান মাত্র..."

"এতো ভারী অবাক কাণ্ড। আমি তাকে অবশ্য ভালো করে চিনিনা, কিন্তু সবাই না বলে সে বড় শক্তি ঠাঁই?"

"তার কারণ কি জানো, ওর যুক্তিগুলি ভারী সাংঘাতিক। ওই প্রথম আমাকে দেখিয়ে দিলে, রোস্ আইনেকে একটু মাজা ঘসা করতে হবে। আমি, মরিস লাঁসিয়ে নিজের যুগ পেরিয়ে গেছি; দ্বিতীয়ত সারা ফ্রান্সই আজ আমার মতো। তাই আমাদের ধ্বংসও এগিয়ে আসছে। মার্কিন আর রুশরা কাজ করছে, জার্মানরা করছে অস্ত্রসজ্জা, আর আমরা বসে আছি কাফেতে, পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সরকারের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠছি। বার্টি কেমন লোক জানো? একেবারে ভালো মানুষটি তবে হিংস্রতার ভাণ সে করে বটে। আর ভালোবাসে উলটো পালটা কথার জাল বুনে মানুষকে হকচকিয়ে দিতে।"

কিন্তু এতো তার উলটো পালটা কথা নয়। আমরা সত্যিই সেকেলে। ইউরোপ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে আমি তা অনুভব করেছি। কিন্তু তুমি তো জানো, কি জীবন আমি কাটিয়েছি। বোকামি করেছি, হিজিবিজি কেটেছি কাগজে, বাবার মতো কতো আজগুবি স্বপ্ন দেখেছি ··তুমিও তো আমারই মতো কবিতা লিখলে, ছবি আর কিউরিওর সংগ্রহ করলে, নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে মানুষকে···কিন্তু সেখানে আমাদের মতো পাগল নেই, তারা হচ্ছে খাটি কাঁক-কষা মানুষ। সত্যি কথাই বলি, তোমার আমার আজ কি দরকার জানো? কিছু টাকা আর অখণ্ড অবসর। আমার ভয় হয় বন্ধু, বার্টি হয়তো ঠিকই বলেছে, ওরা আমাদের টাকা আর অবসর দুই-ই ছিনিয়ে নেবে।"

"জানি না। হয়তো জার্মানরাই নেবে। চড়া বাজি রেখে খেলা চলছে, আমাদের সেখানে কি দাম বল! রুশরা আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছে, আমি তো সেদিন লিওস্তাইনকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। ও প্রথম দেখা হতেই সু-খবর দিলে, বিদার্তের বাড়ী প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। আমরা হেমন্তেই সেখানে যেতে পারব। আমি কি উত্তর দিলাম জানো? যদি হেমন্ত পর্যন্ত বাঁচি, তবে তো।···বোকামি ছাড়া আর কি বলো: ও আবার আজকাল একটুতেই ঘাবড়ে যায়···শোনো মরিস, তোমাকে আমাদের বিদার্তের বাড়ীতে আসতে হবে। সমুদ্রের ধারে সাদাসিদে একখানা কুটীর—আর কিছু নয়।"

বিদার্তের কথা তিনি বলে চললেন। লাঁসিয়ে তাকে কক্‌তোর নতুন নাটকের কথা জানালেন। তার পর এল ভারমুথ আর সোডা। তারা হাসলেন, বার্টির কথা আর উঠলো না। সে প্রলাপ তলিয়ে যাক না ভারমুথের স্রোতে।

সন্ধ্যায় লঁাসিয়ে মার্সেলিনকে জানালেন :

কালই বলব ভেবেছিলাম···কিন্তু একটা শর্ত—আর কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানাবে না। বার্টি টাকা দিয়েছে—বন্ধুত্বের প্রতিদানমাত্র—সে নিজেই তাই বললে। সে তার যুক্তির খোঁচায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, কিন্তু ভদ্র বটে লোকটা। খাটি ফরাসী। শুধু তোমার কাছে একটা অনুরোধ—কাউকে এ কথা বোলো না। আমি তাকে কথা দিয়েছি, একথা পাঁচকান হবে না। মাদোকেও বোলো না। মার্সেলিন উদাস ভাবেই শুনলেন তার স্বামীর কথা : রয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি—এইটুকুই যথেষ্ট—তার পরে আর মার্সেলিনের কোনো কৌতূহল নেই। নিজের চিন্তায় তিনি বিভোর।

তোমার ব্যবসার ব্যাপারে মাদোকে টানতে যাব কেন? তাছাড়া ওর সঙ্গে তো আজকাল কথা বলাই মুস্কিল।···"

লঁাসিয়ে ভয় পেলেন।

"কি হয়েছে ওর? ওকি অসুস্থ?"

"না, অসুস্থ নয়···আমি ঠিক জানি না···তবে এখন ওর মনের অবস্থা ভয়ংকর।"

"ওকে কিছু জিজ্ঞেস করনি?"

"তোমাকে তো বলেছি, কিছুই বলবে না। তাকে একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম। সে বললে, কিছুই হয়নি···"

মার্সেলিনের মনে পড়লো তার কুমারী জীবনের কথা। গ্রীষ্মের রাত, ঝুপঝুপ করে পড়ছে বৃষ্টি—বুড়ী রাঁধুনীর ঢিলে পোষাক গায়ে চাপিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলেন মরিসের কাছে। কেন যে একথা আজ মনে পড়লো, মার্সেলিন নিজেই বুঝতে পারলেন না। লঁাসিয়ে পোষাক ছেড়ে ঘড়ীতে চাবী দিলেন। তারপর হাই তুলে বিছানায় এসে বললেন। এবার সান্ত্বনা দেওয়ার পালা চললো।

"তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ মার্সেলিন। মাদোর জন্যে কোনো ভাবনা নেই। কি হতে পারে তার? আমার জীবনে যে দুঃখ পেয়েছি, ভগবানের ইচ্ছায় তার সে দুঃখের আঁচ গায়ে লাগবেনা। তাছাড়া ওতো একেবারে ছেলেমানুষ···হয় প্রেমে পড়েছে, নয়তো কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছে—হয়তো তার দৃশ্যচিত্র ভাল হচ্ছেনা, তাই তার মনে হয়েছে প্রতিভা নেই। এতো, জলের উপরের আলোড়ন,

তাছাড়া কিছুই নয়। আজ বিষন্ন, কাল আনন্দে উল্লাস—এই তো যৌবনের ধর্ম। ওর বয়সে সব সময়েই মনে হয় আকাশে বুঝি মেঘ ঘনিয়ে এল, কিন্তু ঝড় তো কখনো আসে না। ঝড় আসে শেষে—যখন মানুষ চায় অবসর। আমাদের জীবন ভালই কেটেছে মার্সেলিন—এখন এসেছে প্রকৃত বসন্ত। আমার শুধু কামনা আসল ঝড় যেন না আসে।

## এগারো

রোজের সাবাঁ স্টুডিয়ো পরিষ্কার করছিল। অপটু হাতের গুছানো, তাই একটা ফুলদানি ভাঙলো, কাউচে রং ঢেলে পড়ল। একটা মোজা তাপিন তেলে চুবিয়ে আসবাব পত্র মাজা ঘসা করতে লাগলো। যত রাজ্যের জঞ্জাল এনে জমা করলে কাউচের নীচে। ঐ একটি মাত্র আসবাব তার ঘরে। আর একটা আছে মস্ত উঁচু টেবিল, তার উপরে টুকিটাকি জিনিষের স্তুপ—আর একটা আছে টুল। তার ক্যানভাসগুলির উপর জমেছে ধুলো, ধুলো জমেছে তাকে আর পেরেকে ঝুলানো পুরানো পোষাকের ওপর। আর সে এক পুরু ধুলোর আস্তরণ। কাউচের ওপর থেকে অকারণে একটা পালক ফুঁ দিয়ে সাবধানে উড়িয়ে দিলে সাবাঁ। তারপর সেকি হাসি! একেবারে সেই প্রেমের নাটকের ব্যাপার—শিল্পী রাজকুমারীর প্রতীক্ষায়···

অবাক হয়ে এবার স্টুডিয়োর দিকে তাকাল সাবাঁ। হঠাৎ বুঝি সে উপলব্ধি করলো সে এখানে থাকে। অথচ কম দিন তো হয়নি এখানে। বহু বছর কেটে গেছে। দেয়ালের প্রতিটি দাগ তার চেনা। দাগগুলো দেখে কখনো বা আনন্দ পেয়েছে, কখনো বা রেগে গেছে। মডেলকে টুলের উপর বসিয়ে দিতেই দেয়ালের পটভূমিকা কখনো বা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কখনো বা অবাধ্য হয়ে রয়েছে দেয়াল। সে যেন তখন এক শূন্যতাময় বিস্তার। কিন্তু এখন এই স্টুডিয়োর দিকে তাকিয়ে তার নিজের জীবন নিয়ে জাবর কাটতে শুরু করল সাবাঁ। অবহেলিত, নিঃসঙ্গ জীবন শূন্যতাভরাও বটে। তার আর সবার মতো পরিবার নেই, যত্ন করবারও কেউ নেই। কি করে এমন হাল হোল?—তার নিজের উদাসীনতাই কি দায়ী? না, তা তো নয়। কোমল, স্নেহ-প্রবণ তার মন—বাস্তবের উপর তার ঘৃণা আছে তা নয়—তার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, সে ঋষি নয়। লম্বা

চওড়া কাঁধ মানুষটি তার একটু যেন মুটিয়েই যাচ্ছে। তা ছাড়া তার ভঙ্গী তো অনন্ত। সব কিছুকে যেন একত্র করে আনে। যেখানেই সে যায়, সেখানেই যেন ভিড় লেগে যায়—যেন তার উপস্থিতিই পৃথিবীকে ভরে রেখেছে। আস্তে আস্তে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সে খায়, উদাসীন হাসিতে ভেঙে পড়ে। আজও সে একা আছে, তার কারণ—তার একটি কামনা অন্য কামনাগুলিকে দাবিয়ে রেখেছে। এত উদগ্র আর নিঃস্বার্থভাবেই সে শিল্পীকে ভালবাসে যে, যশ আর ঐশ্বর্যের প্রতি তার ঘৃণা সুস্পষ্ট—সে আলাদা জীবন গড়ে তুলেছে এরই জন্য—তার নাম কল্পলোক।

বহুদিন আগে সে প্রেমে পড়েছিল—দেখে মনে হয়েছিল, সে প্রেম গভীর, মেয়েটিও তাকে ভালোবাসত। বন্ধুরা যেচে বিয়ের নিমন্ত্রণ নিয়ে রেখেছিল—বিয়ে তো হবেই। আজ আর কাল যখনই হোক। কিন্তু বিয়ে হোলো না। সে তখন আর একটি মেয়ের প্রতিকৃতি করছিল—তার সোনালী চুল আর নিষ্পাপ সৌন্দর্যের মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে না। তাই বিয়ের মজলিসেও হাজির হওয়া হোল না, তার ফল হোল এই, তার প্রেমিকা বেছে নিল আর একজনকে। সারা রাত সে অস্থির হয়ে কাটালে বার বার নিজেকে জিজ্ঞেস করলে, কি করে এমন হোলো। কিন্তু ভোর না হইতেই সেই সোনালী চুল মেয়েটির আর একখানা প্রতিকৃতি শুরু হোলো। অথচ তখন তাকে মনে মনে সে ঘৃণাই করছে।

পারীর শিল্পীচক্রে সে মৌলিকতার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু জনসাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নয়—যশ সে চায় না—তার চেষ্টাও করেনি। সমালোচকদের সে তার কাছেও ঘেঁসতে দেয় না। তাছাড়া এত ধীরে কাজ করে যে প্রদর্শনী ঘুরে-বেড়ানো মানুষের দল তাকে মনে রাখতে পারে না। মাঝে মাঝে নিজে যা ভাবে, মাদোকে জানায়, বলে, শিল্পী পৃথিবী যেমনটি দেখবে, তেমনটি আঁকবে—একথা মনে করো না। সে তার নিজের অনুভূতিকে চিরস্থায়ী করবে—তাও তো নয়। না, মাদো শিল্পী হচ্ছে প্রথমে দার্শনিক। মুখ বিকৃত কোরো না, তোমাকেও প্রথমে দার্শনিকই হতে হবে। আমাদের চিন্তাধারা রঙে রূপ নেবে। দুনিয়াকে আমরা দেখি, তার অর্থ খুঁজে বার করি, সে যা তার ছায়া আমাদের ছবিতে ধরা দেয় না, ধরা দেয় তার

এক নতুন রূপ। একথা সত্যি যে গ্রীক স্থপতিরা তাদেব সমসাময়িক জীবনকে পাথরে রূপ দিয়েছিলেন, সে যুগের ভাবধারা আর সংস্কার তাদের প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু তারা তো শুধু যুগকে রূপ দেননি, মর্মরে এক নতুন জাতির সৃষ্টি করেছিলেন। প্লেটো তো এখন সেকেলে হয়ে গেছেন, কিন্তু আফ্রোদিতির মূর্তি তো তা নয, আর কখনো তা হবেও না—তাহলে তুমি বুঝতে পারছ মাদো, আমরা দুনিয়াকে রূপ দিই না, আমরা তাকে নতুন সৃষ্টি দিয়ে ভরে দিই।”

সাবাঁ পারীর রাজনীতির ঝড় এড়িয়ে চলে। চোখে তার মাতন দেখতে পায় না। কখনো কখনো কারো সঙ্গে দেখা হলে বলে, সেদিন গুলির শব্দ শুনলাম যে? বা, এ কিসের ধমঘট বলতো? এর বেশি কিছু সে জানতে চায় না।

একদিন লেজাঁ তার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে বললে, এক গোপন যুদ্ধ চলছে ফ্রান্সে, যে কোনোদিন সে যুদ্ধ পথে ছড়িয়ে পডতে পারে, সাবাঁকে বেছে নিতে হবে কোন পক্ষে সে সেই যুদ্ধে যোগ দেবে। সাবাঁ মনোযোগ দিয়ে শুনলে, তারপর লেজাঁকে দেখালে তার সদ্য-আঁকা ছবিগুলি।

“চমৎকার ছবি। কিন্তু আমি তোমাকে জাতির ভাগ্যের কথা বলছিলাম।”

“হাঁ, আমিও ঠিক সেই চিন্তাই করছি। আমার মতে যে-ছবি ছবি বাদ দিয়ে অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়, সে-ছবি ছবিই নয়, তাকে সজ্জা বললে বা আপত্তি কি। বোধ হয়, তুমি যা করছ, আমিও তাই করছি—তবে আমার পথ আলাদা। পয়লা আমাকে শিল্পী হিসেবেই ধরতে হবে—তবে যদি যুদ্ধ আসে তখন কি হবে কে জানে—”

মাদোর ‘বিবেক’ হচ্ছে সাবাঁ, সে তার কাছে করবেইয়ের জাঁকজমক আর শূন্যতা থেকে মুক্তি পেতে ছুটে যায়। মানুষটার হৃদয়ের পরিচয় সে জানে, তার কাছে সে তার আত্মার উদ্বেগের কথা জানায়। কিন্তু মাঝে মাঝে সে নিজেকেই জিজ্ঞেস করে বসে, “ও কি শুনছে, না আমাকে এই পোষাকে আঁকলে কেমন দেখায় তাই ভাবছে?——”

মাদো কি বুঝতে পারে যে সে-ই একমাত্র মানুষ যে তাকে ছবি আঁকার চিন্তা থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে? সেও কিছুদিন হোল বুঝতে পেরেছে,

মাদো তার জীবনের কতখানি জুড়ে আছে। যখন সে ছিল কালেজী মেয়ে তখন থেকেই সে তাকে চিনত ; তার প্রথম ছবি আঁকার প্রয়াস সে লক্ষ্য করেছে।... ধীরে ধীরে অনুভূতি প্রগাঢ় হয়েছে। একবার মাদোর সঙ্গে তার ক'মাস দেখা হয়নি—লাঁসিয়েরা তখন গালিনোতে, জীবন তখন তার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছ্‌লো, ক্লান্তিকর মনে হয়েছিল। সে যখন তার নৈরাশ্যের কারণ বুঝতে পারল, কেমন দমে গেল : কি দুর্ভাগ্য! মাদোর তুলনায় সে বেশ বুড়োই, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলিঙ্গনবদ্ধ ছবি এঁকে কামনাকে নিবৃত্তি দেওয়ার মতো বুড়ো তো নয়। যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু মন তো রাশ মানলো না, সে যে অবাধ্য! অতীতে দু-একটা মেয়েব সঙ্গে তার ছুটো সম্পর্ক হয়েছিল, তারা তারই মত নিঃসঙ্গ। কিছুদিনের জন্য তারা তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি হয়েছিল, আবাব অভিযোগ না কবে ছেড়ে যেতেও দ্বিধা করে নি। এখন মেয়েবাই তার কাছে বিরক্তির ব্যাপার, এক মাদোই ব্যতিক্রম। বহুবাব সে ভালবাসার খেয়াল সম্পর্কে ভেবেছে। উনচল্লিশ তার বয়েস, মাদোর চব্বিশ-পঁচিশ বয়েস হবে। সে আবার সাজসজ্জা করতে ভালবাসে হয়তো সাফল্যেব কামনাও তার আছে—হাঁ, সমাজের সাফল্য সে চায়। ধনী কারখানার মালিকেব মেয়ে, আদরে লালিত হয়েছে, তাব উপর দেখতেও ভালো। কী দেখে সে মুগ্ধ হোল ? সে কি স্বপ্ন দেখছে ?

সে মাদোকে বলেছিল, একটি স্পেন দেশী মেয়েকে সে ভালোবাসে—তার সঙ্গে ব্রিটানীতে তার পরিচয়। একথা বলার মানে এই যে, সে ভয় পেয়েছিল,. হয়তো নিজের অনুভূতি প্রকাশ হয়ে পড়বে। মাদো মাঝে মাঝে তাকে এখনো জিজ্ঞেস করে, তার স্পেনবাসিনীর খবর কী। সে কি বলবে ভেবে পায় না, রেগে ওঠে।

সে কথা দিয়েছিল, পাঁচটায় আসবে। তাই সকাল থেকেই সে যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে, এ অস্থৈর্য থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সে স্টুডিয়ো গোছাতে শুরু করেছে। টেবিল থেকে আবর্জনাগুলো সরাতে সরাতে হঠাৎ তার চোখে পড়লো মাদোর একটা দস্তানা—সেই বহু আগে শীতকালে যখন ছবি আঁকার জন্য আসত—তখন হয়তো ফেলে গিছলো। সে সোয়েডের দস্তানার উপর আলতো করে চাপড় দিতে দিতে উত্তেজিত হয়ে উঠল : এ তো এক প্রহসন! একে শেষ করে দিতে হবে। কিন্তু সে যদি...?

কেউ কি অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে? চৌদ্দ বছর, হাঁ, চৌদ্দ বছর তো আর কম কথা নয়। কিন্তু এমন বিয়ের কথা কি সে বহু শোনেনি? বোকামি? হয়তো তাই। কিন্তু এ ব্যাপারে তো সবাই বোকা—

মাদো না আসা পর্যন্ত সাবাঁ এমনি ধারা ভাবতে লাগল। যখন সে এল, ভাবনা উবে গেল, সে শুধু প্রশংসার দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চেতনা যেন আচ্ছন্ন করে দিল তার উপস্থিতি—সে যেন নিঃশ্বাস গ্রহণ করলো, সত্তার সে নিশ্বাস। মাদোও অসম্ভব উত্তেজিত। বইগুলো এলো-মেলো করে আবার সাজাতে বসলো, ধুলোর ঝড় তুললো, কোথাও ধপ করে বসে পড়লো, আবার তখুনি লাফিয়ে উঠলো। আলাপেও সে অসংলগ্ন হয়ে উঠেছে ঘর-গৃহস্থালীর ব্যাপার থেকে একেবারে বনার প্রদর্শনী, আবার বনার প্রদর্শনী থেকে এল যুদ্ধে। সাবাঁ তাকে এত বিচলিত কখনো দেখেনি। মাদোর উত্তেজনা তাকে সংক্রামিত করলো, সেও কেমন বিব্রত হয়ে পড়লো: "আমি ওকে এখুনি বলবো!—"

'মাদো, তুমি কি, যে প্রেমে পড়েছে তাকে বুঝতে পার? তুমি তো তার তুচ্ছ জিনিষগুলো নিয়েই ব্যস্ত, নিঃশ্বাস তাতেই তোমার ফুরিয়ে যায়—'

সে তাকে বাধা দিল:

'থামো! আমি ওকথা শুনতে চাই না। বুঝতে পারছ—আমি ওকথা শুনতে চাই না!—'

সে হটে গেল। তারপর বহুক্ষণ নিস্তব্ধতা। মাদোই প্রথমে ভাঙলো সে স্তব্ধতা:

"রোজের, রাগ কোরো না। আজ আমি কেমন যেন হয়ে গেছি। আগে যেমন বকতে, তেমনি বকো, বল, আমি ধনীর মেয়ে, ফুলের তোড়া আঁকি উদাসীন বিতৃষ্ণা থেকে। মনে আছে কি তোমার? কত সহজ ছিল তখন জীবন—না, না, রাগ কোরোনা! জানো, কাল যখন বোনার-এর প্রদর্শনী দেখছিলাম, তোমার কথা মনে পড়ছিল—ভাবছিলাম—কি চমৎকার!"

সাবাঁ শান্ত। সে বোনার-এর ছবির কথা বলতে লাগল:

যখন ছবিগুলো দেখবে, সময় বলে কিছু আছে—একথা মনেই হবে না। কবিতা আর ছবিতে এইখানেই তফাৎ। সাবাঁ হাসলো, মাদো, এমন

কি তার বাইরেটাও আলাদা—কবি তো পাখীর মত, আর শিল্পী যেন গাছ।—"

মাদো তার কথা শুনছিল না।

"মাদো, কি হয়েছে তোমার ?"

"কার—আমার ?"

"হাঁ, তোমার।"

"জানি না। হয়তো বা জানি, কিন্তু তার দাম তো কিছু নয়। অতি তুচ্ছ ব্যাপার রোজের, হাতের একটা ব্রেসলেট হারিয়ে গেলে যেমন হয়— ব্রেসলেট হারিয়ে গেলে তাই নিয়ে কান্না কি বোকামি নয় ? তাড়াতাড়ি বলো, সত্যিই কি বোকামি নয় ? হাঁ, এই তোমার কাছে অনুরোধ—আমার ভিক্ষা— আমাকে বকো রোজের ! ব্রেসলেট আমি হারাইনি—।" স্বর তার অশ্রুভেজা, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি সামলে নিল। রোজের, আমাকে বাঁচাও, আমি পাগল হয়ে যাব। ভয়ানক—ভয়ানক ব্যাপার ঘটেছে—হাঁ, এইখানেই ঘটেছে, অথচ আমার কিছু করবার নেই। তোমার সঙ্গে বসে বাজে কথা বলছি।—"

সাবাঁ কেঁপে উঠলো, কেঁপে উঠলো মাদো ;—সে মাদোর কাছে এগিয়ে গেল, তার হাতের উপর হাত রাখলো, চাপড়ালো—যেমন সে কিছুক্ষণ আগে চাপড়েছিল তার হাতের দস্তানাটা। কি যেন বলতে চেষ্টা করলো বার কয়েক, কিন্তু পারলো না। শেষে থেমে থেমে বলল :

"মাদো, আমিও পাগল হয়ে যাচ্ছি—"

মাদো হাসল, সে হাসি বিশ্বাসের।

"তাই তো তোমার কাছে এসেছি—ব্রিটানীর ঘটনা তুমি আমাকে বলেছিলে, তাই ত আমার বিশ্বাস তুমি বুঝবে। তুমি একাই আমাকে সাহায্য করতে পার, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো বলবো না। আমি ভাবতাম নভেলে ছাড়া বুঝি কেউ কখনো প্রথম দেখায় প্রেমে পড়ে না। ভাবতাম— অনেক দিনের জানা-শোনা হবে, আলাপ হবে, কিন্তু তাতো নয়—এ যে সব আলাদা—প্রথম দেখায়ই মনে হোল, এই আমার নিয়তি। কেন, তুমিও তো ছিলে—তোমার কি মনে পড়ছে না, কেমন বোকার মতো করছিলাম ? ওর উপরে রাগ করতে চাইলাম, অভদ্র হতে চাইলাম, ওকে আঘাত করতে চাইলাম—

কিন্তু ওর কাছে আমি ? এক পাগলী—এক ফরাসী মেয়ে—ফরাসী মেয়ে তো ওদের চোখে পুতুলেরই সামিল। আর আঘাত তো ওর কাছে আঘাত নয়, পিন ফোটানো মাত্র সে তো ভ্রূক্ষেপও করলো না। হাঁ, কালই তো তাই ঘটলো। ওর সঙ্গে প্রদর্শনীতে দেখা হোলো। তোমাকে তো বলেছি, আমি বোনার কথা ভাবছিলাম। না, তা তো নয়। আমি ওকে বোনার কথা বলছিলাম, কিন্তু ভাবছিলাম অন্য কথা। ও শীগগিরই চলে যাবে সেই তখন আমার ভয়। তোমাকে অনুরোধ করছি—ওকে এখানে ডেকে পাঠাও, ওর সঙ্গে আমার দেখা করা চাই।"

"কিন্তু মাদো, কি করে আমি তা করব ?' ওকথা সে বলতে চায়নি, কিন্তু নিজের উপর রেগে সে বলে উঠলো : "আমার সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই—"

কিন্তু মাদো শুনলে না তার কথা।

"ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে, স্পষ্টই বলব, হুল ফোটাবো না। জানো না, কাল আমি ওকে কি বলেছি, রুশদের ভালোবাসা হয় তো যায়, কিন্তু তাদের একজনকে বেছে নিয়ে ভালোবাসা শক্ত। কারণ ওদের সবই তো পাইকারী রূপ নিয়ে দেখা দেয়—ওদের স্তেপ, বন আর মানুষ সব পাইকারী, খুচরো কিছু নেই। কি বোকার মতো কথা। আজ আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ওর হয়তো আমার সম্বন্ধে অনুভূতিই নেই। কিন্তু আমি ওকে চাইনা, ও আমাকে ঘৃণা করুক। যদি তুমি ওকে ডেকে না পাঠাও, আমি নিজেই যাব ওর কাছে।

সার্বা ভাবলো : "ওকে নিরস্ত করতে হবে, ওকে আত্ম-সম্মানের কথা বলব। রুশ ছোকরা হয়তো ওকে বুঝবে না—" কিন্তু মাদোর জরার্ত চোখের দিকে, তার মূক বা কাঁপা ঠোঁঠের দিকে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বললো,

"বেশ, তাকে আসতেই বলছি।"

একজন পাগল আর একজনকে আরাম করতে পারে না। আর তা ছাড়া রোগও চিকিৎসার বাইরে—সে কি আর মাদোকে ভালোবাসে না ? তার এখন একমাত্র ভয়, মাদো তাড়াতাড়ি চলে যাবে।—

মাদো উঠে পড়লো। যেমন উত্তেজনা নিয়ে সে ঢুকেছিল তেমনি উত্তেজনা নিয়েই সে চলে গেল। জানালায় দাঁড়িয়ে সার্বা দেখল, সে মোড়ে চলে

গেছে, এবার মোড় ঘুরলো। আবার ফিরে এলো, একটু দাঁড়ালো—আবার চলতে শুরু করলো, যেন সে কোথায় যাবে জানে না।

সে জানালায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। বিরাট বিরামহীন দুঃখের অনুভূতি তাকে ছেয়ে ফেলেছে। যা বলার ছিল, বলা হয়ে গেছে, সে স্পেনবাসিনীর কথা সে ভুলে যেতে পারে—রুশ ছেলেটির বয়স কম, তাছাড়া সে জীবন্ত, সংক্রমিত সে হয়নি এই দুষ্ট সভ্যতায়—সাবাঁ তার আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকাল, শিউরে উঠলো। একখানা ছবি তাকে আকর্ষণ করছে, সে এগিয়ে এল ছবিখানির কাছে। একখানা দৃশ্যচিত্র, মাদো গেলিনোতে চলে যাবার আগে সে এঁকেছিল—ধ্যাবড়া রঙের খেলা!—গাছটা এখনও শেষ হয়নি। বনের কথা সে রুশ ছেলেটিকে কেন বললে? বুড়ো গাছ, কত বুড়ো কে জানে, তবু দাঁড়িয়ে আছে—শিকড় তার শক্ত—কিন্তু সে গাছও উপড়ে পড়ে—ঐ গাছ আবার তাকে আঁকতে হবে, ঠিক এমনি নয়—সত্যিকারের গাছ—নিজের প্রতীক…

আঁধার নেমে এল। খবরের কাগজের ফেরিওয়ালারা হাঁকছে পথে, প্রেমিক-প্রেমিকারা জানালার নিচে ফিস ফিস করছে। এবার পথ জনবিরল হয়ে গেল। সাবাঁ তখনো ভাবছে, মনে তার তিক্ততা, তবু সে সংযত। সে ভাবলো: চল্লিশ বছর বয়েসে প্রেমের হতাশায় কেউ আত্মহত্যা করে না। জীবন থেকে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া হলেও আর একটা জীবন তো তার আছে। সেখানে প্রস্তাব করতে হয় না, প্রত্যাখ্যানেরও ভয় নেই। সে জীবন ওয়ারিস হিসেবে পাওয়া নয়—তাকে তৈরি করতে হয়েছে—কামনা দুঃখ আর জ্ঞান মিশিয়ে গড়তে হয়েছে—সে তার শিল্প।

## বারো

সাবাঁ আর সার্জির কেমন যেন এক মুহূর্তেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সার্জি একটা বেশ নিচু টুলে পা ছড়িয়ে বসেছে। ছবি ভাল লাগলে সে হাসছে, কথা কইছে না।

সার্বা তাকে জিজ্ঞেস করলো রাশিয়ার কথা। কেমন সে দেশ? সার্জি তাকে বললো স্তেপ আর বনের কথা।

"আমাদের দেশে কেউ দৃশ্যচিত্র আঁকতে চায় না, সবাই চায় তার গান গাইতে। দৃশ্যের যেন ঢেউ চলেছে সুরের মতো, কিন্তু তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। আপনি তাকান—মনে হবে সব ফাঁকা—কিন্তু হঠাৎ উঠলো মেঘের ফাটল ছিঁড়ে সূর্য—মাঠের একটা কোণ আলো হয়ে গেল, আলো এসে পড়লো মেঠো পথের যাত্রী একটি ছোট মেয়ের মুখে। আবার হয়তো সব কিছু আঁধারে ঢেকে গেল, আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত—কি মোহময়। তারপর আছে তুষার-ঝড়। আর নীরবতা—সে তো যেন আর এক সুর

তোমার দিকে তাকিয়ে দেখছি, সার্বা বললে, আমার মনে ভাবনা, কেন তাদের আঁকা এত শক্ত। সে কথার উত্তর তো তুমি দিলে। তোমার মুখ যেন তোমার দেশের দৃশ্য—ক্ষণে ক্ষণে সে বদলায়। মুখে গড়ন নেই আছে অভিব্যক্তি। তোমার ছবি আঁকা খুবই শক্ত, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করব—কিছুদিন থাকতে পারবে?

সার্জি উত্তর দেবার আগে দরজায় ঘা পড়লো। মাদো এসেছে। সে সুরে অবাক আবেগ এনে জিজ্ঞেস করলো:

"সার্বা, তোমার এখানে লোক আছে দেখছি?"

সার্জিকে সে বন্ধুভাবেই সম্ভাষণ জানাল, কিন্তু সংযত তার ভঙ্গী। সার্জি একটু বিব্রত বোধ করলে। প্রথম কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তি কেটে গেল, এবার শুরু হোল আলাপ। কি নিয়ে তারা আলাপ না করলে। ব্রিটানির মেলা, রাশিয়ার শান্ত নদী, গাছের বড় বড় গুঁড়ি ভেসে চলেছে বোসার্দের সনেট—দুঃখের আমেজ-মেশানো সুখ তার উপজীব্য, 'মিষ্টি মদ, অথচ জিভে তেতো স্বাদ রেখে যায়, প্রচুর মদ খেয়ে যারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাদের সম্বন্ধে রাশিয়ানরা বলে, দুঃখ মিশিয়ে মদ খেয়েছে। উত্তরে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল রাত—এমনি নানা কথা এল গেল।

"ওখানেই আমি থাকতে চাই, মাদো বললে, ওখানে বসে স্বপ্ন দেখা যায়—না, না, আমার দিকে অমনি করে তাকাবে না। জানি, তোমার দেশে সবাই কাজ করে।—আমিও দিনে কাজ করব। কিন্তু রাতে—দিনের থেকে আলাদা রূপ নিয়ে যখন দেখা দেবে পৃথিবী—তখন কি চমৎকার হবে।

আমার মনে হয়, উজ্জ্বল রাতে, যখন সাদা হয়ে যায় চারদিক, তখন বাড়ীঘর, আকাশ, মানুষ—সবই তো আলাদা।”

“কিন্তু তারপরই আসে শীত—তখন চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই আঁধার।—”

“তাতে কিছু যায় আসে না—এক ঘণ্টার জন্য অন্য পৃথিবীতে চলে যাওয়া সেই তো সুখ—।”

“কিন্তু যখন কাজ করতে হবে, তখন তো সেই আঁধার পৃথিবীতেই করতে হবে”, সাবী বললো।

“আমি ছবি-লিখিয়ে হিসেবে কি, কতটুকু আমার মূল্য? এখনো তো ছাত্র। আমি অ, আ, নিয়ে আরো দশ বছর কাটাব। কিন্তু আমি এখনি কিছু সৃষ্টি করতে চাই—এক মুহূর্ত অপেক্ষা করব না। সে সৃষ্টি যদি অক্ষম হয়, তার উপরে যদি নির্ভর করা না যায়, যাক না। কিন্তু সে তো আমার জিনিস—তাতে আছে আমার আত্মার সবখানি…’

সাবী অবাক হয়ে তাকাল, অনেক দিন থেকেই মাদোকে সে এমনিটিই জানে। ও স্কুলে পড়বার সময় একটা হাসির ব্যাপার ঘটেছিল, সেটা মনে পড়লো। ওর ক্লাসের মেয়েদের একটা প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়েছিল, কর্নেলীর রচনায় কর্তব্যের স্থান সম্বন্ধে। মাদো লিখলে একটি তারার কথা। সে এক জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতকে প্রেমে হাবুডুবু খেতে দেখে মূর্চ্ছা যায়। সে প্রেমিকা তারাটি উপহার পেয়েছিল বল নাচের পোষাক, তার পোষাকের দীর্ঘপ্রান্ত লুটিয়ে যাচ্ছিল মাটিতে, মাদো জানত অমন পোষাকে মূর্চ্ছিত হওয়া সহজ। দর্জি তারার খোঁজ করছিল, কিন্তু পেলে না, তারা তখন নীহারিকায় রূপান্তরিত। শুধু জ্যোতির্বিদের স্মরণ হোলো, একটা ধূমকেতু পুচ্ছ তাড়না করে আকাশের উপর দিয়ে চলে গেছে—। ‘বাজে!’ শিক্ষয়িত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন। মাদো বললে, কর্নেলীর বইতে এমনি কক্ষচ্যুত তারার কথা পড়েছি,—সে আজ এগারো বছর আগের কথা, কিন্তু মাদো তেমনি আছে।

এক গোছা বুনো ফুল ছিল টেবিলে। মাদো জিজ্ঞেস করলে, ‘তোমার দেশে কি ডেইজি দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে?’

‘হাঁ, নিশ্চয়ই।’ সে আমাকে ভালবাসে—ভালবাসে না, সে আমাকে জড়িয়ে ধরবে, সে আমাকে ছুঁড়ে দেবে—‘এই তো পরীক্ষার ধারা।’

আমরা যা বলি তার চেয়ে একটু বুঝি ভালো। ফরাসী মেয়েরা মন নিয়ে দর কষাকষি করে 'একটু, তার চেয়ে আরো বেশী, তাবপর পাগলের মতো।' 'একটু—না, না, তার চেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—সেই তো ভালো। কথা-গুলো রুশ ভাষায় আমাকে শোনাও।'

সার্জি শোনাল : 'কে, চরতু পশলিয়ৎ।'

'মাদো, ফুলগুলোর পাপড়ি ধরে অমন করে টেনো না, তুমি আমার স্থির-চিত্র নষ্ট করে দেবে।'

মাদো গাইল পুরানো রুসিলঁ গাথা। ক্ষীণ তার স্বর, ভারি মৃদুও :

সৈনিক দশ বছর কাটাল যুদ্ধে
তারপর সারা পৃথিবী ঘুরে
এক রাতে এল তার নিজের ঘরে।
তার স্ত্রী ভাবলে তাকে অচেনা কেউ
তবুও তার অনুরাগ দৃষ্টি সে পেল
সে তাকে চুমু খেল, আলিঙ্গনে
বাঁধল তাকে। সৈনিক হাসল—রূঢ় হাসি—
আনন্দ কি পেলে সৈনিক!
সৈনিক আনন্দ
দিলে প্রেমিকা জুটিয়ে তোমাকে।
তোমার স্ত্রী এখন হাসছে তোমার মুখের দিকে চেয়ে
তোমার সঙ্গে ব্যভিচার করে সে তোমার কাছে
ব্যাভিচারিণী!
তাকে হত্যা কবতে পারল না সৈনিক—সে তাকে
ভালবাসে—তাকে ক্ষমা করতে পারল না।
—তার যে মনে পড়বে
ভোরের সৈনিকের কথা…

আর গাইব না—

কিন্তু সৈনিক কি করল?

সে চলে গেল। যাকে সে আলিঙ্গনে বাঁধল সে হয়ত তার স্ত্রী নয়,

হয়তো অচেনা কাউকে জড়িয়ে ধরেছিল, হয়তো এখনও তার পৃথিবীর পথে ঘোরা শেষ হয়নি…

ভাবনা—একমাত্র ভাবনা মাদোর মনে জুড়ে বসলো : শুধু সাবাঁ যদি চলে যেত ঘর থেকে। মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য যদি চলে যেত!—ও কি বোঝে না? সার্জিকে সে কিছু বলতে চায়—কি বলবে সে নিজেই জানে না, শুধু এইটুকু জানে, ওকে কিছু বলতে হবে।

সাবাঁ, লক্ষ্মীটি, তুমি যদি গরম জল করে দাও, আমি কফি তৈরী করে নেব, কেমন?

সাবাঁ এবার বুঝতে পারলে। সে চলে গেল ছোট্ট রান্নাঘরে। মাদো সার্জিকে জিজ্ঞেস করলে :

'কবে যাচ্ছ?'

'জানি না। হয়তো শিগগিরই—'

তার মনে হোলো, সে নিজে তো কথা বলছে না—এ যেন কোনো অপরিচিতের স্বর—

'তাড়াতাড়ি যাচ্ছ, ভালই। তা নাহলে তোমার বন্ধুরা হয়তো মনে করবেন, তুমি পারীর প্রেমে পড়েছ।'

সার্জি কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। মাদো অসহ্য হয়ে উঠেছে!—কিন্তু সুন্দরও সে—সে ওর কি দেখে মুগ্ধ হলো? হয়তো ওর অবাস্তবতা, হয়তো বা বিষণ্ণ চঞ্চলতা—পারীর উপরে গ্রীষ্মের হালকা কুয়াশার মতোই সে যেন তাকে ছেয়ে আছে—তাই কি?

'তুমি কি রাগ করলে?'

'না, না! তোমার দেশের কথা যা বললে, ভাবি কৌতূহল জাগায়। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ—মাদো উঠে দাঁড়াল। সাবাঁ, কোথায় গেলে? রান্নাঘরে কাছে পৌঁছে, সে সার্জির মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল, তারপর মুখভঙ্গী করে বললে কে চরতু পশলিযৎ। হাঁ, ঐ কথাটা সে শিখেছে।

'সাবাঁ, কেৎলী কোথায়? কি করছ?'

'তুমি না চেয়েছিলে—'

'হাঁ, কফি চাই। যাও, তোমার অতিথির কাছে যাও। আমি নিজেই সব করে নিচ্ছি।'

আধ ঘণ্টা গেল। সার্বা ভাবলে, গিয়ে দেখে আসবে, কফির কি হোলো। সে দেখবে অশ্রুমুখী মাদোকে—

'যাও, চলে যাও! না, দাঁড়াও—ওকে বোলো, আমার শরীরটা খারাপ, বুকের ব্যথাটা বেড়েছে। যাও, যাহয় একটা কিছু বানিয়ে বোলো। ওর সামনে আমি যেতে পারব না, পারব না—'

সে রাতে সার্জির ভাল ঘুম হোলো না। মাদোর কথাই সে ভাবল, শুধু ভাবল। কি সে করেছে, যাতে সে দূরে সরে গেল। হয়তো ওকে সে ঠাট্টাই করছে? না, কেউ অমনি করে খেলা করে না—কিন্তু সেই বা তার কথা সারাক্ষণ ভাবছে কেন? মেয়েটি বিনা আমন্ত্রণে এল তার জীবনে। দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের দাবী তার নেই, নেই অন্তরঙ্গতা, উদগ্র আলিঙ্গন। সে অপরিচিতা যাকে বলে ঠিক তাই। কিন্তু তবু সে এল তার জীবনে, তার এত প্রিয় হয়ে উঠল, এমন আপনার হল যে তার সঙ্গে সে আলাপ করেছে, তাকে প্রশ্ন করেছে, তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে!—সে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল, নিজের উপর রাগ হোলো, কিন্তু তবু মাদোর কথা তো ভুলল না। হঠাৎ সে হেসে উঠল; তার মনে পড়ল, কেমন বিকৃত করেই না সে উচ্চারণ করেছিল ঐ রুশ কথাটা—কে চরত্তু।

ভোরে সে পেল ছোট্ট একখানা নীল খাম।

"কাল আবার খারাপ ব্যবহার করেছি, রাগ কোরো না। তার জন্যে দুঃখ তো কম সইছি না। তুমি বলেছিলে, তোমার দেশেও জুলিয়েৎরা আছে, কিন্তু তারা নিজেদের ব্যক্ত করবার ভাষা খুঁজে পায় না। আমিও তেমনি বোবা জুলিয়েৎ, ফরাসী জুলিয়েৎ। আমি তোমার জীবনে তো প্রবেশের অধিকার চাই না, শুধু চাই আমার সঙ্গে দেখা কোরো। হয়তো তখন বলতে পারব, কি আমি বলতে চাই। কে ভলতেয়ারে আজ সন্ধ্যায় তোমার অপেক্ষায় থাকব, ঠিক গুম্ভটার কাছেই আমাকে পাবে। যদি আসতে না পার, বা না চাও রাগ করব না। দূর থেকেই তোমাকে জানাব আমার কথা। ঐ জায়গাটার কথা এই জন্যে বলছি যে ওখানে তখন বড় কেউ থাকে না, বলবার তাই সুযোগ পাব। এই হিজিবিজি লেখার জন্য ক্ষমা চাইছি। তাড়াতাড়ি লিখেছি, আবার লেখার কষ্ট পোয়াতে রাজি নই—মাদো।

বৃষ্টি এল, মিহি পশলায়, সার্জি বাঁধের ধারে সময়ের আগেই এসে

পৌঁছল। মাদো রয়েছে তার প্রতীক্ষায়। বৃষ্টির কথাই তারা বলতে লাগল। অনর্গল কথা, ভোলতেয়ার, আঁধার, ছবি—কিছুই বাদ পড়ল না— দুজনেই তখন আবেগ দমিয়ে রাখতে চাইছে। এবার ওরা চলতে লাগল। ধীরে চলেছে, মাঝে মাঝে থামছে, যেন পথ চেনে না। আবার কখনও জোর-কদমে পা পড়ছে। দর্শক কেউ থাকলে ভাবত ওরা ব্যস্ত হয়ে কোথাও যাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে জানে না। ওরা বাঁধের দক্ষিণ পাড়ে গিয়ে হাজির হোলো। প্লাস দা কঁকোর্দ-এ পৌঁছে গেছে—বল নাচের হলের মতই ঝলমলে; সাঁজে-লিজে দিয়ে ওরা হেঁটে চলল। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে, পথ-চারীদের দেখা যাচ্ছে না; তারপর বোয়াস্ত বুলোঁ, এখানে রোজই বহু-লোক পায়চারী করে, আজ বৃষ্টিতে কেউ নেই। ওরা নির্জন পথে চলল, ভিজে ঘাসের গন্ধ উঠছে, হেমন্তের আমেজে বাতাস ভরা। মনে হোল, তারা পরস্পরকে সবকিছুই বলেছে, কিন্তু তা তো নয়। তাদের মন কথায় টৈটুম্বুর তার একটি কথাও তো বলা হোল না। তবু কথা তারা বলছিল, নীরবতা তাদের এক ভীতি; কিন্তু কথা এক সময়ে ফুরিয়ে গেল। শুধু কানে আসছিল পাতার উপর বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ।

মাদো থামল। সার্জির দিকে সে তাকাল; কি জানি কেন শিউরে উঠে পেছিয়ে গেল—বোধ হয় তার চোখে দেখেছে কি এক সর্বনাশ। এবার নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল, দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার গলা, তারপর চুমু খেল। সার্জি সবকিছু ভুলে গেছে, শুধু মৃদুস্বরে সে আওড়ালে, মাদো,—মাদো—বৃষ্টিধারায় মিশলো চোখের জল, তার দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো।

যা বলতে চেয়েছিলাম, তা তো বলা হোলো না…

কি?

যা এখন বললাম··

প্রেম শুরু হোলো, প্রেমের খেলা, তারপর প্রতি সন্ধ্যায় দেখা। কেউ জানলে না।

মাঝে মাঝে কটূক্তি ওরা পরস্পরকে ছুঁড়ে মারল, ঝগড়া করল, আবার ভাব করল, তাদের ঝগড়াও যেন সেই ঘন আর মহান আনন্দের একটি কণিকা।

## তেরো

সার্কের কাছে ছোটো বলে কোনো ব্যাপার নেই—সে যা করে পূর্ণ উৎসাহেই করে। সে ভাবলে, জার্মানীর পুরনো শহরগুলির পল্লী ইউরোপ ট্রাভেল ব্যুরোর খ্যাতি খানিকটা বাড়াবে এবং ফরাসীদের একথাটা বুঝিয়ে দেবে যে জার্মানী যুদ্ধের কথা ভাবে না। সার্কে ঠিক করলে, পল্লী ফরাসীদের কাছে আরো সমাদর পাবে যদি কোন ফরাসীর লেখা ভূমিকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর জন্যে নিভেলকেই সে বেছে নিলে। ফরাসী জাতীয়তাবাদী নিভেল—যশে তার কলঙ্কের দাগ ধরেনি, তার উপরে সে কবিও পরিমার্জিত রুচির।

সার্কে লা মাস্ক দ্য সার্শী আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করল।

পার্সেফোনকে দেখবে না রাত<br>
সাইরেনের স্বর তো আসবে না নেমে<br>
সোনালী সকালে।<br>
তার<br>
বরফের মত ভঙ্গুর হাত দুখানি তুলে<br>
সূর্যকে আহ্বান তো<br>
সে করবে না…

বই সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এ এক মিশ্র অনুভূতি—ঘৃণা আর ঈর্ষা মেশানো। ফ্রান্সে এসে থেকেই এই অনুভূতির দ্বন্দ্ব চলছে। ট্রাভেল ব্যুরোর অধ্যক্ষ হিসেবে পারীতে তার চার বছর কেটে গেছে, আরও কত ব্যাপার সে এরই মধ্যে করেছে। ফ্রান্সকে সে চিনেছে, জেনেছে, আর তার সেই অভিজ্ঞতার দাবীতে তার দেশের মানুষকে বলেছে, ফ্রান্স ঘৃণারই উপযুক্ত। বড় পিছিয়ে-পড়া দেশ, বড় স্থূল। মানুষগুলোর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, ভবিষ্যতের কল্পনার দ্বার তাদের কাছে রুদ্ধ, শুধু লুটের পর লুট আর লাভের মোহে মত্ত, অথবা ক্ষনিক স্নানন্দে মাতাল, চটুল খবরের কাগজ, ক্ষণস্থায়ী সরকার; উদাসীনতা যেন ধর্মের পর্যায়ে উঠেছে—এমনি দেশ। কিন্তু মনে

মনে সে ফরাসীদের ঈর্ষা করত, তাদের চোখা চোখা উত্তর, পারীর মজুরনীদের সভ্যতার পালিশ, জনতার স্ফূর্তি, আর নিশ্চয়ই ফরাসী রান্নার সে প্রশংসা করত। হাঁ, এরা বাঁচতে জানে! প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিজেকে বোঝাত এই শিল্পরসিক আর ভোজনবিলাসীদের চেয়ে যে কোন জার্মান অনেক উঁচুতে।

সুন্দর! সে নিজেলেব কবিতার ক'টা ছত্র পড়ে আপন মনে বলে উঠল, কিন্তু মানে হয় না—

রুডলফ সার্কে পার্টিতে যারা আনকোরা নতুন তাদের বিশ্বাস করতে চায় না, দশ বছর আগে যখন সংগ্রামের ভাগ্য ঝুলছিল অনিশ্চিতের উপর, তখন থেকেই সে নাৎসী। সে দিনের কথা এখনও তার মনে আছে। সেই থানা থেকে পালানো, জাল পরিচয় পত্র, কমিউনিস্টদের সঙ্গে গুলী-বদল, ধোঁয়া ভরা বিয়ারখানায় এক গেলাস বিয়ার আর বিলিয়ার্ড খেলার ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবী নতুন করে ভাগ কবার আলোচনা—হাঁ, সবই তার মনে আছে।

যৌবনে সার্কের জীবনের ধারা ছিল উচ্ছৃঙ্খল। সে স্বপ্ন দেখত আইনজীবী হবে, কিন্তু তার বদলে সে হল প্রাইমা কোম্পানীর এজেন্ট। পারীর ব্যবসাদার-দের পেড়াপীড়ি করে যোগ-দেয়ার কল কেনানোই তার তখন কাজ। সন্ধ্যেটা কাটত দস্তইয়েভস্কি, নীটশে আর স্পেঙ্গ্লার পড়ে, নিজেকে সে বোঝাত যে নিঃসঙ্গতা হচ্ছে বাছা বাছা মানুষের ভাগ্য। সে তখন কামনা করত তন্বী এমার, কিন্তু সে এক সুইডেনের ধনীকে বিয়ে করে বসলো। সার্কে এবার সাংবাদিকতা নিয়ে পড়লো, থিয়েটারের প্রথম অভিনয় রজনীর সমালোচনা লিখতে লাগল সান্ধ্য কাগজগুলির জন্যে, কিন্তু ছ' মাস পরে সেই লাল চুলওলা কাজ্ এসে তাকে চাকরী থেকে হটিয়ে দিলে। এবার সে হোলো এক জরীপের ডেপুটির সেক্রেটারী। ডেপুটির ছিল হাঁক-ডাকের অভ্যাস। তিনি প্রায়ই হাঁক পাড়তেন, রুডলফ, যাও চুরুট নিয়ে এস গে!—সার্কে বিয়ে করল এক দর্জির মেয়েকে। সে দেখতে একেবারে বদখৎ—এবারও ভাগ্য তাকে ঠাট্টা করলে—শ্বশুর তার দেউলে হয়ে গেল, বড় বড় দোকানগুলোর সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারল না। আর স্ত্রীটিও তার ভাগ্যগুণে লোভী, কৃপণ আর দজ্জাল হয়ে দাঁড়াল। সার্কে তখন

হতাশায় ভেঙে পড়েছে এমন সময় তার স্কুলের সাথী প্রিমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সে তাকে বললে, তোমার মত আজ সারা জার্মানীই এমনি ধসে পড়বার মুখে—জনগণকে আজ তার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে হবে। আর তা পারবে একজন মানুষ। তাকে আজ দেখাব

হলে একশোর বেশী লোক ছিল না। তবু জোরেই বলছিল হিটলার। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে, জনতার মাথার উপর দিয়ে সে তাকিয়েছিল—জনতার কাছে যা লুকানো আছে, হিটলার যেন তাই-ই দেখছিল। তার কথা শুনে শার্কে বুঝতে পারল, সে বোকা আর কুঁড়ে বলে তার জীবন এমন দুর্বহ হয়ে ওঠেনি। তার মনে পড়ল, যখন সে ছেলেমানুষ মানচিত্রে জিতে নেওয়া ফরাসা শহরগুলি চিহ্ন দিয়ে রাখত। তারপর যখন পরাজিত বিধ্বস্ত সেনাবাহিনী ফিরে এল, এক আহত সৈনিক চিৎকার করে উঠেছিল, ছিঃ! শেষে ঘরের মানুষ আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আরও মনে পড়ল সেই বছরের পর বছরের কথা, যখন কারফার্স্টে ডাম-এর দোকানে দোকানে বিদেশী বিলাসী বা নিখুঁত সজ্জায় সেজে কিনত কার, ছবি আর হীরে-জহরত। তখন শার্কের এক গেলাস বিয়ারের দামও জুটত না—সে একজন চমৎকার সাংবাদিক হতে পারত, কিন্তু সেই ধূর্ত ইহুদী তার চাকরিটায় কারসাজি করে ঢুকে পড়লো। আর ঐ জবীপের কর্তা, সে তো চাকরের মতোই ব্যবহার করত। তারপর জার্মানী, জাগো' হিটলার চেঁচিয়ে উঠলেন। সার্কে অনুভব করল, সেও যেন জেগে উঠেছে। দুঃস্বপ্নভরা রাতের পরে জাগরণ। নাৎসী আন্দোলনের সে হোল একজন উৎসাহী সমর্থক।

হিটলার যখন জিতে গেল, সার্কে তখনও আর সবার মত আরামের চাকরীর আশা করেনি, তার সংগ্রাম তখনও চলেছে। যখন বাইরে তাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজে পাঠান হোল, সে খুশীই হোল। লোকটা আর যা-ই হোক একেবারে নির্জীব নয়, তাই ফরাসাদের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নিতে তার দেরী হয়নি। পারীতে তাকে সবাই নাৎসী বলে জানলেও, তারা তাকে উদ্দাম বলে কখনও ঠাওরায়নি, বরং উদাসীনই ভাবত। ফ্রান্সের বন্ধু বলেই সে চলে যেত। এই ভূমিকায়ই নিভেলের সঙ্গে তার পরিচয়।

'আপনাকে বলছি, কেন এই ছোট্ট বইখানার এত দাম দিচ্ছি। আমরা বড় বিপদের ভিতরে সময় কাটাচ্ছি—আপনাদের আর আমাদের রাজনীতির

পাণ্ডারা বেশ বেহুঁশের মত ব্যবহার করছেন, কিন্তু তাঁরা যা-ই করুন, আমরা অন্তত এইটুকু তো দেখিয়ে দিতে পারি যে, শিল্পীরা কোনো সীমান্তের বাছ-বিচার করে না। আমি বুঝি না, পার্টি কংগ্রেস কেন নুরেমবার্গে হয়। সেত এক যাদুঘরের শহর, গোথিক শিল্পের একটি যেন মুক্তা। আমি আপনার রুয়ে'র ওপর লেখা কবিতা পড়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র আপনিই নুরেমবার্গের সত্তা অনুভব করতে পারবেন। এই হবাইমাবের কথাই বা কি? যারা জার্মানীকে কলের মানুষের দেশ বলতে চায়, তাদের এইত হবে জুতসই জবাব। আমরা এক বিষয়ে একমত—সে হচ্ছে গ্যোযটের আদর্শ। আপনি ছাড়া এই ফরাসী জাতটাকে বোর্বদারের জগতে কে আর নিয়ে যাবে—?

'আজকাল লোকে ভয়ে স্ভিল অবধি যায় না। তা জার্মানীতে কে যাবে?'

বন্ধু, সে এক কুয়াশা, সে তো শীগ্‌গিরই মিলিয়ে যাবে। আর বই তো খবরের কাগজ নয়—আমার ধ্রুব বিশ্বাস আপনার দেশের হাজার হাজার মানুষ সামনের বছর জার্মানীর পুরানো শহরগুলি দলে দলে দেখতে যাবে।

'আমি নিজে অবশ্য বিশ্বাস করি না যে আর যুদ্ধ সম্ভব, কিন্তু জার্মানী-ফেরতারা সবাই বলে সেখানে যুদ্ধের মার-মুখো ভাব দেখা দিয়েছে…'

'যে উপর উপর দেখে, তার কাছে তা মনে হতে পারে…এ তো ঠিকই যে, ফরাসীদের তুলনায় আমরা খানিকটা উদ্ধত আর অমার্জিত। আমাদের ওরা চেঁচিয়ে উঠতে ভালবাসে, গট্‌ মট্‌ করে মার্চ করে যায়, সৈনিকের খেলা তারা খেলতে চায়।'

'কিন্তু এ যে ভয়ানক খেলা। আমাদের ঝোঁকটা কিন্তু শান্তির দিকে, আমরা প্যারেড হলেও মার্চ করতে ভালবাসিনে। কিন্তু যদি আপনার দেশের পাগলগুলো ক্ষেপে ওঠে…তাহলে ফরাসীরা লড়াই করবে, তারা লড়তে জানে।'

'আমরা তা জানি, এবং সেদিক দিয়ে আপনাদের প্রশংসাও করি। হাঁ, আমাদের দেশে অমনি ক্ষ্যাপার দল আছে বইকি। এই ক্ষ্যাপাদেরও ফিউরার কাজে বাদ দেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন সৈনিক, লড়াই কি তিনি তা জানেন, তাই তিনি তা হতে দেবেন না। আজকালকার

এই সংশয়ভরা দিনে আপনার 'শার্সির মুখোস' আমি বার বার পড়েছি। কোনো দেশে এমন এক কবির জন্মের জন্য যুগ-যুগান্তের সংস্কৃতির দরকার।... আমরা শুধু স্বপ্নই দেখতে পারি...জার্মানীতে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের কথা ভাবছেন, আপনার ভূমিকা তাদের সাহায্যই করবে। ক্ষ্যাপারা যত খুশি হাতিয়ার দোলাক না, কিন্তু তবু ফরাসী কবি নিভেল লিখবেন গ্যোয়টের জ্ঞানের কথা, ড্যুরারের পুরানো কুটির, হফমানের খেয়াল রূপ পাবে তাঁর লেখার।"

নিভেলকে বিদায় দিয়ে শার্কে হাসলো: সভ্যতার শান-দেওয়া জীব, তার চেয়ে বেশি নয়। ..ওর পালিশ আছে, সে-কথা অস্বীকার্য...কিন্তু তাতে অবাক হবার কিছুই নেই—ইতিহাসের এই অদ্ভুত ছেলেদের জোর ভাগ্য বলতে হবে। আঙুরের বাগান, নিস্, স্বর্ণ ভাণ্ডার, ল্যুভর তা ছাড়া আছে প্রায় আধখানা আফ্রিকা। শীগগিরই অবশ্য সব বদলে যাবে। চমৎকার দেশ, কেউ একে ধ্বংস করার কথা ভাবতে পারে না। ঈশ্বরের দোহাই! আমরা মাথা নোয়াব না, জনগণই আমাদের কাছে মাথা নোয়াবে। হাঁ, তাই-ই হবে।...

নিভেল ঘড়ী দেখল, এখনও অফিসে যাবার যথেষ্ট দেরী.. একটা কাফের ছাদে বসে সে ভাবনায় ডুবে গেল। শার্কে ভদ্র বটে, কিন্তু বোকা। ওরা ছোট ছেলেমেয়েদের মতই সরল, হিটলারের সাফল্যের সেই তো মূল রহস্য। হিটলারের নিজেরও কিছুটা ছেলেমানষি আছে—সে যেন দুষ্টু ছেলে ...ছেলেমেয়েদের হাতে দেশলাইয়ের কাঠি দেওয়ার বিপদ আছে। জার্মানদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বড় কম। শার্কে ঠিকই বলেছে, ওরা খানিকটা অমার্জিত তো বটেই। কিন্তু তবু ওরা বলশেভিক নয়, ওরা আমাদেরই সংস্কৃতির অংশীদার। ভ্লাকভের কথা তার মনে পড়ল, তার মুখ বিকৃত হয়ে এল। সারা ইউরোপে আগুন ধরিয়ে দেবার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। বিদ্রূপের বিন্দুমাত্র আমেজ না মিশিয়েই সে কমিউনিস্ট মেয়েদের 'জুলিয়েৎ' নাম দিয়েছিল। পারী কমিউনের সময় এমনি জুলিয়েৎরাই অতীতের মূল্যবান সম্পদের উপর কেরোসিন ঢেলে দিয়েছিল। সত্যিই কি ওরা জিতবে? যদি তাই-ই হয়, তাহলে সব কিছু শেষ হবে যাবে—গ্যোয়টে, রাসিন সব, আমরাও অতলে তলিয়ে যাব।...

'কেমন আছেন মসিঁয়ে নিভেল !'

'কি বিপদ ! সেই বা মরতে এই টেবিলেই এসে বসলো কেন !'—লেজঁা ঠিক তার পাশেই বসে আছে। নিভেল অনিচ্ছায় প্রতি-সম্ভাষণ জানাল। কথাবার্তাও চললো, কিন্তু আন্তরিকতা নেই, কেবল শেষে লেজা যখন মস্কো আলোচনার কথা তুললো, এবার নেভিল ফেটে পড়ল।

'রুশরা আমাদের যুদ্ধে টেনে নামাতে চায়, আর নিজেরা চায় গা বাঁচিয়ে থাকতে। কিন্তু আমরা ছেলেমানুষ নই।"

"আমার কিন্তু উল্টোই মনে হয়। ইংরেজরাই টেনে নামাচ্ছে যুদ্ধে, আমরাও তাদের সঙ্গে আছি।— আর রুশরা ঠিক ছেলেমানুষও নয়, আমাদের পক্ষ হয়ে লড়বার তাদের কোনো ইচ্ছেই নেই —"

দুজনেই চুপচাপ। লেজঁা এবার একটা নীলরঙের ফুঁদেল ধরে মোচড়ালো ফঁদেলটা মানুষের মতোই ফোঁস করে উঠলো। নেভিল বুঝতে পারল, তার মনের শান্তি আর নেই—ঝরে ঝরে পড়ছে। ভ্লাকভ রুষ, তাকে বোঝা যায়, কিন্তু এ একজন ফরাসী. তবু এও ভ্লাকভের মতোই তর্ক করে। শুধু মস্কোর দিকেই তাকিয়ে থাকে. রুষদেরই বিশ্বাস করে। এ বড় ভয়ানক ব্যাপার! ওরা জাতিকে দু টুকরো করে ফেলেছে। জার্মানদের থেকে ওরা একশো গুণে খারাপ। আর হিটলার কিইবা করতে পারে? বড় জোর ডানজিগ দখল করবে, না হয়ত আর কোথাও একতাল মাটি কেড়ে নেবে···কিন্তু এদের লক্ষ্য স্থির, এরা ফ্রান্সের আত্মা, তার শিল্পের দিকে তাগ্ করে আছে।

বিদায়ের সময় লেজঁা আপোসের স্বরেই বললো, "আচ্ছা দেখা যাবে, আমরা কে ঠিক বলছি। সবাই ভাবছে, কোথায় এর শেষ হবে। আমার স্ত্রী এখনও ব্রিটানীতে যান নি···তিনি তো ভয় পেয়েছেন, আবার যুদ্ধ বাধবে।"

নিজেকে সংযত করে নিভেল শান্তস্বরে বললো :

"আবার যুদ্ধ হবে কি না, সে প্রশ্ন আজ আর নেই। যুদ্ধ তো চলছে, আর তা শুরু হয়েছে উনিশশো চৌত্রিশ সাল থেকে। কতদিন এ যুদ্ধ থাকবে জানি না। সপ্তবর্ষ আর এক শতাব্দীর যুদ্ধ তো ইতিহাসেই আছে—নেই কি? একটা কথা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে—ফরাসীরা জার্মানদের সঙ্গে লড়তে পারে না—কারণ তারা যে নিজেদের মধ্যেই অনবরত লড়ছে।

তোমার স্ত্রী স্বচ্ছন্দে সমুদ্রতীরে যেতে পারেন। ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাছাড়া আবহাওয়ার হালচালও আর বদলাবে না, এই রকমই থাকবে…”

## চৌদ্দ

মেট্রো থেকে জনতা বেরিয়ে এল। তারা ছুটে চলেছে সিনেমা আর থিয়েটারের দিকে; নিষ্কর্মার ভিড়; বিদেশীও আছে। ইংরেজ, চেক, সুইডিশ—তাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে জনতার আলো আর বাড়ীগুলোর দিকে। জনতার ভিড়ে সংবাদপত্র বিক্রেতাবা ঘুরছে; আবার নগরের মানচিত্র আর অশ্লীল ছবিও বিক্রি হচ্ছে। সার্জি টেরই পেল না, কখন মাদো এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। তারা নিঃশব্দে চলতে লাগলো। চারপাশে তাদের আলোর ঝলমলানি, আর ঘূর্ণ্যমান জীবন; বিজ্ঞাপনেব অগ্নিবর্ণ হরফ ফুটে ফুটে উঠছে, বিলাসীর ছড়ি, টুপি আর রক্তগোলাপের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এক প্রশস্ত বুলেভারে এসে তারা পৌঁছল। বেশ নিরিবিলি। তারই এক টেরে একখানা শূন্য বেঞ্চি তাদেরই যেন প্রতীক্ষা করছিল—দিনেব বেলায় বুড়িদের আশ্রয়, তারা এখানে বসে কত কি বোনে, আর আসে প্রেমিক প্রেমিকার দল—তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরস্পরের কাছে বার বার সেই একঘেয়ে পুরানো কথাই শোনায়, কিন্তু তবু তার মধ্যে থাকে হৃদয়েব ভাবাবেগ। হাঁ, এমনি এক সাধারণ বাদাম গাছের নীচে এক সাধারণ বেঞ্চিতেই তারা বসলো।

“সার্জি, তুমি কবে যাবে?”

“ও-কথা বার বার কেন জিজ্ঞেস করছ?”

“কেন জিজ্ঞেস করছি, তা তো তুমি জান, কিন্তু তোমার কাছে ওর তো কোনো দাম নেই—”

“এও তোমার এক খেলা,—তুমি তো সব ব্যাপারেই ঐ একই কথা বল।”

“আর তোমার খেলাও আমি জানি। তুমি সব ব্যাপারেই চুপ করে থাক।”

“যদি তোমাকে বিরক্ত করে থাকি, তাহলে চলে যাই।”

"সাজি!"

"কি?"

"না, কিছু না।"

পথের পাশে একটা খোলা জানালা দিয়ে ঝরে পড়ল রেডিওর শব্দ। কেউ বুঝি হাজার বারের বার গাইছে ভাঙা গলায়:

ওগো মাদাম লা মার্কুইস,
সবই তো ঠিক আছে।

"আমি ঐ মার্কুইসের কথা শুনতে চাই না।"

"তোমার দেশে বোধ হয় ওরা এরই রকমফের গায়।"

ওগো ট্রাক্টর চালিকা,
সবই ঠিক আছে।

"আচ্ছা, বল তো, এতে কি গানটা একটু ভালো হোলো?"

"তুমি ঝগড়া বাঁধাতে চাইছ কেন?"

"আমি?"

"হাঁ, তুমি। তুমি তো মস্কোর কথা শুনতে চাইলে, তারপর আবার চটেও গেলে।"

হয়তো, এ আমার ঈর্ষা। আমি তো বোকা মেয়ে ছাড়া কিছুই নই, কি তাই না?"...কিন্তু তুমি যখন নিজের দেশের কথা বল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার মনে হয়, তোমার দেশের অনেক কিছুই ভাল—তার কারখানা, বাড়ীঘর, পার্কের বেঞ্চি, তার তৈরি জুতো—"

"না, না, ওখানকার জুতো খুব খারাপ।"

"থাম, তুমি আমাকে শেষ করতে দাও...কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের নেই, সে হচ্ছে শিল্প। তার কারণ তোমরা জীবনের ভিতরে সবকিছু পুরে দিতে চাইছ। শিল্পের বদলে তোমাদের আছে সংখ্যা—কত ছবি আর কত বই করেছ তারই হিসেব।"

"তুমি কি বলছ নিজেই জান না।"

"হাঁ, জানি বইকি। এমন কি জীবনের এই যান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ভালবাসাকেও ঠেলে দিতে চাইছ।"

"আমি তো কিছুই চাইছি না···তুমিই তো বার বার জিজ্ঞেস করছ, আর কি আছে বল ?"

"কেন, তোমার আমাকে বিশ্বাস হয় না ?"

"আমার যে নিজের উপরই বিশ্বাস নেই। জান, কেন ফ্রান্স আজ ছিন্নভিন্ন ? তোমরা নিজেরা বড় কুড়ে হয়ে গেছ।"

"ফ্রান্সকে তুমি যত খুশি গাল দাও, আমি কিছুই বলব না। যখন তোমার নিজের সম্বন্ধে কথা কও, হেঁয়ালী রেখে সহজ সরল ভাবেই কথা কও। কিন্তু যখন তোমার নিজের দেশের কথা ওঠে, তখন তুমি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠ। জান কি, কেন সোভিয়েতের মানুষদের আমি দেখতে পারি না ? তার কারণ তাদের এই আত্মতৃপ্তির ভাব।"

"তুমি ভুল করছ। আমরা আত্মতৃপ্ত জীব নই, আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে আছে বিশ্বাস। তোমাদেব তা নেই।"

'বিশ্বাস ? কেনই বা থাকবে সে বিশ্বাস ?'

'থাকবে বেঁচে থাকবার জন্যে।'

হঠাৎ মাদো অন্য সুরে বলল, খুব আস্তে ঝরে পড়লো তার কথা :

'যদি বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন ? সার্জি, তুমি কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?'

সার্জি নীরব। ওরা এবার উঠে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল, বুঝি-বা দেরী হয়ে গেছে সেই ভয় ওদের মনে। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে ওরা আর একটা বেঞ্চির কাছে এল। তেমনি বাদাম গাছের নীচে বেঞ্চি পাতা, তার পাতা ওদের উজ্জ্বল ল্যাম্পপোষ্টগুলি থেকে আড়াল করে রাখলো। মাদো গাছটার উপর কৃতজ্ঞ হোলো, সার্জি তার চোখ দেখুক সে চায না।

'মাদো, আমার জীবনের দুটি ধারা—একটি আমার নিজের, সেটি বাস্তব, আর একটি তুমি।'

'আমি তোমার জীবনের ভিতরে ঠাঁই নিতে চাই না, তোমার বাধা হতে চাই না। কিন্তু তুমি চলে গেলে···,

একটি স্ত্রীলোক ওদের কাছে এসে থামল। সে ভাঙাগলায় হাঁকছে, পারী সোয়ার। সার্জি কাগজ হাতে নিয়ে ল্যাম্পপোস্টের কাছে ছুটে গেল।

'আমাকে মাপ কর, ঘটনা আজকাল যেমন দ্রুত ঘটছে তাতে···'

মাদো হাসলো, নিরানন্দ সে হাসি।

'হা ঈশ্বর, আমাদের দুজনের মধ্যে কত তফাৎ! সত্যিই এ সর্বনাশা ব্যাপার—একটা গাছ আর দমকা হাওয়া যেন আমরা। তুমি দেখছ আমি হাসছি। কিন্তু সত্যিই আমি কাঁদতে চাই। হাসি আমার জন্য নয়। কিন্তু ভারী মজার ব্যাপার না—একটা গাছ আর দমকা হাওয়া···সত্যিই কি পারীতে তোমার জন্ম? কিন্তু তুমি কত দূরে, মনে হয় যেন মঙ্গল গ্রহে তোমার জন্ম।'

'মঙ্গল গ্রহ কেন?'

'জান না। লড়ায়ের গন্ধ ওতে আছে।'

'হাঁ, যুদ্ধ আসছে, আর খুব শীগ্‌গির।'

'আমি ও কথা ভাবতে চাই না।'

'সব ঠিক আছে, মাদাম লা মার্কুইস···তারপর একটা বোমা পড়বে মাদামের উপর, আর তা পড়বে এইখানে, এই বেঞ্চিতে—'

'সেই আশায় তুমি কি খুশী হলে?'

'আমি পারীর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, আর ভাবছি তোমার কথা। তুমি—পারীর মতই আমার কাছে বিদেশী, তবু তুমি তারই মত আমার—আমার, উদ্দাম অথচ অন্তর্মুখী, খুবই চতুর অথচ নির্বোধ। তোমার কি হবে? তুমি—তুমি যে একেবারে অসহায় মাদো···'

'আর তুমি?'

'আমি? আমার দেশের জীবন তো আলাদা। আমরা অনেকখানি সয়েছি, আমাদের অভ্যেস আছে। আমরা সইব, সইতে পারব।'

'কি সইবে?'

'সব কিছু।'

'তোমার বিচ্ছেদ যে আমি সইতে পারব না—'

ওরা ওঠে পড়ল, মোমার্তের উঁচু রাস্তায় ওরা উঠে এল। ছোট ছেলেমেয়ের মত পরস্পরের হাত ধরা। মাঝে মাঝে দোকানের জানালা বা রেস্তরাঁর আলো এসে পড়ছিল ওদের ভাবগম্ভীর, প্রস্তরীভূত মুখের উপর। এবার শহর। শান্ত শহর যেন মফঃস্বলের পরিবেশে এসে ঝিমিয়ে গেছে; কে যেন কাঁদছে আঁধারে; একটি তরুণী মোজা ঠিক করে নিয়ে আবার ছুটে

চলল ; এক ভবঘুরে পথের পাশে বসে আছে, একটা শূন্য বোতল আঁকড়ে ধরে আছে বুকে। তারা দেখা যায় আকাশে। মাদোর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। তার হাত ঠাণ্ডা। এবার পারী দেখা দিল চোখের সুমুখে, কমলা রঙের কুয়াশা-ঢাকা পারী সমুদ্রের মতই ফুলে কেঁপে উঠছে, গর্জন করছে। সার্জি গালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করল ; মাদো আস্তে শুধাল :

'কেন তুমি সুখী হতে চাও না ?'

সার্জি উত্তর দিল না। তার বদলে স্নেহ আর শ্রদ্ধা ভরে হাতখানা চেপে ধরে, হাতের উপর চুমু খেল। একটা বিড়াল কোথায় ডাকছে। মাতালটা আঁধারে গাইছে গান :

প্রিয়া, এখন গান তোমার থাক না···

সার্জি আস্তে, থেমে থেমে বলতে লাগল, যেন সে হিজিবিজি হাতের লেখা একটা চিঠি পড়ছে :

'পুরানো পারীর কথা আজ তোমায় শোনাব, সে পারীতে যেন একদিন আমিও ছিলাম···

আজকের দিনের মতই সে নগরী, তবু যেন কেমন আলাদা। বাড়ী, কাফে সবই এমনি, কিন্তু মানুষ সেখানে হাসত আলাদাভাবে—তাদের ছিল আরো আনন্দ, আরো স্ফূর্তি। কত কবি ছিলেন সেই ফ্রান্সে। তারা গাড়ীর শার্সি ফেলে দিয়ে চুমু খেত···ঝোরে সেখানে বলতেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা··· কিন্তু ভ্রাতৃত্ব এল না, এল ভার্দুন···দেখ, কোথা থেকে কোথায় এলাম। একথা তো আমি বলতে চাইনি—হাঁ, সেই পারীতে একদিন এল একটি রুশ মেয়ে, হাঁ, ছেলেমানুষই বলা যায়। সে আগের বছরটা জেলে কাটিয়ে এসেছিল। তুমি কি সে ছবি কল্পনা করতে পার—জেলখানা, পুলিশ, বরফের স্তাওন—তারপরেই হঠাৎ পারী···। সে ছিল নিতান্ত সাদাসিধে মেয়ে···কি করে জানি না, একজন ফরাসী তরুণের সঙ্গে তার পরিচয় হল। তিনি ছিলেন ছাত্র, কবিতা লিখতেন। আমরা যেমন বেড়াচ্ছি, তেমনি তারাও পারীর পথে পথে বেড়ালে। তবে তখন ছিল কার্নিভাল, রং বেরঙের কাগজের চাকতিতে পা ডুবে গেল তাদের, তারা তারই উপর দিয়ে চলল। ভাঁড় আর সংদের দেখে তারা হাসলো···। মেয়েটিকে পরদিনই পারী থেকে চলে যেতে হবে—রাশিয়ায় তাকে প্রচার-সাহিত্য দিয়ে পাঠানো হবে। তরুণ

তাকে ভালবেসে ফেললেন, অন্তত তাই তার মনে হল—আর দুই-ই তো একই—তিনি চাইলেন তাকে ধরে রাখতে। তিনি বললেন, 'সুখ কেন ত্যাগ করবে?' মেয়েটি উত্তর দিলে, 'সুখ ত নানা রকমের, এক একজন এক এক রকম চায়।' এইবার আমার গল্প ফুরালো।"

'সে চলে গেল?'

'হাঁ, তার পরের দিনই—এক বছর পরে সে ফিরে এল, কিন্তু আর তাদের দেখা হয়নি।'

মাদো কেঁপে উঠলো, সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, নিঃশ্বাস তার বন্ধ—'সার্জি, তুমি পাগল হয়েছ! সত্যি করে বল, তুমি কি কাল চলে যাচ্ছ? আমাকে আর জ্বালিও না! কেন এই গল্প তুমি বানালে?'

'কিছুই বানাই নি। মা আমাকে বলেছেন...'

আর বলবার কিছু পেলে না তারা। মাতালের স্খলিত স্বর ঝরে পড়ছে।

গান আর গেয়ো নাকো, সবই তো জানি
গানের তো আর দরকার নেই...

পারী কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে। ভালবাসাও বুঝি অমনি মিলিয়ে গেছে। এবার মাদো সার্জিকে চুমু খেল, তারপর দুজনেই আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল। কেমন এক ছেলেমানষি আনন্দ তাদের পেয়ে বসেছে। তারা টীলা থেকে পথে নেমে এল ছুটে। তখনো বারগুলির শেষ আলো নিস্তেজ হয়ে জ্বলছে। ওরা কফিখানায় উচ্ছৃঙ্খল মানুষ ট্যাক্সিচালক আর মজুরদের ভিড়ে বসে কফি খেল। এবার রাত ভোর। সার্জি বললে:

'তোমাকে ভারী শুকনো দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটি তোমার জ্বলছে। তারা যেন তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে আছে। তোমার থেকে তারা স্বতন্ত্র, অন্য নাটকের দৃশ্য যেন...'

উত্তরে মাদো হাসল। সার্জি এক গোছা লিলি ফুল কিনে গন্ধ শুঁকতে লাগল। বসন্তের গন্ধ তাতে আছে; আছে ছেলেবেলা আর সুখের স্মৃতি। এবার বিদায়ের পালা—সারারাত ধরে যে দুঃখ পোহাল, তার রেখাও দেখা দিল না। কিছুই যেন হয়নি। শুধু বিছানায় শুয়ে মাদোর চোখে নামল জলের ধারা। তখনো সে শুধু ভাবছে—'সে চলে যাচ্ছে,

আমাকে সঙ্গে নেবে না।…' ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সে ভাবল: 'বোমা পড়বে, পারীর উপরে, ঐ বেঞ্চের উপরে—আমাব উপরে…'

## পনেরো

অধ্যাপক দ্যুমার দাসীটির নাম মারি। গোলাপী তার গাল, আর কথায় যেন তুবড়ি ছোটে। শাকসবজীওয়ালার কাছেই হোক আর বাড়ীর দরোয়ানের আড্ডায়ই হোক, সে বক্‌বক্ করেই চলে।

"যখন এখানে দরখাস্ত করলুম, লোকে বললে: লোকটা একটু আনমনা স্বভাবের, নিজের ভাবনা নিয়েই মস্‌গুল। তুমি যেমন ইচ্ছে রাঁধ-বাড় কথাটি কইবে না। কিন্তু যা ভাবছ তাই কি? ওর অতিথরা না বলুক, কিন্তু মাংস যদি একটু বেশি সেদ্ধ হয়, উনি ঠিক ফিস্‌ফিসিয়ে বলবেন: 'শোন মারি, আমাদের কিন্তু বদনাম হোলো—' উনি গেলাসে মদ ঢেলে আলোয় ধরে এমনভাবে খান, মনে হয় যেন মুখ ধুচ্ছেন। চৌষট্টি বছর বয়েস তো হোলো, কিন্তু একবার দেখোতো কেমন নাচেন! শিকারে গিয়ে সেবার একগাদা পাখী নিয়ে এলেন, কাদায় কাপড-চোপড মাখামাখি হয়ে গেল, সেই কাদা ধুলায় পুরো তিন দিন বসে। আমাদের গাঁয়েও অমনি একজন ছেলো—এক ফুর্তিবাজ বুড়ো-খোকা—সাতষট্টি বছর বয়েসে কিনা এক ছুঁড়ীকে বিয়ে করে বসলো। তাবপর বিয়ের দিনে এমন মদ টানলে যে অতিথরা সবাই মাত্ হয়ে গেল। সে হচ্ছে গেঁয়ো লোক, আর আমার মনিবের কথা যদি বল, উনি যে মস্ত পণ্ডিত, আমি তো বিশ্বাস করতেই পারব না!"

কিন্তু মনে মনে মারি অধ্যাপককে পূজা করে। তিনি আমুদে মানুষ, কখনও রাগ করে কিছু বলেন না। ডিনারের নিমন্ত্রণে অতিথিরা এলে তিনি খাবার ঘরে মারীকে ডেকে বলেন: আমাদের যাদুকরীর স্বাস্থ্যপান করা যাক, শুধু ঐ সস্ তৈরী করবার জন্য এ সম্মান ওর প্রাপ্য—আজ যখন সে মদের ভিতরে মাংস ভেজাচ্ছিল—অধ্যাপক তাকে বললেন, 'ক'জন বিদেশী আসছেন, দেখো যেন তাদের কাছে বে-ইজ্জত হয়ো না।'

মারী সবার কাছে যদিও বলে তার মনিব পণ্ডিত নয়, এক বাক্যবাগীশ মাত্র, কিন্তু তা নয়। অধ্যাপক দ্যুমার খ্যাতি ফ্রান্সের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। জোহান কেলারের আনন্দই হল, যখন দ্যুমা বললেন, 'আপনার বই আমি পড়েছি। ওর কতগুলো কথা তর্ক-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু তবু একটা কাজের মত কাজ করেছেন!...আপনি কি এখানে একাই আছেন? আপনার স্ত্রীও আছেন? চমৎকার, আসুন না তাকে নিয়ে, শুক্রবারে আমার এখানে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ রইল।'

কেলার দ্যুমাকে গৃহের পরিবেশে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী যে এমনিভাবে থাকতে পারেন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। খেতে বসে গৃহকর্তা চার্লি চ্যাপলিনের গল্পে মুখর হয়ে উঠলেন, তারপরেই অতিথিকে তিনি কি করে পেঁয়াজের স্যুপ তৈরী করতে হয় সেই উপদেশ দিলেন—মারীকে ডাকলেন পরামর্শদাত্রী হিসেবে; তারপর শুরু হল মার্শাই থেকে আমদানী হাসির গল্প। নিজেই তা নিয়ে হেসে খুন, চোখের জল বার বার ঝাড়নে মুছলেন। কেলার পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই সব কিছু দেখলেন, দ্যুমা সম্বন্ধে তার এত ভক্তি যে তার গল্পগুলো পরম রসালো বলেই মনে হল।

কেলার সুপুরুষ, সোণালী তার চুল, ঘোর রঙের বড় চশমা পরেন; বেশ ভদ্র, একটু কেমন লাজুকও বটে। দ্যুমা ওর গেলাসে সাবল্ (সাদা মদ) ঢালতে লাগলেন, তাঁর আশা, অতিথি এবার হয়তো গলে যাবেন, মুখ খুলবেন, কথার তোড় গলে গলে পড়বে, কিন্তু নিষ্ফল প্রচেষ্টা—কেলার ঐ এক রকমের মানুষ। ছেলেবেলায় দুষ্টুমি তিনি কখনো করেননি; একটা ভাঙা পেয়ালা কি ছেঁড়া প্যাণ্ট দেখলে তিনি কেমন একটু রেগেই যেতেন, হৈ চৈ করে খেলায় মেতে ওঠার চাইতে তিনি বই-ই পছন্দ করতেন বেশী। পরে, যৌবনে, কলেজের সহপাঠীদের থেকে দূরে সরেই থাকতেন; কত ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল আমোদে মেতে থাকত, তাস পেটাত, গোলাপী গালওলা হোটেলের পরিচারিকাদের পরস্পরের কাছ থেকে কেড়ে নিত; কেউ বা মেতে উঠত রাজনীতিতে, গলাবাজী করে বলত, কমিউনিস্ট আর ইহুদীদের একেবারে লুপ্ত করতে হবে, জার্মানীর করিডোর, আলসাস, আরও কত কি অধিকারের কথা বলত; কিন্তু কেলারের ওসবে মন ছিল না। তিনি স্বপ্ন দেখতেন

বিজ্ঞানীর শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনের। ছোট্ট পরিচ্ছন্ন শহরে, যেখানে লাইম গাছে গাছে ফুলের সমারোহ, তরুণীরা জিরেনিয়ামের টবে ফুল দেখে লাজুক হাসি হাসে, বুড়োরা বাড়ী ফেরার আগে মন্থরভাবে পাইপ টানে—হাঁ, এই স্বপ্নই তিনি দেখতেন। তারপর নাৎসীরা পেল ক্ষমতা; কেলার তখনও উদাসীন। দলগুলির সংঘর্ষ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে একজন নৃতত্ত্ববিদের কি হবে? ব্রুনিং আর হিটলার…তাঁর কাছে দুই-ই সমান।…তার তো আছে বিস্তীর্ণ পরিবেশ—বই দিয়ে সে পরিবেশ ঘেরা।

গার্ডা চার বছর ধরে কেলারের সঙ্গে বাগদত্তা ছিল, মেঠাইয়ের দোকানে তারা দেখা করত, পার্কে বেড়াত—কখনও বা দু-একটা চুমুও খেত। বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো কেলারের ছিল না। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তবে তো বিয়ে। তার উপর পরস্পরের অনুভূতির স্থায়ীত্বও পরীক্ষা করা দরকার। তাঁর মনে হোত, গার্ডার বিষয়ে যা জানবার সবই তিনি জানেন, কিন্তু সেখানেই ভুল করেছিলেন। বিয়ের আগে গার্ডা কল্পনা বিলাসী হিসেবে বন্ধুমহলে নাম কিনেছিল। তন্বী, লাজুক মেয়ে, আনন্দে আর আতিশয্যে তার দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছড়াছড়িও তখন দেখা যেত। কিন্তু ফ্রাউ কেলার হয়ে সে হোলো দুটি সন্তানের মা, সঙ্গে সঙ্গে সে মোটা হয়ে পড়ল—স্বভাবও বদলাল—কর্তৃত্বের দিকে তখন তাঁর খুব ঝোঁক। সে বিশ্বাস করে তার স্বামী জীবন-সংগ্রামের পক্ষে নিতান্ত বেমানান, সবাই তাকে ঠকাচ্ছে। সে সন্তানদের স্বার্থের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। কেলারের শান্তি আর রইল না, গার্ডাই তাকে শান্তিতে থাকতে দিলে না। গলায় পশমের স্কার্ফ না জড়িয়ে তিনি বাড়ীর বাইরে যেতে পান না; পিসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবরা-খবর করতে তাকে পাদ্রীর কাছে যেতে হয়, তাছাড়া তাকেই শীতকালীন সাহায্য ভাণ্ডারে প্রথম চাঁদা দিতে হয়।

কেলার যখন 'দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের কয়েকটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য' লিখতে শুরু করেন, ব্রাউন তাকে বলেছিল, আজকের দিনে বিষয়টা কিন্তু ভারী গোলমেলে'…গার্ডা ভয় পেয়েছিল, সে তার স্বামীকে ধরে বসল, বিষয় বদলাতে হবে; কিন্তু কেলার একগুঁয়ে—কাজটা যেন তাকে পেয়ে বসল।

অধ্যাপক হ্যামা কেলারের বইখানা বেশ কৌতূহল নিয়েই পড়েছিলেন,

তার বইয়ের মার্জিনে প্রশ্নবোধক আর বিস্ময়-বোধক চিহ্নের অলঙ্কারে ভরে ফেলেছিলেন।

গার্ডার নীলচোখ, স্তন তার উন্নত, পূর্ণ। সে তার স্বামী আর অধ্যাপক দ্যামাকে তুলনা করতে লাগল। ইচ্ছে করে এ তুলনা নয়, নিজের অজান্তেই চলল তুলনা। কি কচি দেখাচ্ছে ঐ ফরাসীটাকে! কেন. ও তো জোহানের থেকে কমসে কম তিরিশ বছরের বড। জোহান বড় বেশী খাটে, বিশ্রাম কাকে বলে জানে না···দেখ দেখ!···পারীতে এসে সারাদিন ধরে আদি-বাসীদের কথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ কি! এরকম সুযোগ ফি-বছরেই আসে না। কতবার সে জোহানকে বলেছে, ফলি বার্জারে নিয়ে চল, সে শুধু আজ না কাল বলে থামিয়ে রেখেছে। আর তো হপ্তা খানেকের মধ্যেই ওরা রওনা হবে। বলতে লজ্জাই হয়, এমন কি এইফেল টাওয়ারের চূড়ায়ও সে তাকে চড়ায় নি। ফরাসীটা কিন্তু ভারি ভাল—অতিথির আদর করতে জানে—কিন্তু বড় ছ্যাবলা! জোহান যা মনে করে, হয়ত তত বড় বিজ্ঞানীও নয়। ডিনার কিন্তু ভালই, কিন্তু আসবাবপত্র ভারী বাজে, যত সব সস্তা বাসন-কোসন···একজন সাধারণ স্কুল মাস্টারও জার্মানীতে এর থেকে ভাল থাকে। আর কি অদ্ভুত, একজন বিজ্ঞানী কিনা ঐ সব বাজে গল্প করছে। তা হবেই বা না কেন, ফরাসী জাতটাই গম্ভীর হতে জানে না। কিন্তু তবু নেপোলিয়ান ছিলেন ফরাসী—হয়তো বা এই অধ্যাপকটার মত গোটা জাতটাই অধঃপাতে গেছে—এই বয়সে এমন হো হো করে হাসে, আবার ওর নাকি অত নাম!···

'পারীকে আপনার ভালো লাগে মাদাম কেলার?'

তার পূর্ণ স্তন দুলে উঠল।

'ম্যসিয়ে দ্যামা. পারীকে কেউ কি ভাল না বেসে পারে! আমার তো মনে হয় এমন আনন্দভরা শহর দুনিয়ায় আর দুটি নেই।'

দ্যামা ওর কথার তাৎপর্য আঁচ করে বললেন:

'আনন্দময় শহর, একথা ঠিকই—কিন্তু শুধুই তো আনন্দ এখানে নেই—ম্যসিয়ে কেলার জানেন, আমরা কাজ করতেও জানি। আমি বুঝতে পারি না মাদাম. আপনাদের দেশের কতগুলো অপদার্থ আমাদের সম্বন্ধে এমন

ঘৃণাভরে কথা বলে : তারা মোমার্ত এলাকায় চোখ বুলিয়েই মন স্থির করে ফেলে। আমরা তাদের কাছে 'অধঃপতিত জাতি' বনে যাই...'

দ্যুমা খিল খিল করে হেসে উঠলেন। কি বিশ্রীই না হাসে লোকটা! শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করে যেন! ফ্রাউ কেলার মনে মনে ভাবল। কিন্তু তার স্বামী লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন, একটু কেসে বললেন :

'আমাদের দেশের ওসব লেখাগুলোর কথা আপনি ছেড়ে দিন, ওগুলো ধরবেন না। ওসব রাজনীতি...'

'জানি, জানি, তাই রাজনীতিকে কখনও আমার আঙিনাও মাড়াতে দিই না। এখানেও দেখুন না, আপনি একটা খবরের কাগজ হাতে তুলে নিন, আপনার ঘৃণায় থুথু ফেলতে ইচ্ছে হবে—কি নোংরামি'! তবে আমরা থুথু ফেলতে পারি, কিন্তু জার্মানীতে—মনে হয় সেখানে থুথু ফেলার পাত্রগুলি পর্যন্ত রেজিষ্ট্রারী করা। কোথায় কখন থুথু ফেলবেন, তারও আইন জারি হয়েছে।'

'ম্যসিয়ে দ্যুম আমি আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, আমাদের দেশে এখনও বহু লোক আছেন, যারা এই নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়েছেন। আমার কথাই ধরুন না, যখন কেউ রাজনীতির খাতিরে ফরাসী সংস্কৃতিকে হীন করতে চায়, আমি কি মনে করি? আমি আপনার কাছে যে কত কৃতজ্ঞ তা...'

'ওরা যা লেখে সব বাজে একথা কি প্রকাশ্যে আপনারা বলতে পারেন?'

'পারি বই কি! আমি বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বলে থাকি।'

'বন্ধুবান্ধবের মধ্যে' বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? মাদাম কেলারের কথা বলছেন কি? শুনুন, সে তো অত্যন্ত অপমানজনক—'

'ম'সিয়ে দ্যুমা, আপনাকে বুঝতে হবে, জার্মানীর অবস্থা এখন বদলে গেছে—আমাদের জাতটা ভিতরের শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত, তাদের চাই নৈতিক একটা আচ্ছাদন বা আড়াল। এ আড়াল আমার কাছে অসহ্য ঠেকে, কিন্তু আমার বাড়ীওলা এরই প্রশংসায় মুখর, আমার রুটিওলাও তাই, পাড়া-প্রতিবেশীরাও সবাই একই দলে। তাদের কাছে এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সব ব্যবস্থাগুলির উপরে। আমি নিজে ওদলে নেই, আর ওদের মতবাদও সমর্থন করিনে। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে—ওরা বেকারি ঘুচিয়েছে—

আমাদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কথা যদি ধরেন, দলের মূলগত নীতির সঙ্গে তার ছোঁয়াচ থাকলেও আমরা আগের মতই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি।'

ছায়া ছুটে পড়ার ঘর থেকে কেলারের বইখানা নিয়ে এলেন। 'একটু থামুন, একটু—!·· আপনি বলছেন, আপনারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন, তাই না? দেখা যাক···পাতাটা আমি এখুনি বার করছি।···এই যে!—আদিবাসীদের রক্তের সম্বন্ধ থেকে যে গোষ্ঠিগুলি তৈরী হয়েছে, সান্তিয়াগোতে প্রকাশিত তথ্যগুলিই আপনি দিয়েছেন। এটা কৌতূহল জাগায় এবং বেশ কিছু এর থেকে শেখাও যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে 'ও' প্রতীক চিহ্ন-নির্দ্ধারিত গোষ্ঠি নিয়ে আপনাদের হস্তীমূর্খরা বড় বেশি গলাবাজি করে, আদিবাসীসের মধ্যে তাদের সংখ্যা শতকরা একানব্বই জন। কিন্তু বন্ধু, আপনি সেইখানে এসেই থেমে গেছেন, শেষ অবধি যান নি। আমি সিদ্ধান্তের কথা বলছি না, আমি সংখ্যার তথ্যের কথাই বলছি। পরের পাতায় সেগুলি আছে বটে, যেখানে আপনি মোটামুটি তথ্যগুলি বলেছেন। আপনি রাম্ম (Ramm) আর সোকার (Sokarrs)দের সংখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু কোনো কারণে লিপস্যুজ (Lippschutz)দের বাদ দিয়ে গেছেন। আপনি যদি মোটামুটি সার কথাটুকু জানাতে চান, আপনি কি করে এগুলো বাদ দিলেন? দেখুন আমি এগুলো যোগ করে দিয়েছি 'ও'-গোষ্ঠির গড়ে শতকরা পঞ্চাশ জন খাঁটি নর্ডিক আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীর মধ্যে যে রকম রয়েছে, তেমনি সমান সংখ্যায় রয়েছে ইয়েমেনের য়িহুদীদের মধ্যে।"

'আমিও সে সংখ্যার খবর রাখি, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, সে কথা আমি লিখতে পারি না।'

"পারেন না বলতে কি বোঝাতে চান? গ্যালিলিওর দৃষ্টান্ত কি—জেলে যাওয়া কি তাঁর কাছে সুখের বলে মনে হয়েছিল? না, না বিজ্ঞানের সেবা যখন শুরু করেছেন, আপনাকে শেষ পর্যন্ত তা করে যেতে হবে! এ তো আর তাস খেলা নয় যে, আমি পাশ বললেই চুকে গেল···"

কেলারকে মুখ নীচু করে থাকতে দেখে তিনি থামলেন। "আমাকে ভূতে পেয়েছে! ওকে পেট ভরে নিমন্ত্রণ খাইয়ে এখন ওর হজমে বাধা দিচ্ছি···।"

"আচ্ছা—ওকথা এখন থাক্—মাদাম কেলার নিশ্চয়ই এই আলোচনায় হাঁফিয়ে উঠেছেন। সব কিছু বাদ দিলেও আপনার বইখানা চমৎকার। এবার কফির সঙ্গে আমি আপনাদের এই জিনিসটা একটু চাখতে বলি…"

হ্যামা আলাপে-হাসি-গল্পে অতুলনীয়। যেমন তিনি আমুদে, তেমন আতিথ্যেও সহৃদয়, ফ্রাউ কেলারকে তিনি মুগ্ধ করে ফেললেন। ফ্রাউ কেলার এবার অধ্যাপককে তার ছেলেমেয়েদের ছবি দেখালেন। হ্যামা পাঁচ বছরের রুডির ছবি দেখে মন্তব্য করলেন :

'এ ছেলে নিশ্চয়ই জাহাজী কাপ্তেন হবে। দেখবেন, এ ঠিক সাগরের নেকড়ে হয়ে উঠবে!'

ফ্রাউ কেলার গলে গেলেন। আবহাওয়া বদলে গেল। বেশ চমৎকার ভাবেই সময় কাটতো যদি না আনা রথ এসে হাজির হোত। অতিথিদের দেখে সে একটু অপ্রস্তুত হোলো।

'ম্যসিয়ে হ্যামা, আমি শুধু এক মিনিটের জন্য এলাম। আপনি আমাকে একটা বই দেবেন বলেছিলেন—'

হ্যামা ধরে বসলেন, এক পেয়ালা কফি খেয়ে যেতে হবে। আনা নিঃশব্দে কফি খেল। কেলাররাও নীরব। নীরবতা ভাঙবার জন্যেই হ্যামা বললেন :

"আনা, ইনি একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। এঁকে তুমি নাৎসী বলে মনে কোরো না। উনি নিজেই বলেছেন, জার্মানীতে আজকাল মূর্খের অভাব নেই। একবার ভেবে দেখ, ওঁর বিশিষ্ট ক্ষেত্রেও উনি শিকলে বাঁধা! না, না, তুমি ভয় পেও না…" কেলারের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, "একথা এই জন্যেই বললাম, আপনাদের ঢাক-বাজিয়েদের সঙ্গে মাদাম রথের একটা ঝগড়া পেকে আছে। উনি কমিউনিস্ট, স্পেনে ছিলেন। ওঁর সামনে আপনারা সবকিছু খোলাখুলিই বলতে পারেন…"

আবার নীরবতা। এবার কেলার যেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই বললেন :

'লোকে বলে, স্পেনে নাকি গরম অসহ্য।'

'হাঁ, গরমকালে খুবই গরম পড়ে বটে।'

ফ্রাউ কেলার উঠে দাঁড়ালেন :

'আমাদের ক্ষমা করবেন—এখন সাড়ে চারটে—আমাদের চারটেয় বাড়ি ফেরবার কথা ছিল।'

নিঃশব্দে ওরা হোটেলে ফিরে এল; নিজেদের ঘরে এসে ওরা গভীর আলোচনা শুরু করল।

"তুমি স্কুলের ছেলের মতোই বোকা! আমি বলিনি, নিমন্ত্রণ নেওয়ার আগে তোমার ডাঃ কোয়েনিগের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল। ঐ বুড়োটার যেন ভিমরতি ধরেছে..."

"কি বলছ গার্ডা, উনি একজন মস্ত বিজ্ঞানী।"

"আর একটা মস্ত হাঁদা! এখন তো উনি বলে বেড়াবেন যে, তুমি জার্মানীর নতুন শাসন-ব্যবস্থা পছন্দ কর না। তুমি কি এটাও জান না যে, ফরাসীরা সবাই কথার তুবড়ি। ঐ লোকটা ঐ জার্মান কমিউনিস্ট মেয়েটাকে ইচ্ছে করেই নিমন্ত্রণ করেছিল। ও আমাদের বিপদে ফেলতে চায়। তোমার তো আর শত্রু কম নেই। তারা তোমার বই দিয়ে তোমাকে ঘায়েল করবার সুযোগ খুঁজছে...।"

"তুমি বড় বাড়িয়ে বলছ। অধ্যাপক বরহার্ড তো বইয়ের খুব প্রশংসাই করেছেন।"

"বরহার্ড বললেই তো আর হোলো না। আর তুমি তো বেশ ভাল করেই জানো ক্লিস্টস্ খুব কড়া সমালোচনাই লিখেছেন। তাঁর সেই প্রবন্ধ এখনো ছাপা হয়নি বলে এমন তো নয়, তা' আর ছাপা হবে না। তারা তাগ্ করে আছে, পারীতে তুমি কি কর তাই আগে দেখতে চায়...

যার ছেলেপুলে আছে, তাকে একটু সাবধানে চলতে হয়। তোমাকে সব হারাতে হবে দেখছি।"

"তা আমি কি করে জানব যে হ্যামা রাজনীতির কথা তুলবেন?"

"তুমি একেবারে রুডির মত ছেলেমানুষ। ওরা সবাই আমাদের ঘৃণা করে, আমার ভেবে অবাক লাগে যে তুমি তা বোঝ না! এখানে প্রতি পদে ফাঁদ পাতা। জার্মান কমিউনিস্টের সঙ্গে দ্যাখা—বাবাঃ!—তুমি কি করে জানলে সে কাউন্সিলরের খুনের ব্যাপারে নেই?"

"কিন্তু গার্ডা, ওর সঙ্গে যে দেখা হবে একথা কে ভেবেছিল?"

ফ্রাউ কেলার এবার এক অন্ধকার কোণে বসে কাঁদতে শুরু করলেন।

নিজে আনন্দ পাওয়া আর তাকে দেওয়ার বদলে, জোহান যত সব সাংঘাতিক মানুষের সঙ্গে পরিচয় করছে। শুধু এমনি সব কথার জন্যই তার জেল হতে পারে। তা ছাড়া আছে ঐ কমিউনিস্ট মেয়েটা…। ডাঃ কোনিগ জোহানকে বার বার সাবধান করে দিয়েছেন, এখানে সব সময়ে সজাগ থাকতে হবে…। যদি জোহান পথে বসে ছেলেপুলের কি হবে? তার মনে পড়ল, হ্যমা বলেছেন রুডি হবে জাহাজের কাপ্তেন। তার বাতৃত্ব গর্ব একথা মনে করে আর স্ফীত হয়ে ওঠে না, বরং রাগই হয়—বুড়ো যেন সং! সে তার পোষা জোহানকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ফাঁদে ফেলেছে!

"শোনো জোহান, তুমি গিয়ে ডাঃ কোনিগকে বল, হ্যমার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে আনা-রথ-এর দেখা হয়েছে।"

"কিন্তু আমার মনে হয় ওর নাম আনাও নয়, রথও ওর পদবী নয়।"

তাতে কিছু যাবে আসবে না, ওঁর কাছে চেহারার বর্ণনা দিও। সে হ্যমার বাড়ীতে আসে, ওরা ঠিক তার পাত্তা পাবে…যদি তোমার একফোঁটা কাণ্ড-জ্ঞান থাকে তো এই মুহূর্তে তুমি দূতাবাসে চলে যাও। ডাঃ কোনিগ ছ'টা পর্যন্ত সেখানে থাকেন…"

—কেলার বহুক্ষণ বসে রইলেন দূতাবাসের বসবার ঘরে। মস্ত প্রতীক্ষা-গৃহ, শূণ্য, নির্জন। স্ত্রীর উপর রাগ হোলো। হ্যমা আর ডাঃ কোনিগ, এমন কি সমস্ত দুনিয়ার উপর রাগ ধরল। কি অপমানকর ব্যাপার! অস্বাভাবিকও বটে! তিনি—একজন বিজ্ঞানী—যাঁর বই হ্যমা আর বরহার্ড দুজনেই প্রশংসা করেছেন, তিনি কিনা একটা সামান্য 'গুণ্ডার' মতোই সদরে হাজরে দিতে এসেছেন। ব্যাপারটা ভারি বিরক্তিকরও বটে! কিন্তু উপায় তো নেই…। নাৎসীদের এড়িয়ে চলবার উপায় নেই, যোগাযোগ রাখতেই হবে। ক্লিটস্ সুযোগ খুঁজছে। সে বলে আমি লামার্কপন্থী। যদি এখন সাবধান না হই, তাহলে ওরা হয়ত আমাকে মার্কস্‌বাদীই বলে বসবে।…অনেক রাত তো গেস্টাপোদের জন্য জেগে কাটিয়েছি…।

পার্ডা ঠিকই বলেছে…কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই বিরক্তিকর।…হ্যমা যা খুশি তাই বলতে পারেন, তবু গ্যালিলিওর কথাটা তো এল! জার্মানীতে থাকলে আজ ওকথা বলবার সাহস তাঁর হত না!…ফরাসীরা কি করে রাষ্ট্র চালায়? জার্মানরা তো ওদের থেকে কোনো অংশে হীন নয়, বোকাও নয়।

ফরাসীরাই তো জার্মানীতে স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়ে হতাশা এনে দিয়েছিল …ওরাই হিটলারের ক্ষমতা পাওয়ার জন্য দায়ী…অথচ ওরা বেশ সুখে খাচ্ছে দাচ্ছে, মজা লুটছে, আর আমাদের ঠাট্টা করছে।…ত্যুমাকে সে কি বলেছে? সাংঘাতিক কিছু নয়! বরং সে জোর দিয়েই বলেছে, এই নতুন শাসন-ব্যবস্থা টিঁকে যাবে…অবশ্য এর ভুল অর্থও করা যেতে পারে…যেমন ক্লিটস তাঁর বইয়ের করেছে। তাছাড়া ঐ কমিউনিস্ট মেয়েটা ছিল—চুলোয় যাক মেয়েটা! না, তাঁকে সব কথা বলতেই হবে, না হলে ওরা হয়ত কত অভিযোগ এনে তাঁর ঘাড়ে চাপাবে…কিন্তু তবু বড় অপমানজনক ব্যাপারটা!…

ডাঃ কোনিগকে সব খুলে বলে, কেলার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন: ভগবানকে ধন্যবাদ, সব চুকে গেল! ডাঃ কোনিগ আন্তরিকতার সঙ্গে কর-মর্দন করলেন।

'ধন্যবাদ! আপনি খাঁটি জার্মানের মতই কাজ করেছেন। এসব খুবই জরুরী ব্যাপার…'

কেলার দূতাবাস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মন তাঁর শান্ত হয়ে এসেছে। যে যা-ই বলুক, তিনি তাঁর দেশের সেবা করলেন। জার্মানী—হচ্ছে জার্মানী—এতে অপমানের তো কিছু নেই। যেটুকু লাগছে সে তার নিজের সংস্কার।…আর এ তো পারিবারিক ব্যাপার নয়, হয়তো মেয়েটা সত্যিই সন্ত্রাসবাদী দলের কেউ। তিনি তাঁর কর্তব্যই করেছেন…।

কেলার এত খুশি হয়ে উঠলেন যে গার্ডার এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হল: ওরা গেল ফলি-বার্জারে। অর্দ্ধ-নগ্ন মেয়েদের দেখে ফ্রাউ কেলার এক একবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, আবার বিদ্রূপে মুখর হয়েও উঠলেন। ওদের নাচের ছন্দে লালিত্য আছে, কিন্তু ওদের সঙ্গে প্রেমে পড়া যায় না, মৃদু চাপড় দিয়ে তৃপ্তি পাবে এমন গুরু-নিতম্বিনী ওরা নয়—শুধু রেখা…আর রেখা যেন দেহ—কোথায় সেই সুগোল স্তন আর নিবিড় নিতম্ব? এই সব মেয়েরা বেশিদিন বাঁচে না। কিন্তু তবু দেখতে ভাল লাগে, ওদের অপূর্ব লাবণ্য দোলা দিয়ে যায়।…জার্মানীতে যেন সবই বড় বেশী স্থূল।… হাইডেলবুর্গে গিয়ে গার্ডার গল্পের খোরাক বেশ ভালই জুটল। আর বেচারী জোহানও একটু আমোদ পেল। ও এত খাটে, তার উপরে আবার এই ব্যাপারটা ঘটল…

কিন্তু কেলার মঞ্চের সুন্দরীদের দেখে তৃপ্তি পেলেন না। কুয়াশার ভিতর দিয়ে যেমন সব কিছু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়, এও যেন তেমনি। হ্যমা, মদ, গার্ডার চোখের জল, ডাঃ কোনিগ সবই যেন বার বার ভিড় করে এল আর চলে গেল। তিনি কাজটা ভাল কি মন্দ করেছেন, একবারও ভাবলেন না, শুধু ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেন। গান-বাজনা, মেয়েমানুষ আর মদ কিছুই তিনি চাইলেন না।

সেই সন্ধ্যায় হ্যমার মনে পড়ল কেলারের মুখখানা, লজ্জায় নীচু মুখ। 'কেন ওকথা বললাম? ও ভাবে না বললেও চলত, ওকে তো যথেষ্টই সইতে হচ্ছে। এ এক সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা—হাঁ, একথা বলতেই হবে! ও-গোষ্ঠি সম্পর্কেও তথ্যগুলোও দিতে পারবে না। না, এদেশে এমন অবিচার কেউ সহ্য করবে না…। কেলারের জন্য আমার দুঃখ হয়—লোকটার ক্ষমতা আছে, তাছাড়া সৎ—ওকে দেখেই তা মনে হয়।'

মারী গজরাতে শুরু করল :

"আগে জানলে কে এত ঝক্কি পোয়াত বাপু?…দেখলেন তো ম্যসিয়ে হ্যমা, কেমন করে লোকটা খায়? কি মাথামুণ্ডু গিলছে, তার স্বোয়াদই (স্বাদ) বুঝতে পারলে না। আর ওর পরিবারটা তো একটা গরু, আর যা দজ্জাল! ওরা আবার আসুক না, আমি তখন শুধু আলু সেদ্ধ করে দেব, তাই-ই গিলুক না।"

হ্যমা হাসলেন।

'তুমি ভুল করছ মারী। ওঁদের উপর অবিচার করছ, ওঁরা বেশ লোক। কিন্তু ভোজের টেবিলে ওরা অচল। ভারি বিরক্তি ধরিয়ে দেয়…।'

## ষোলো

কাল সন্ধ্যায়ও মাদো ছিল সুখী; সে আর সার্জি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল প্যারীর শহরতলিতে। কত গলিঘুঁজিতেই না তারা গিয়েছিল; গলি তো নয় যেন কাটল; এত সরু! আবার ছুটে আসছিল বড় রাস্তায় স্কোয়ারের

আলোয়। মেলায়ও তারা গিয়েছিল, একটা পুরানো অর্গানের বাজনা শুনেছিল, মাদো নিজের ভাগ্য গণিয়েছিল অর্গানওয়ালার পাখীটাকে দিয়ে। যে টিকিটটা পাখীটা তুললে, তাতে লেখা ছিল—শান্ত হও, তোমার প্রেমিক তোমাকে ছেড়ে যাবে না। মাদো কথাটা শুনে হাসল, 'প্রেমিক', 'প্রেমাস্পদ'! কিন্তু তবু যেন শান্তি এল মনে। হয়তো এই জন্তেই, বা সারা সন্ধ্যাটা সুন্দর বলেই। কোন কথা কাটাকাটি আজ আর ওদের হয়নি, এ ওকে ছুঁড়ে মারেনি কোন বিদ্রূপ; প্রেমিক-প্রেমিকার কলহও তাদের হয়নি। মাদো জিজ্ঞেসও করল না, সে শীগ্‌গির চলে যাচ্ছে কিনা। অথচ আগে তো দেখা হলেই জিজ্ঞেস করত।

আর এখন সে চলে যাচ্ছে, শেষবারের মত দেখা হবার দিন এল ঘনিয়ে…।

সার্জি জানত সে শীগ্‌গিরই চলে যাবে, কিন্তু তবু শেষ বিদায়ের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। মাদোর সম্বন্ধে তার কি অনুভূতি, তা নিয়ে সে বহু ভেবেছে, কি জন্ম এই তরুণীর প্রতি তার আসক্তি তাও বুঝতে চেষ্টা করেছে। মাদোর জটিল আর ক্ষণে ক্ষণে বিপরীতমুখী ভাব সে খতিয়ে দেখতে চেয়েছে, কিন্তু হেঁয়ালীর সমাধান খুঁজে পায়নি। শুধু সে বুঝেছে, যে জীবন আগে ছিল কানায় কানায় ভরা, আজ মাদো-বিহনে তা আঁধার, রিক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তবু তো মাদো তার জীবনের বৃত্তের বাইরে, সে তার নিজের কাজের কথা কখনও তাকে বলেনি, বলেনি তার আশা আর আশঙ্কার কথা; কমরেডদের কথাও সে কখনো তোলে নি, তোলে নি তার বন্ধু আর অপরিণত জীবনের কথা। হয়ত বা এ সবই তার কল্পনা—তাই কি? কিন্তু নিজের প্রশ্নের উত্তর সে যুগিয়েছে: না, সে এক জীবন্ত নারীকে ভালবাসে, তার সঙ্গে সে যেন বহুদিন কাটিয়েছে এমনিভাবেই সে তাকে জানে, যদিও সে তার ভাবনা আর বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত নয়।

তবুও সে তো কখনো ভাবেনি মাদোকে তার জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবে, এমন সম্ভাবনাও সে মনে আনে নি। তাদের বিদায় নেওয়ার দিন এল, এ সম্বন্ধেও সে সচেতন, তবু নিজেকে সে এক সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে:

তাদের আর দেখা হবে না এ তো অসম্ভব ব্যাপার।…

শুধু আজ সে নিজেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল: কি করছে সে? কতবার মাদো বলেছে: 'তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে চল।' সে কেন তার কথা শোনে নি, শুনতে চায়নি?

না, না, এমনটি আর হবে না। মাদোই ঠিক বলেছে—সে কেন তার সুখ বলি দেবে? কিন্তু সেই বিদেশে মাদো কি করে থাকবে? বন্ধু সেখানে পাবে না, পাবে না জীবনধারণের ছোটখাটো এমন কতগুলো জিনিস, যেগুলোর অভাব হলেই মানুষ টের পায়, তার আগে নয়। তখন সেগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয়ই হয়ে উঠে। সে তো জানে এগুলির কতখানি দাম। পারীতে বসে তাই সে কামনা করে মস্কোর গলি-ঘুঁজির পুশকিন স্মৃতি স্তম্ভের চারপাশের ল্যাম্পপোস্টগুলির; সে কামনা করে সেখানকার গান, একটা শব্দ, একটা তুচ্ছ জিনিসের। মাদো কি করে পারবে সেখানে থাকতে? তার ভিতর দিয়ে সে-জীবনের স্পর্শ পেয়ে কি বাঁচবে? শীগ্‌গিরই হয়তো তাকে পাঠানো হবে দূরে, তখন যে সেই সুতো ছিঁড়ে যাবে···পারীর মেলায় অর্গানের বাজনা শুনে যে জীবনের কথা মনে হয়, সে জীবন তো তার নয়; তাকে সে বুঝি চেনে না। বয়সে বড়, অভিজ্ঞতাও তার বেশী, দুজনের ভাবনা তাকে একাই ভাবতে হবে। এই আলোর মালা, ওর ছবি, পারীর উচ্ছল আনন্দ আর বিষাদ থেকে কি করে সে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? সার্বা না বলেছিল—বাদাম গাছ উপড়ে নিয়ে গিয়ে পোঁতা চলে না—সে শুকিয়ে যায়···কিন্তু নিজের কাছেও আসল কথা সে প্রকাশ করতে পারল না। দশ বছর বা তারও কিছু আগে সে অনেক বই পড়ে ফেলেছিল, টলস্টয়, ডিকেন্স আর স্তাঁধাল তাকে রীতিমত আকৃষ্টই করেছিল; উপন্যাসের নায়করা ছিল তার কাছে জীবন্ত, নিজের বন্ধুদের চাইতেও সে তাদের বেশি চিনত; দিনে প্রায় সময়ই সে ফিরে যেত এই কল্পনাময় বাস্তবের জগতে। হয়তো, মাদোও তার কাছে তেমনি একখানা আশ্চর্য বই। জীবনের প্রাত্যহিকতা দিয়ে সে বই বাঁধান, অথচ বাস্তব জীবনের সেই তো রক্তকোষ। সে মাদোকে ভালবাসে, ওকে দেখলে তার মুখের রং বদলে যায়, কিন্তু স্বপ্নেও সে এই মেয়েটিকে নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে না। মাদো সব সময়েই থাকে বাইরে পড়ে। তার ভাবাবেগ যে ক্ষীণ তা তো নয়, এর কারণ মাদোর আত্মা। একদিন সে তাকে বলেছিল: 'কখনো কখনো আমার মনে হয়,

আমি 'হাঁ' বললে, তুমি সেটা 'না' বলেই শোন। তুমি আলাদা ধাতুতে গড়া…' সে উষ্ণ, জীবনময়ী, প্রিয়তমাও বটে, কিন্তু তবু সে তো স্বপ্নই রয়ে গেল।

মাদো যে কথার প্রতীক্ষা করেছিল, সে-কথা সে বলল না। মাদো শক্ত হতে চাইল, চোখের জল সে রোধ করে রাখল, তাকে কোন কথাই জিজ্ঞেস করল না। তারা এবার এসে পৌঁছল সেই পথে, যেখানে তাদের প্রেম একদিন জন্ম নিয়েছিল। প্রথম হেমন্তের সোনালী রঙের সমারোহে তারা এসে দাঁড়াল, তারপর চলতে লাগল। তাদের সুখের সড়ক ধরে তারা বহুক্ষণ ঘুরে বেড়াল, গাছপালা দেখে হাসল, ল্যাম্পপোস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল, দুটি নীলাভ ছায়া পড়ল বাঁধান পথের উপর। বেঞ্চিগুলোও তাদের চেনা, এখানে কত হপ্তা, কত বছর, বুঝি সারা জীবনই কেটে গেছে…। ওরা এক চেনা ফুলওয়ালীর কাছ থেকে একগোছা ছোট্ট কাঠ-গোলাপ কিনে ফেলল।

কিন্তু শেষে দুজনেই ভেঙে পড়ল, পরস্পরকে আশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চাইল।

'হয়ত আবার বসন্তেই এখানে ফিরে আসব—'

'আমি প্রতীক্ষা করব। কিন্তু যদি অসহ্য হয়ে ওঠে, শুধু এক ছত্র লিখে দিও, আমি চলে আসব। বল, লিখবে…?'

'নিশ্চয়ই লিখব। এখন বুঝতে পারছি, কতখানি অসহ্য হয়ে উঠবে…'

'তাহলে—কেন ?'

'জানি না…মাদো, এছাড়া উপায়ও নেই…বিশ্বাস কর, তোমার চাইতে আমি বয়সে বড়, জীবনকেও আমি ভাল করে জানি।…হয়ত বোঝাতে পারছি না, কিন্তু এমনি ধারাই হয়—এখন তো অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে… আমি আবার নিশ্চয়ই বসন্তকালে ফিরে আসব…বাদাম গাছে গাছে তখন ধরবে ফুল—আর হঠাৎ দেখা হবে আমার মাদোর সঙ্গে—আমার দিকে এগিয়ে আসবে সবুজ পোষাকে—হাঁ, আমার কেন যেন মনে হয়, সবুজ হবে তোমার পোষাক—আমাদের দেখা হবেই মাদো, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত…।"

মাদো মাথা নাড়লো।

"কেন ছলনা করছ সার্জি ? আমি তোমাকে কয়েকটা দরকারী কথা বলতে চাই। তুমি আমার চাইতে বয়সে বড়, বুদ্ধিতেও তাই। আমি

তোমার কথা মেনে চলব। তুমি আমার জীবনের কথা জান। হটহাউস দেখেছ, ওখানে অকালে গাছপালা জন্মায়—তেমনি কাচের বাড়িতে যেন আমার জীবন কেটেছে, আর তোমার জীবন কেটেছে মেহনতিতে, লড়াইয়ে। কিন্তু একটা কথা আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি। না, না, তর্ক কোরো না, আমি মেয়েমানুষ—। তোমার চেয়ে আমি একথা ভাল বুঝি···আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। তোমার নিজস্ব জীবনধারায় তুমি ফিরে যাবে, মনেও কোরোনা, আমি হিংসে করছি। যেমন তুমি নিঃশ্বাস নাও, হাঁটো, কথা কও—একথাও যেমন সত্যি, এও তেমনি সত্যি। আর একটি মেয়ে—সে এসে তোমার জীবনে বাসা বাঁধবে, সে জানবে তোমার সব কথা, তোমার আনন্দ আর দুঃখের ভাগ নেবে। তবু স্মরণ কোরো মাদো নামে একজন ছিল। কে বলতে পারে, হয়তো আমার মত আপনার কেউ তোমার হবে না? এক বছরেই হয়তো তা বুঝতে পারবে, আবার দশ বছরও যেতে পারে তা বুঝতে। আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ বলে নিজেকে দোষী কোরো না, সব কিছু শুধু মনে রেখো, তাহলে মনে শান্তি পাবে—। আমি তোমার কাছে কোন শপথ করছি না। কি করে জানব কাল কি হবে? হয়তো আমিও আলাদা জীবন কাটাব। কিন্তু সার্জি, শোনো, যদি কামনা আমাকে পাগল করে দেয়, তুমি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থেকো। রাতে বালিশ কামড়ে আমি তখন বলব—সার্জি, আমার সার্জি আছে! আমার কথা বুঝতে পারছ? আমাদের দুজনের মনের অনেকখানি মাধুরী দিয়ে তো এ প্রেম রচনা করেছি! যদি জীবনে এমন কিছু থেকে থাকে যা মরে না··· ।"

সে কথা শেষ করল না, মনে হল তার শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে; সে এবার জিজ্ঞেস করল, ট্রেণ কখন ছাড়বে।

হৈ চৈ আর চাঞ্চল্যে ভরা স্টেশন। উঁচু কালিমাখা চূড়ার মত ছাদ থেকে চুইয়ে পড়ছে গোলমাল, চুইয়ে পড়ছে ইঞ্জিনের বাঁশী থেকে। মালের ঠেলা-গাড়ীগুলো ঝক্‌ঝক্ করতে করতে চলেছে, লোকজন সোরগোল তুলছে, বিদায় নিচ্ছে, ওদিকে ফেরিওয়ালারা হাঁকছে স্যাণ্ডউইচ, আর রুমাল।

'তোমার কামরায় কি খুব বেশি লোক?'

'হাঁ।'

'কি করে ঘুমোবে?'

'একটা ব্যবস্থা করে নেবই...'

'সার্জি, মনে আছে, 'তার বাহু দিয়ে সে আমাকে ধরবে জড়িয়ে।' তুমি এখন বোস! তোমাকে আমি একটু আদর করব।'

'মাদো!'

স্টেশনের আলোর মালা, কারখানার সার আর শহরতলি এরই মধ্যে পেছনে পড়ে রইল। কিন্তু সার্জি এখনো জানালায়, সে শুধু বার বার বলছে, 'মাদো!' রাত এল, শহরে এমন রাত কেউ দেখেনি। ধোঁয়া আর সোঁদা মাটির গন্ধ ঢেকে গেল, তার নিকষ কালোয় যেন হতচেতন হয়ে গেল মানুষ। সার্জি ঘুমোতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। গাড়ীর চাকার শব্দে দুলে উঠছে ছন্দ, তারই সঙ্গে খাপ খায়, এমনি একটি কথা ভাবতে লাগল: একটি প্রিয় সম্ভাষণ, কথার টুকরো:

তার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে আমাকে
ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

কিন্তু চাকায় তো সুনির্দিষ্ট শব্দের ঝঙ্কার উঠছে। সে ভোরের আগে ঘুমিয়ে পড়ল, একঘণ্টা পরে আবার জেগেও উঠল ধড়মড়িয়ে: কি হোল? সে তখনই বুঝতে পারল কি হয়েছে; মাদো চলে গেছে!

সে জানে সময়ে আরাম হবে, একথা নিজেকে বোঝালে চলবে না। এই ক্ষত নিয়েই বাঁচতে হবে। সে সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করলে, ব্যস্ত হয়ে খবরের কাগজ খুলে বসল—মস্কো-আলোচনা কতদূর এগুল? জার্মানীর পরিচ্ছন্ন দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখল—একঘেয়ে দৃশ্য। এবার তার সুমুখে ছড়িয়ে আছে পোল্যাণ্ডের প্রান্তর। বুকে একটা মোচড় দিয়ে গেল, রাশিয়া এল বলে। তারই অগ্রদূতী এই পোল্যাণ্ড। আর কিছুক্ষণ পরেই সে দেখতে পাবে চাষীদের কুঁড়েঘর, বন, ভেইজি আর ব্লুবেলের শোভা আর সুকেশী চাষীর মেয়েদের দল।...নেগরলয়-এ সে নাক থাঁদা এক লালফৌজের সৈন্যকে জড়িয়ে ধরেছিল আর কি! লোকটা প্রাভদা পড়ে মন্তব্য করেছিল, "ফরাসীদের দৃঢ়তা নেই।"

অবশেষে এল মস্কো। গ্রীষ্মের গুমোট গরম, পীচের গন্ধ, ব্রিফ্-কেস বগলে গ্রীষ্মের পোষাক-পরা মানুষ, চেরীর রস মুখে মাখা দুষ্টু ছেলের দল, সিংহের মূর্তিওলা বাড়ী—পুশকিন যার কথা বলেছেন। সার্জি মাকে মিথ্যা

বলল না : 'ফিরে এসে যে কি আনন্দ হচ্ছে, তুমি ভাবতেও পার না…' শুধু সে বলল না তার বুকখানা যেন বিরাট আর সেই বুকে বহুদিন হল চির ঠাঁই নিয়েছে চলে-যাওয়া প্রেমের ছায়া।

## সতেরো

সার্জি আনা-রথকে বলেছিল, সে দোকানে-দোকানে ঘুরে জিনিষ কেনা পছন্দ করে না, কিন্তু পারী থেকে ওল্গার জন্য উপহার না কিনে চলে আসবে কি করে? তার বোন তো তার কাছে ছোট্ট মেয়েটি। যখন নিনা জর্জিয়েভ্না হেসে বলেন, 'তুমি ওকে অত ছোটটি ভাব কেন, ও আমার থেকেও বেশি বুদ্ধি রাখে', সার্জি তার মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে যায়, তার পর বলে, 'হাঁ, বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু আমার কাছে ও তেমনি ছোটই আছে…।'

ওলগা অলক্ষ্যে কৈশোর পার হয়ে এসেছে, ওর মন এখন স্থির, অনুভূতিও সংযত—এমনি সংযম আর স্থৈর্য পাকা চুলের সঙ্গেই মানুষের আসে। গড়ন তার ছিমছাম, বেশ লম্বাও সে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাড়তি বা কমতি নেই। ওকে দেখলে পুরানো চায়ের কৌটোর উপরে বা সিগারেট কেসে আঁকা মেয়েদের ছবিকেই মনে পড়িয়ে দেয়। একটা জিনিস শুধু তার নেই, তাই সে মনোরমা হয়নি—সে তার অন্তরের আগুন। তার চোখ আয়ত, উজ্জ্বল, স্থির তার দৃষ্টি। হয়তো এরই জন্য অনেকে তাকে একটু কেমন উদাসীন ভাবে, কিন্তু কথার তোড়ে সে ভেসে যায় না, কথার খেইও সে চট করে ধরে নেয়। সে তার মার সঙ্গে থাকে ছোট্ট কুঠরিটিতে; বাড়ীটা একটা কমিউন। পড়শীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা মুশকিল। ওলগা না থাকলে ওরা নিনা জর্জিয়েভ্নাকে জ্বালিয়ে মারত। একজন তো একদিন হিংসে করেই খোঁচা মেরে বললো: "বল তো, তোমার ঐ মেয়ে বিদেশী পোষাক কোথায় পেল? নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে?…হয়ত তোমার অমন মিঠে বোল শুনে কেউ দিয়ে গেছে…" নিনা জর্জিয়েভ্না কথাটা শুনে এত ব্যথা পেয়েছিলেন,

তিনি সারারাত ঘুমোতেই পারেন নি। কিন্তু ওলগা যে কোনো আক্রমণকেই বাধা দিতে জানে। যখন তার মা বাড়ীর বাসিন্দেদের খারাপ ব্যবহারের নালিশ করেন, সে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে: 'গালাগাল আমাকে আঘাত করতে পারে না মা। কিন্তু ওরা চাইতে এলে ঐ ইলেকট্রিক কেৎলিটা আর দিও না। এখন আর ও জিনিস পাওয়া যায় না…।'

ওলগা কোনো এক বিভাগীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে কাজ করে। অনেক বাছাই করে তবে এ চাকরী সে নিয়েছে। সে অনেক খোঁজ-খবর করে, অন্য চাকরীগুলোর সঙ্গে এর সুবিধে-অসুবিধেগুলোও খতিয়ে দেখেছিল। কর্মী হিসেবে সে চমৎকার, তাই সবাই তার উপর খুশি।

সবাই খুশি, কিন্তু তার মা নন…কে বলবে, নিনা জর্জিয়েভ্না কি চেয়েছিলেন?—নিশ্চয়ই, মেয়ের জন্য দুঃখভোগ তিনি চাননি! ওলগার জন্য তার অস্বস্তির কারণ তার নিশ্চিন্ত ভাবখানা। সে নিজে কোনো কিছু নিয়েই দুঃখ করে না, নিজেকে ব্যস্ত করে তোলে না। তারা অবশ্য মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া করেন না। সবাই বলে নিনা জর্জিয়েভ্না যেমন আদর্শ মা তেমনি নম্র মেয়ে ওলগা। মা আর মেয়ের মধ্যে খুবই মিল দেখা যায়, আবার প্রভেদও তাঁদের মধ্যে খুবই বেশি।

ওলগাকে বোঝবার চেষ্টা নিনা জর্জিয়েভ্না করেন। তাঁর নিজের কুমারী জীবনের কথা মনে পড়ে…কিন্তু এ চাবী তো সে তালায় খাপ খায় না। তাছাড়া, তারা দুজনেই একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির—মা ভাবপ্রবনা অভিমানিনী, যে কোনো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত, আর ওলগা শান্ত, উচ্ছ্বাস তার নেই, উদাসীনতা না হোক, তার মনের শান্তি তাকে জীবনের আঘাত থেকে বাঁচিয়েছে। বিশ বছর বয়সে নিনা জর্জিয়েভ্না স্বাধীনতার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন—হাঁ, এই ছিল তার কামনা। তিনি তখন একটা ইস্তেহারের বাণ্ডিল জায়গা মতো পৌঁছে দিতে পারলে নিজেকে মহা সম্মানিত বোধ করতেন। তিনি 'ক্যাপিটাল' থেকে বহু অংশ তখন নকল করেছিলেন, আর লিখে রাখতেন নেক্রাসভের কবিতা। একটা খাতায় সে সব টোকা হোত। তিনি কি করে ওলগাকে চিনবেন, বুঝতে পারবেন? ওলগা স্বপ্ন দেখে রুচিমাফিক পোষাকের, একখানা বই পড়ে হয় 'চমৎকার' বলে মন্তব্য করে, নয় তো 'বাজে' বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তারপর বইয়ের কথা ভুলে

যেতেও তার দেরি হয় না। নিনা জর্জিয়েভনা নিজের মনে মনেই প্রশ্নের সমাধান খোঁজেন: সময় বদলে গেছে, ওদের এখন আর লড়তে হয় না—ওলগা তো খারাপ মেয়ে নয়, কখনো যা-তা করে বসবে না, তাছাড়া সে তার কাজ টাকার জন্যই শুধু করে না, সে নিজেই বলে—যখন কোনো কাজের ভার নেবে, সুষ্ঠুভাবেই তা করবে…

তাহলে তিনি মেয়ের উপর বিরূপ কেন? হয়তো তার বুকখানা পাথর বনে গেছে, যৌবনকে তিনি আর বুঝতে চান না—তাই কি?

একদিন ওলগা সার্জিকে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিল, কেন সে মার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না: "পুরানো উপন্যাসের মানুষগুলোর মতই মা কথা বলেন।—এমন কি তাঁর ভাষাও তেমনি…। এইত কাল উনি সাহিত্য সম্বন্ধে বলছিলেন, আমি অবশ্য, একেবারেই চুপ করে ছিলাম। কিন্তু মা রেগে গেলেন: 'কি, অনুপ্রেরণার কোনো দাম নেই?' এর উত্তর কি দেবে বল? ঐ বইগুলো সম্বন্ধে আমার খুব একটা উঁচু ধারণা নেই; বললে বলতে হয়, ওরা লিখতে জানত না অথবা বিষয়টা বড় বাজে; কিন্তু অমন কথা শুনে তারপরে কি আর কিছু বলতে ইচ্ছা হয়…?" সার্জিও তার বোনকে বুঝতে পারেনি, হয়তো সে কি বলছিল সে ভাল করে শোনেই নি: কিন্তু ওলগা ঠিকই বলেছে, মার আর মেয়ের ভাষা তো এখন আলাদা।

সার্জি বললে, "এই পোষাকগুলো এনেছি ওলিয়ার জন্যে।"

"ভারি চমৎকার তো—ওর বিয়ের লাগবে—ওলিয়েচ্‌কার বিয়ে হচ্ছে জান? তোমার নিশ্চয়ই মনেও হয়নি—তাই না?—ও ওদের দপ্তরের কর্তাকে বিয়ে করছে…"

নিনা জর্জিয়েভ্‌না হেসে সার্জিকে নিয়ে গেলেন বোনের কাছে। সার্জি বোনকে চুমু খেল। কি আশ্চর্য!—ওলগা বিয়ে করছে!—তা হবেই তো, ও ক্ষুদে ভেবেছে বলে কি…

"মা, আমাকে লেখনি কেন?"

"আরে আমিই তো সেদিন শুনলাম। ওলগা কিচ্ছু বলেনি—।"

নিনা জর্জিয়েভ্‌না ছুটির দিনে ডিনারের বিশেষ আয়োজন করলেন। টেবিল সাজালেন ফুল দিয়ে।

ওরা মুক্তাতেল খেয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। সার্জি মনে মনে ভাবল—

"বেশ, বেশ! সবই আস্তে আস্তে সুন্দর হয়ে উঠছে—এখন যুদ্ধ না বাঁধলেই হয়—"

সে পারীর অনেক কথাই ওদের বলল। ওর মা প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনলেন, তিনি তার যৌবনের পারীকে চিনতে পারলেন, কিন্তু তবুও যেন সে আলাদা। তেমনি সুন্দরী সে আজও আছে, কিন্তু কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেছে—লাল কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন লাগে, এও যেন তেমনি। সব কিছুতে যেন আগুন ধরে গেছে: পথঘাট, বাড়ির সার, মানুষ…সব—। ওখানকার মানুষ কি ভাবে, আবার যুদ্ধ বাঁধবে?—কি ভয়ংকর। কেন, কেন? এখানে তো মানুষ আবার সহজ জীবনের পথে ফিরে এসেছে—হয়তো সার্জি চট করেই একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করে ফেলেছে, খতিয়ে দেখেনি?—

"শেরিয়োঝেঙ্কা, ফরাসীরা কি যুদ্ধ করতে চায়?"

"তারা তো তাই বলে, কিন্তু নিশ্চয়ই তা চায় না—"

"কে যুদ্ধ করতে চায় বল্ না—"

"দেখ মা, কেউই যুদ্ধ করতে চায় না; আমরা যুদ্ধ করতে চাই না, কিন্তু দরকার হলে করব, আর ওরা যুদ্ধ করতে চায় না আর যুদ্ধ করবেও না। যদিও বা করে শুধু দেখাবার জন্যেই করবে, মন দেবে না…"

"ফ্রান্সের উপর আমার একটুও বিশ্বাস নেই" ওলগা বলে উঠল, "ওদের যা-কিছু সবই পুরানো, শুধু আধুনিকের মধ্যে আছে ফ্যাশান—আমি তোমার কথা শুনে ভাবছিলাম—ওরা কত পিছিয়ে আছে! দেখতে ওদের মজাই লাগবে, কিন্তু যদি আমাকে কেউ বলে, তুমি যেখানে খুশি যাও না—আমি যাব জার্মানী কি আমেরিকায়। আর যাই হোক, শিল্প সেখানে একেবারে আধুনিক পর্যায়ে উঠেছে—সবরকম সুবিধে তারা পাচ্ছে—ফ্রান্সের কথা যদি বল, সে তো শেষ হয়ে গেছে।"

নিনা জর্জিয়েভ্না যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি বলছ তুমি ওলিয়া? এমন একটা জাতি কি করে শেষ হয়ে যাবে? জানো, কাল আমি ক্লাসে হুগো পড়াচ্ছিলাম, তুমি যদি দেখতে, ওরা প্রতি কথাটা অনুভব করছিল!"

ওল্গা হাসল:

"কিন্তু হুগো কখন বেঁচেছিলেন? ওদের যা কিছু সবই তো অতীতের।"

"কেন, অতীতের কেন হবে? রোমাঁ রলাঁ এখনও লিখছেন। ওঁর বই না পড়লে তুমি ভুলই করবে, কি মহান ওর হৃদয়!"

"উনিও তো বুড়ো মানুষ। ওদের সব কিছুই অতীতের। আর শুধু লেখকই নয়, ওদের শিল্পও পুরানো; ওদের রাষ্ট্র ধ্বসে পড়ছে, আর শেরিওঝা তো বলছে, ওরা আত্মরক্ষা পর্যন্ত করবে না। ওদের নিয়ে অত গদগদ হবার কি আছে? শুধু অতীতের স্মৃতিই কি সব?"

"সেরিওঝেঙ্কা, ওকে বুঝিয়ে দাও—তুমি তো ফ্রান্সকে দেখেছ..."

নিনা জর্জিয়েভ্না উত্তেজিত হলে প্রচুর ধূমপান করেন। তিনি একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চললেন।

"হাঁ, আমি দেখেছি বইকি। ওরা আশ্চর্য মানুষ—। একদিন গিছলাম এক কারখানায়, একজন মজুর আমার কাছে এল, বাচ্চাই হবে। সে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কি রুশ?' তাকে বললাম, 'হাঁ'। সে এবার বললে, 'কমরেড স্টালিনকে বোলো, তাঁর এখানে বহু বন্ধু আছে, তিনি যেন খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস না করেন।' ওর মত ছোকরারাই মৃত্যুকে বরণ করতে পারে—তাছাড়া ওদের গুণের তারিফ করতে হয়, কোনো কিছু চট করে বুঝতে পারে। সবাই ওরা আবিষ্কারক—আনন্দে ওরা উদ্দাম—মরা মানুষকেও ওরা হাসাতে পারে। ওদের সম্বন্ধে আমার ভাবনাও কম নয়। ফ্রান্স যেন এক তরুণী, যাকে সে ভালবাসে না, তাকে বিয়ে করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে—এখন সে তাকে ছেড়ে যেতে পারছে না, তার সঙ্গে থাকতেও পারছে না। কিন্তু তবু সে এমনভাবে আছে, যাতে জার্মানরা আনন্দে নেচে উঠছে। তার আর আত্মরক্ষা করবার কোনো সামর্থ্যই নেই...।"

সে নিজেকে সংযত করে ফেলল: তার স্বরে উত্তেজনা, শেষ কথাটি বলার সময় কেঁপে উঠল তার স্বর—মাদোর ছায়া যেন তার সুমুখে। সে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল:

'কিন্তু ওলেচকা, তুমি তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করছ না, তোমার পছন্দ-মত মানুষটিকেই বিয়ে করছ। এস, তোমার এই আনন্দে আমরা পান করি। ভারি মজা লাগছে কিন্তু আমার। তোমাকে একটা পুতুল কিনে দিয়েছিলাম, সে কি বেশি দিনের কথা?'

'শেরিওঝা, তুমি যে ঠিক সময়ে ফিরে এসেছ, এতে আমি কত খুশি হয়েছি! মনে হয়, তুমি যেন আগেই টের পেয়েছিলে—আমরা নতুন বাড়ীতেই বিয়ের উৎসব করব। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, তোমাকে সেমিয়ন ইভানোভিচ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ওকে তোমার ভাল লাগবে। এখন মার ব্যাপারে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে—ডাক্তার বলেছেন, ওঁর রক্তের চাপ বেশ বেড়েছে, এখন সাবধান হতে হবে। মা বড্ড বেশি ধূমপান করেন…'

নিনা জর্জিয়েভনা অপরাধীর হাসি হেসে সিগারেটটা নিবিয়ে ফেললেন।

'না, আজকেই বেশি খাচ্ছি, ভয়ানক উত্তেজনা বোধ করছি…। এখন আমি সিগারেট নিজে বানিয়ে খাই, শেরিওঝা, ওতে খুব কম তামাক লাগে।'

'কিন্তু ধূমপান তো সব নয়', ওলগা বলতে লাগল, 'সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওঁর কাজ। ওঁকে স্কুল ছাড়তে হবে, ইনস্টিটিউটই তো যথেষ্ট, মাইনে তো খুবই কম, তার উপরে অতদুর যেতে হয়—।'

'ওলিয়া—তুমি মাইনের কথা তুললে কেন? ও বিষয় নিয়ে কথাই উঠতে পারে না। এ তো আমার সত্যিকার আনন্দ। আমি রোজই দেখতে পাই ওদের বিকাশ, ওরা বুঝতে শুরু করেছে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না শেরিওঝেঙ্কা, কি এক ভবিষ্যৎ বংশধরের দল বেড়ে উঠছে। তোমাদের থেকে ঢের ভালো।'

'হাঁ, একথা সত্যি যে ওরা সময়টা পেয়েছে ভাল। কিন্তু তবু যেন ওদের আরও বেশি জীবন্ত মনে হয়, ওদের মন উদার। আমার মনে আছে, আগে কেউ কেউ হেসে বলত, 'পুরানো ভাঙা বজরা'। কিন্তু এরা তো তা নয়, এরা প্রতি কথাটা শুধু শোনে না, গেলে। ওরাই সত্যিকারের পুরুষ আর মেয়ে হয়ে দেখা দেবে। তাই তোমার কাছে যুদ্ধের কথা শুনে আমার বড় ভয় হচ্ছে। আর স্কুলের কথা যদি বল, আমি স্কুল ছেড়ে দেব না।'

'শেরিওঝাকে বল, তুমি ওখানে কত পাও। তার উপরে দেড়ঘণ্টা ধরে ঐ বিশ্রী ট্রামে যাওয়া-আসা তো আছেই—ডাক্তার বলেছেন, তোমাকে সাবধান হতে হবে।'

সার্জি বুঝতে পারল, এই কথাবার্তা মাকে ব্যথা দিচ্ছে; সে এবার

ভাসিয়ার কথা জিজ্ঞেস করল। ওলগা চলে গেল তার অফিসে। নিনা জর্জিয়েভ্‌না নিজের মেয়ের সাফাই গাইতে বসলেন :

'তুমি ভেবনা, ওর টাকার উপর খুব লোভ আছে। এই তো, আমাকে হাত-খরচা দিতে চেয়েছিল। ওর কিছুদিন হল চাকরীতে উন্নতি হয়েছে। ওর কথা শোনো কেন, ও অমনি বলে—কিন্তু মনটা বড ভাল। আমার জন্য যা করে দেখে মায়া হয়।'

'ওর এই পছন্দে তোমার তো আপত্তি নেই মা ?'

'সেমিওন ইভানোভিচের কথা বলছ ? সত্যি বলি, ওকে আমি ভাল করে চিনি না। ওলিয়া সুখী হয়েছে সেইটেই বড় কথা—আমাকে পারীর কথা আরো বলো না—'

সার্জি অনেকক্ষণ ধরে বলল—সিনের বাঁধ, ফ্যাসিস্টদের কথা, সাবার ছবি, কারখানা, মজুর আর গাছ—সব কিছুই তার কথায় মূর্ত হয়ে উঠল। যে-রাতে সে মোমার্তের চূড়ায় উঠেছিল, নিচে সে দেখেছিল পারীর চলমান জীবন, যেন সে এক বিরাট সমুদ্র। শুধু সে বলল না, সে একা সেখানে ছিল না। নিনা জর্জিয়েভ্‌না বুঝতে পারলেন, সে যেন কি লুকোচ্ছে।

'তুমি ওখানে কাউকে ভালবাসনি শেরিওঝা ?'

'ভালবাসব ? হাঁ, পারীকে ভালবেসেছিলাম।'

সে চলে যেতে নিনা জর্জিয়েভ্‌না মনে মনে ভাবলেন : 'শেরিওঝাও নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলে। ভাসিয়া তো কোন কথাই মুখ ফুটে বলবে না—আর ওলিয়া…'

সার্জি যখন জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওর পছন্দে তোমার মত আছে ?' নিনা জর্জিয়েভ্‌না সমস্ত শক্তি জড়ো করে সত্যি কথা না বলতেই চেয়েছিলেন।

দুদিন আগের কথা, ওল্‌গা বাড়ী ফিরে এল, তেমনি শান্ত ওল্‌গা, অন্তত উপরে তো বটেই। যখন সে খেতে বসল, নিনা জর্জিয়েভ্‌না বুঝলেন ওলিয়ার কি যেন হয়েছে, স্বাভাবিক অবস্থায় সে নেই। সে তার প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিল, তারপর চুপ করে বসে রইল। ঠোঁট তখনও তার নড়ছে।

'কি হয়েছে ওলগা ?'

'তেমন কিছু নয়।'

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে ওলগা বলল :

'সেমিয়ন ইভানোভিচ আর আমি ঠিক করেছি, আমরা রেজেস্ট্রী আফিসে যাব। আর অক্টোবরে আমি ওর ওখানে চলে যাব। মা, আমি শুধু ভাবছি, তুমি কি করে একা থাকবে—ভেবো না মা, প্রায়ই এসে দেখা করে যাব।'

নিনা জর্জিয়েভ্‌না মুখ ফেরালেন, তিনি আবেগ দমন করতে পারছিলেন না।

'মা, তুমি কি রাজি নও?'

'আগে বলনি কেন?'

'আমি নিজেই যে জানতাম না—'

'ওলিওচকা, ওকে কি তুমি ভালবাস?'

'আমার পক্ষে বলা ভারি শক্ত। মা, তুমি তো এক গাদা প্রশ্ন শুরু করে দিলে—লাবাজভ, চমৎকার লোক! ওর সম্বন্ধে অন্য কোন ভাব আমার মনে জাগে নি, কিন্তু সেটা খুব দরকারীও নয়। সবারই ওর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা। আমি নিজেই তো দেখতে পাই—এক বছর ধরে তো ওর কাছে চাকরী করলাম—তাই না? সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন ধরেই আমাদের দেখা-শোনা হচ্ছে, আমাদের তো মনে হয়, রেজেষ্ট্রি বুঝি-বা হয়ে গেছে। কিন্তু পরশু জানা গেল ও ওঝাইস্কায়ার নতুন বাড়ীতে একটা ফ্ল্যাট পাবে, তাই ও প্রস্তাব করলে অনুষ্ঠানগুলো এবার চুকে যাক—

নিনা জর্জিয়েভ্‌না আর প্রশ্ন করলেন না, তিনি ওলগাকে দমিয়ে দিতে চান না, বরং অভিনন্দনই জানালেন।

সেরিওঝা চলে যাবার পর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সেমিওন ইভানোভিচকে তিনি কল্পনায় আঁকলেন, ভাঙা গাল, খুদে ঘুমন্ত দুটি চোখ; ওলিয়ার জন্য ওঁর খুব দুঃখই হোলো। এ দুঃখ প্রকাশ করা যায় না। এবার তিনি বসলেন নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করতে: ওলিয়া তো খুদে মেয়ে নয়, সে লাভাজভকে জানে। কারো চেহারা দেখে তাকে বিচার করা চলে না—সে একজন আত্মতৃপ্ত মানুষ—তা সে তো ভালই! ওলিয়াও তো তাই, হয়তো সে তাকে ভালও বাসে, শুধু মুখ ফুটে বলবে না—এমনি মেয়ের গর্ব। কিন্তু কি ভয়ানক কথাই সে শোনালে 'অনুষ্ঠানগুলো চুকিয়ে ফেলতে হবে।' অথবা আমি বুড়ো হয়ে গেছি, কিছু বুঝতে পারি না বলেই কি কথাটা বেখাপ্পা শোনাচ্ছে?—

নিনা ভর্জিয়েভ্না কাঁদলেন নিজের কথা ভেবে, তাঁর স্বপ্নের কথা ভেবে। এবার এলো নিঃসঙ্গতা—রাত এসে পিষে ফেলতে চাইল তাঁর বুকখানা। নিনা এবার জোর করে টেবিলে গিয়ে বসলেন, তাঁর সেই খাতাখানা বার করলেন। হুগো স্বাধীনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন…তিনি হাসলেন, চোখের জলে ভেজা তার মুখ—না, তার হেমন্ত তো বিক্তা নিয়ে আসেনি, শীতের ভয়ালতাও সেখানে নেই।

## —আঠারো—

সার্জির কাছে বিদায়ের সময় মাদো বলেছিল ভালবাসা হবে তার নোঙর, কিন্তু তা তো হোল না—ভালবাসা যেন তার গলায় ভারী পাথর হয়েই দেখা দিল। মাদো আর তার পুরানো জীবনে ফিরে যেতে পারল না, আবার সার্জির সঙ্গে দেখা হবে, সে স্বপ্নও তার উবে গেল। দিনের পর দিন ঘরে সে বসে রইল, তখন উদাসীনতা এসেছে তার।

"আবার ছবি আঁকতে শুরু করছ না কেন?" সাবাঁ তাকে জিজ্ঞেস করল, "আমার নিজেরও দুঃখ আছে, তবু আমি তো কাজ করে যাচ্ছি।"

"আমার তো দুঃখ নেই, আমার অস্তিত্বই যে নেই।"

সাঁবা বলল,

"সে তো শীগ্‌গিরই ফিরে আসবে—"

মাদো মাথা নাড়লো:

"তার কথা আমি ভাবছি না।"

সত্যি কথা। আঘাত এত প্রচণ্ড যে সে কোনো কিছুই ভাবতে পারে না। মাঝে মাঝে সে তার পরিচিত পরিবেশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়—সুগন্ধির শিশি, ছোট্ট কার্পেট, অসমাপ্ত ছবি-আঁটা ইজেল—সবই যেন অপরিচয়ে ধূসর। সার্জি তাকে তার আগেকার জীবন থেকে টেনে এনেছিল, কিন্তু নতুন জীবন তো সে পায়নি।

মার্সেলিন দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করেন: কি হোল

মাদোর ? এইত সেদিনও ছিল জীবন্ত, কত হেসেছে, কত ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু এখন তো কথাটি কয় না, শুধু একদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে···মার কাছেও মনের কথা বলবে না—ভারি চাপা মেয়ে···। মার্সেলিন স্বামীর কাছে মেয়ের কথা পাড়তে গেলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন :

"দেখ, নিজেকে দিয়ে বিচার কোরো না···। ও অন্য যুগের মানুষ, ওরা আজকাল আগের মতো অত ভাবে না। কিন্তু মাদোর চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ডাক্তার মোরিলোকে ডাকা উচিত, তিনি এসে ওকে দেখুন। দেখো দেখি, আমরা এখন গেলিনোতে যেতে পারছি না, ওখানে গেলে শীগ্গিরই সেরে উঠত···! কিন্তু কি করা যাবে, সবাই-ই তো যুদ্ধের কথা বলছে···"

ডাক্তার মোরিলো বহুদিন থেকেই লাঁসিয়েদের পরিবারের ডাক্তার। তিনি মার্সেলিনের রক্তের চাপ বৃদ্ধির ব্যাপারটা জানেন, আর মরিসের উতলা হবার খবরও রাখেন। যাকে বলে খাঁটি অসূয়ক, তিনি তাই, তবে ভদ্রতাবোধটুকু আছে। তাঁর পোষাকে সব সময়েই তামাকের ছাই লেগে থাকে, ক্ষুদে প্যাঁস-নে-জোড়া বিরাট মাংসল মুখে এঁটে বসে আছে। মোরিলো বললেন,

"বন্ধু, যদি ডাক্তাররা এইসব রোগের চিকিৎসা করতে শুরু করে, তাহলে নিভেল কি নিয়ে লিখবেন ? মেয়েটি বড ভাবপ্রবণ, মনে ওর যে কোনো দাগ বসে যায়···। আপনার মতো মানুষদের ছেলেমেয়েদের মনের এমনি অবস্থা সব সময়েই হয়ে থাকে। না, না, তর্ক করবেন না, আপনি জীবন উড়ে উড়ে কাটিয়েছেন, এখনো কাটাচ্ছেন। নস্তিদানী, ভোজ এমনি আরও কত কি নিয়ে কেটে যাচ্ছে আপনার জীবন···কিন্তু এগুলো ওদের ভালো লাগে না, ওরা বিরক্ত হয়। নিজের বরাত ভালো, তাই লুই বিমান-বিদ্যা নিয়ে মেতে উঠেছে, ও যে আপিং ধরেনি বা নিজের প্রেমিকাদের উপর গুলি চালায় নি—এই-ই ঢের।"

"কিন্তু আজকাল বিমান-বিদ্যা তো খুবই বিপদের কারণ। ওর চেয়ে আর সাংঘাতিক কি আছে।···"

"অবশ্য, আবার যে যুদ্ধ হবে একথা আমি নিজে বিশ্বাস করি না।"

"আমার মতে কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। মস্কোতে ওরা

অচল অবস্থায় এসে পড়েছে—ভয় হয়, হয়তো একটা বিপর্যয়েই এর শেষ হবে…।"

ভোরে খাবার ঘরে বসে ওরা কফিতে চুমুক দিতে দিতে কথাবার্তা বলছিলেন। লঁাসিয়ে খবরের কাগজ খুলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিকই বটে!

"রুশরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!"

মার্সেলিন ভয় পেলেন। কাগজের খবরে এর আগে তিনি এত বিচলিত হননি; পরিবারে কোনো খবর নিয়ে আলোচনা করতে হলে তিনি থিয়েটার মহলের গুজব নিয়েই করতেন, অথবা বলতেন কানাডার একটি স্ত্রীলোকের গল্প—সে এমনই উর্বর যে একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান প্রসব করেছিল। এসব হাসির গল্প, চুটকি। কিন্তু আজ লঁাসিয়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। মার্সেলিন জানতেন ঐ সরু গলার উঁচু পর্দায় তার মানে কি।

মাদো বাবার কাছে ছুটে এল:

"বাবা, কি বলছ?"

"কি বলছি! ওরা জার্মানদের সঙ্গে চুক্তি করে বসেছে।"

"অসম্ভব—"

"বেশ, নিজেই পড়ে দেখ না—মস্কো থেকে হাভাস-এর বিবরণী।"

মাদো নিঃশব্দে চলে গেল তার ঘরে। তখনো কানে আসছিল বাবার চিৎকার; লুই ক্রুদ্ধস্বরে বলছিল: "ওদের কাছে এমন ব্যাপার আশা করিনি। আর যা-ই হোক, ব্যাপারটা মোটেও ঠিক হয়নি।" মাদোর মনে হলো যেন ওরা সার্জির কথাই বলছে। না, না, এ সত্য নয়, এ অসম্ভব! সে তার ভাবধারার জন্য ভালবাসাও প্রত্যাখ্যান করেছে, সেদিন মাদোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে খবরের কাগজ কেনবার জন্য ছুটে গিয়েছিল…। কতবার সে বলেছে, যুদ্ধ হবেই, আর সে যুদ্ধে জার্মানদের হারিয়ে দিতে হবেই।—সে সবই কি স্বপ্ন? সার্জি কি তার নিজের সম্পর্কে প্রতারণা করল? না, সার্জি এখন দুঃখ পাচ্ছে, কি করে বাঁচতে হয় জানেনা বলেই তার এই দুঃখ? আবার হয়তো স্বপ্নই তাকে প্রতারণা করেছে?…মাদো এ নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে চাইল, বুঝতে চাইল। তার বাবা 'রাজনীতি'র কথা" বলছিলেন, মাদো বার বার সেই কথাটাই আওড়ালো। রাজনীতি তার

জীবনের সীমানায় হঠাৎ ঢুকে পড়েছে, তার ব্যক্তিগত দুঃখের সঙ্গে মিশে গেছে।

সে সাঁবার সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

"ওরা গোল্লায় যাক। এবার নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাঁধবে। আর জার্মানদের সঙ্গে এঁটে ওঠাও সহজ হবে না। উনিশ শো চৌদ্দ সালের যুদ্ধে আমরা চার বছর লড়াই চালিয়েছিলাম, এবার আট বছর চালাতে হবে...।"

"কিন্তু, সাঁবা, রুশরা কি করলো ?"

"বাঃ রে, ওরা যে জার্মানদের সঙ্গে চুক্তি করেছে !"

"কিন্তু তা তো অসম্ভব !"

"এতে অবাক হবার কিছুই নেই। আমরা ওদের উপর টেক্কা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরাই আমাদের ওপর টেক্কা মেরেছে। এই তো ব্যাপার..."

মাদো আপন মনে ভাবল, সাঁবাও বুঝতে পারে নি। ও-ছবি ছাড়া আর কিছু তো বোঝে না। ওরা সবাই খবরের কাগজ পড়ে, আর যা পড়ে, তাই-ই বিশ্বাস করে বসে...। হাঁ, কিন্তু খবরটা এসেছে মস্কো থেকে...। কে তাকে বুঝিয়ে দেবে ? হঠাৎ তার মনে পড়ল, লেঁজা তো আছে। ওর কথা আগে মনে পড়ে নি কেন ? সার্জি কতবার বলেছে, 'লেজাঁ আমাদের বুঝতে পারে—আমাদের সত্যিকারের বন্ধু—' যদি সে সার্জিকে বুঝেই থাকে, সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারবে...।

মানুষের মনের শক্তি খুব কমই বাইরের চেহারায় ফুটে ওঠে। আবার আঁরি লেঁজার সম্বন্ধে তো সে কথা খুবই খাটে। ওর নম্র, থতমত-খাওয়া চোখের দৃষ্টি, ওর বিনয়ী ব্যবহার দেখে কে বলবে যে ওর আছে লোহার মত দৃঢ় মনের বল। দাঁসিয়ে যে ওকে নিয়ে গর্ব বোধ করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। লেঁজা পারীর সবচেয়ে সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একজন। সে যে রোসে আইনের মতো ক্ষুদে কারখানায় পড়ে আছে, তার একমাত্র কারণ হোলো, বড় কারখানার মালিকরা তার নাম শুনলেই জ্বলে ওঠেন ; আর কারো সম্বন্ধেই তারা এমন ঘৃণাভরে উল্লেখ করেন না। দক্ষিণ-পন্থীরা যে কোন পরিস্থিতিতে তার ঠাণ্ডা মাথার পরিচয় পেয়ে জ্বলে ওঠেন, তার সংযম আর পাণ্ডিত্য তাদের ক্রোধই জাগায়। নিভেল একবার বলে-

ছিল: 'পুলিসের লোক ল্যুমানিতে পড়ছে তার কারণ বুঝতে পারি, কিন্তু একজন কমিউনিস্ট দাস্তে পড়ছে—সে ভারি অস্বাভাবিক ব্যাপার, মনটা তাতে বিদ্রোহীই হয়ে ওঠে···।' সে একজন আইনজীবীর ছেলে। তাঁর বাবা ছিলেন লিল্-এ প্রথম যাঁরা সোশালিস্ট হন তাদেরই একজন। তার ঠাকুর্দা ছিলেন চিকিৎসক, তিনি তার যৌবনে আহত কমিউনার্ডদের আশ্রয় দিয়ে প্রাণ দিতে দিতে বেঁচে গিছলেন। আঁরি লেজ্যাঁ উত্তরাধিকারীসূত্রে বুদ্ধিজীবী। বহু ভেবে-চিন্তে সে কমিউনিজম্‌কে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু একবার মন যখন স্থির হয়ে গেছে, সে রাজনীতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মজুররা তাই বলে: "আমাদের আঁরির মুখে যা মনেও তাই।" ওর দৃঢ়তা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর সততার জন্য মজুরেরা ওকে ভালবাসে। লোকে যে মনে করে, তার বাইরেব চেহারায় মনের আঁচ পাওয়া যায় না, তা নয়। সে শত্রুর প্রতি নির্দয়, কিন্তু সাথীদের প্রতি তার আছে সজাগ দৃষ্টি, তাদের ডাকে সে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত। কোন একটা দক্ষিণপন্থী কাগজ লেজ্যাঁকে ভণ্ড বলতেও দ্বিধা করে নি। তার বক্তব্য ছিল এই যে, লেজ্যাঁ বিলাসী, সে বহু বিলাসিনী রক্ষিতা পুষছে, তাছাড়া চড়া দামের বেশ্যাবাড়ীতে তার যাতায়াত আছে। কিন্তু লেজ্যাঁ তার স্ত্রী আর দুই সন্তানকে নিয়ে বাস করে একটি ছোট্ট বাড়িতে। তার বড় সন্তানটির বয়েস এখন সবে ষোলো। তার ঘরে সৌখীন জিনিসের ভিতরে আছে একটা পিয়ানো। লেজ্যাঁর স্ত্রী জোসেৎ গান-বাজনা ভালবাসে তাই সেটা রেখেছে।

মাদো লেজ্যাঁর ওখানে যখন-তখন যায়। কয়বেইয়ের পরে, এই সাধারণ বেতের চেয়ার, পুরনো খাবার রাখার আলমারী, সাদাসিদে খাবার তার কাছে পরম তৃপ্তির বলেই মনে হয়। সাদাসিদে ভোজে বসে পরিবারের সবাই যখন সরল সহজ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তার বেশ ভালোই লাগে। তার কাছে লেজ্যাঁ জনগণের একজন মস্ত নেতা নয়, সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারও নয়। একজন শান্ত, কোমলহৃদয় মানুষ—সে সাত বছরের মেয়ে মিমির সঙ্গে কাণামাছি খেলে, পলকে আঁক কষতে সাহায্য করে। তাই ওর জোসেতের উপর মাঝে মাঝে হিংসেই হয়।

কিন্তু জোসেৎ পুতুলের স্বর্গের বাসিন্দে নয়, কঠিন, কালো মাটিতেই তার বাস। মজুরের মেয়ে সে, সংসারের পোড় তাকে খেতে হয়েছে। সে এক

সময়ে ছিল এক খনি-এলাকার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সেখানে সব কিছুই ঝুলে ঢাকা—মুখ, বাড়ী, গাছপালা—সব! মনটা তার বেশ হাসিখুশি, কিন্তু তবু দুঃখ সে পেয়েছে, সয়েছে উপবাস আর ব্যথা। কেমন যেন ছেলেমানুষি মাখানো তার মুখে, কিন্তু তার চোখের কোলের কালো দাগ, আর তার চোখের ক্লান্তি আর বিষাদের ছায়া জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই জানিয়ে দেয়। আঠারো বছর আগে এই হাসিখুশি, অথচ ভাবনা-ভরা মেয়েটির সঙ্গে লেজ্যাঁর দেখা হয়েছিল। সে তাকে দিল আদর্শ—তার আগে সে জানত জীবন এক ভয়ংকর সংগ্রাম—আর সে সংগ্রাম রুটি, টাকা আর পদের জন্য। কিন্তু অঁারির সাহচর্যে সেই সংগ্রামই হল তার জীবন। কয়েক বছর ধরে লেজ্যাঁ কাজ জোটাতে পারে নি, জোসেতের সামান্য মাইনেতেই তাদের দিন চলত। কিন্তু জোসেৎ ভেঙে পড়ে নি—সে জানত কেন সে বেঁচে আছে।

সে কি করে চিনবে পাগলী মাদোকে? আর মাদো তাকে ভয়ও পায়। একদিন সে লেজ্যাঁকে বললে: "আপনার স্ত্রীটি কিন্তু ভারি কড়া।" লেজ্যাঁ হাসলো: "মোটেই নয়…তুমি শুধু হট হাউসে জীইয়ে রাখা চাড়া গাছ দেখেছ, তাই তোমার কড়া মনে হচ্ছে, কিন্তু জোসেৎ বাইরের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে।"

আর সবার মতোই লেজ্যাঁও মস্কোর এই ছোট্ট খবর শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে।

মাদোর আসায় সে বিরক্ত হোলো—এখন কেউ আসে সে তা চায় না। কিন্তু তখনি তার মনে হোলো, মাদো কি এক দুঃখে মুষড়ে আছে। তার উপর লেজ্যাঁর খানিকটা মমতাও আছে।

"একমাত্র আপনিই আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন…। আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না, ওরা সবাই রুশদের ঘৃণা করে। কিন্তু আমি জানি, আপনি ওদের পক্ষে। আমি সত্যি বুঝতে পারছি না…। বলুন, সত্যিই কি ওরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?"

'বিশ্বাসঘাতকতা করেছে…?' লেজ্যাঁ হাসলো, ওর বিষণ্ণ মুখখানা বিষণ্ণতরো' হয়ে উঠলো।

'ওরা কি করে বিশ্বাসঘাতকতা করল?…আমরা তো বহুদিন আগেই ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছি। না, আমাদের কথা নয়, যারা আজ ফ্রান্স শাসন করছে তাদের কথাই বলছি। প্রথমে মিউনিক, তারপরে

রিবেনট্রপের সঙ্গে চুক্তি…তারা চেয়েছে জার্মানরা রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক।"

"কিন্তু মস্কৌয় যে মিশন গেল?"…

"সে তো ভড়ং…। তারা ভেবেছিল, ঐ দিয়েই রুশদের বোকা ঠকাতে পারবে। এই তো, ভোরোশিলভের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণটা পড় না। দেখছ, 'আক্রমণকারী' বলতে তিনি ফ্যাসিস্টদেরই বোঝাতে চাইছেন। পোলরা লালফৌজকে যাবার সুবিধে দেয় নি, এদিকে ফরাসী আর ইংরেজরা বেক্‌কে সাহায্য করেছে। রুশদের আর উপায় কি…"

"কিন্তু ওর কাছ থেকে এতবার শুনেছি…" মাদো নিজেকে সংযত করল। "আমি বহুবার শুনেছি আমাদের প্রধান শত্রু ফ্যাসিস্টরা। ওরা তাদের সঙ্গে কি করে বোঝাপড়া করল? আর তা আমাদেরই বিরুদ্ধে। এখানে তো শুধু বনেৎ, আর নিস্তেলই নেই, আপনি আছেন, সাবাঁ আছে, আর আছে মজুর আর মানুষ…।"

সন্ধ্যা হয়ে এল। লেজ াঁ আলো জেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আর জ্বালালো না। জোসেৎ তার মেয়েকে নিয়ে বাইরে গেল। লেজ াঁ বললো :

"অন্যের পাপের শাস্তি আমাদের নিতে হবে। তুমি একথা মনে কোরো না যে, আমি একজন বাইরের লোক। আমি ফরাসী দেশের মানুষ… ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয় আমাদের, একেবারেই নয়…কিন্তু আমাদের রুশ সাথীরা ঠিকই করেছেন, তাদের সৈন্য জমায়েৎ করছেন। যদি মস্কো বাঁচে, ফ্রান্সও বাঁচবে। কিন্তু পরীক্ষা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না, আর এ পরীক্ষা বড় ভীষণ…। কিন্তু হতাশ হোয়ো না। তোমাকে যারা বলেছে, রুশরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, জানবে তারাই বিশ্বাসঘাতক।

এবার আমরা হব শিকার, জেলে যাব, খুন হব। হাঁ, পরীক্ষার সময় আসছে, শুধু কথার পরীক্ষা নয়, অস্ত্রে তার পরীক্ষা…"

হঠাৎ পল মাঝখানে ভরা গলায় বলে উঠলো, স্বর তার আবেগে ভাঙা— "সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিশ্বাস রাখা।"

লেজ াঁ হাসলো :

"দেখছ না, আমরা যদি মরি, ওরাই যুদ্ধ শেষ করবে…"

মাদো আরো বিভ্রান্ত হয়েই চলে গেল। এ একটা জুয়া খেলা—

সাংঘাতিক জুয়া···ঐ ছেলেটি বললে, 'বিশ্বাস রাখতে হবে।' কিন্তু কার উপরে বিশ্বাস? এখন তো আর বিশ্বাস নেই, সে তো এখন ছেলেমেয়েদের রূপ-কথারই সামিল। ছেলেমেয়েরা বড় হয়, বয়েস হলে আর রূপকথা শোনবার সময় থাকে না। তারা তখন যুদ্ধে নাম লেখায়, তারপর যায় কবরে; তারা পা ছোঁড়ে, এড়িয়ে যেতে চায়, ঝোপে-ঝাড়ে লুকোয়। লেজ্যাঁ ভীরু নয়, তাই সে লুকোবে না। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারি না···এ কি সত্যি যে ঐ পল ছেলেটা বেশি বোঝে?···ওরা অবশ্য আলাদা, বেশ মজবুতও বটে। লেজ্যাঁ যখন হট-হাউসে জিইয়ে-রাখা চাড়ার কথা বলছিল, সে আমাকেই লক্ষ্য করে বলছিল। এখন তো হট-হাউসের কাচ ভেঙে গেছে, ভিতরে আসছে তুষার, আমি জমে যাচ্ছি···আহা, যদি জোসেতের সঙ্গে নিজের অবস্থাটা বদল করতে পারতাম! তার আছে লেজ্যাঁ। কিন্তু আমার তো কেউ নেই। সার্জি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে···। না, না, তা তো নয়। হাঁ, তার লেজ্যাঁ আছে বটে, কিন্তু তার নিজেরও কিছু আছে···কিন্তু আমার তো কিছুই নেই। সার্জির কথা ভেবে আমার মনে শান্তি নেই। সব চেয়ে বেশি করে আজ আমার মনে হচ্ছে, আমার সার্জি আমার আর নেই, সে এখন লেজ্যাঁর আর জোসেতের, ঐ ক্ষুদে পলের, এমন কি সকলের—কিন্তু আমার নয়।···

## উনিশ

দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে ঘটনার, লাঁসিয়ের মাথা ঘুরে গেল। যুদ্ধ, নিষ্প্রদীপ রাত, রেলওয়ে স্টেশনে স্ত্রীলোকের কান্না। লুই চলে গেছে যুদ্ধে, মার্সেলিনও কাঁদছে। আর খবরের কাগজে দিচ্ছে খারাপ খবর—জার্মানরা ভারসৌ-এর কাছে এসে গেছে। পোলাণ্ডের জন্য আমরা এই হাঙামায় পড়লাম, কিন্তু ওরা লড়তেও জানে না! পোলাণ্ডের সেই মার্ণে কোথায়? না, ওরা তো আর ফরাসী নয়!···লাঁসিয়ে গজরাতে শুরু করলেন। নিজের মশ্তিদানির কথা ভুলে গেলেন, সুদানের ছাগলটার দিকে তাকিয়ে নিজেকে গালাগাল দিলেন: বুড়ো অজবুক কোথাকার, কি ভাবছ? ওরা যে

কোনোদিন করবেইয়ের উপর বোমা ফেলতে পারে।…লাঁসিয়ের মেজাজ বিগড়ে গেল, বন্ধুরা আর তাকে চিনতেই পারেন না। তাই ঘন ঘন ঝগড়া বাঁধতে লাগল।

কারখানার দুজন মজুর পল্টনে চলে যাওয়ায় লেজাঁ যখন তাদের বদলে লোক নেবার কথা বলতে এল, লাঁসিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন :

'তোমার মিতেরা তাহলে হিটলারের সঙ্গে যোগ দিলে ?'

'আমার তো মনে হয়, আমাদের ফ্যাসিস্টরাই হিটলারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।'

'আর কমিউনিস্টরা কি করছে ? ফরাসীরা তবু লড়াই করছে…'

'আমি তো ফরাসীদের লড়াই করতে দেখছিনা, লড়াই পোলাণ্ডের ওরাই করছে…। ফরাসী সৈন্যবাহিনী আর যা-ই করুক, লড়াই করছে না।'

'ঘোড়া-চোর যে সে ঘোড়া সাফাই করতে জানে। জিজ্ঞেস করি, মস্কো-চুক্তি কি করে তোমরা উড়িয়ে দেবে ? তোমরা কি ফরাসী দেশের মানুষ— না, তাতার ? গোল্লায় যাও তোমরা !'

'আমি একজন ফরাসী, তবে আপনার মত ফরাসী নই…আমার ফ্রান্স আপনার থেকে আলাদা।'

'তুমি কি হিটলারের পক্ষে, না বিপক্ষে ?'

'এটা বোকার মতই প্রশ্ন হোলো ! হিটলারের তো বটেই, ফরাসী ফ্যাসিস্টদেরও আমরা বিপক্ষে।'

'দেখ লেঁজা, ওকথা বলে তুমি ছোট ছেলেদের ভোলাতে পার, কিন্তু আমার বয়স চুয়ান্ন বছর…। আমি বুঝি, রুশরা বিচক্ষণের মতোই কাজ করেছে। ওরা নিজের ভাল ভালো করেই বোঝে। কিন্তু তাই বলে, তুমি একজন ফরাসী হয়ে কি করে ওদের সমর্থন কর ? হুঁ, এখন তো চুপ করে থাকবেই ! কি বলবে ভেবে পাচ্ছ না ! আমি তোমাকে বন্ধুভাবেই বলছি, অবরোধের যে কোনো দিকে আমরা দাঁড়াতে পারি, কিন্তু সে অবরোধ হবে আমাদের ফ্রান্সের, সাইবেরিয়ার নয় !'

'আচ্ছা, আপনার কথার জবাবই আমি দেব, তবে কথা হচ্ছে, সে-জবাব আপনার পছন্দসই হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রতিটি ফরাসী মেহনতী মানুষই আমার কথার সায় দেবে। আমাদের কাছে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন একটা

কল্পলোক নয়। রুশদের অনেক দোষ থাকতে পারে, তারাও তো মানুষ, দোষ তো থাকবেই। কিন্তু আমার ঠাকুর্দা যা স্বপ্ন দেখতেন, কেডারালরা যার জন্য লড়েছিল, তারা সে স্বপ্ন সফল করেছে। মস্কো যদি আজ জেতে, আমাদের মাতৃভূমিকে, সত্যিকারের ফ্রান্সকে আমরা পাব। কিন্তু আজ যদি মস্কো ধ্বংস হয়ে যায়, আমরাও ধ্বংস হব। তখন আসবে হিটলার—জার্মান কি ফরাসী সে কি হবে, তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি বলেছেন, রুশরা নিজেদের ভাল বোঝে—সে তো ভাল কথা। তাদের স্বার্থের সঙ্গে যে ফ্রান্সের ভাগ্য জড়িয়ে আছে।'

'মসিয়ে তাহলে তাতারদের সঙ্গেই ভিড়ে পড়ুন।' লাঁসিয়ে ক্ষেপে গেলেন। 'আমরা এ অপরাধ কখনো ক্ষমা করবো না। আমরা বার্লিনে পৌঁছেই থামব না, মস্কোতেও যাব।...'

'আপনার উপর রাগ করাও চলেনা মসিয়ে লাঁসিয়ে, আপনি কিছু বোঝেন না, বুঝতেও চান না। পারী সোয়েরে যে সব বাজে লেখা বেরোয় সে গুলিই ওগড়ানো আপনার স্বভাব।'

বারান্দায় মিলেৎ লেজ্যাঁকে থামাল:

"আঁরি তোমার সঙ্গে কথা আছে। এঁরা পার্টির এই নীতি বুঝতে পারছেনা! তুমি কি বিশ্বাস করবে, ওরা যত সব বাজে কথা বলছে। থেলমান্ নাকি হিটলারের দলে ভিড়েছেন। আমি ওদের বলেছি, ওরা বোকা তাই একথা বিশ্বাস করছে। কিন্তু তাতে হবে না, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—পারছ না?"

মিলেৎ বাইশ বছরের ছোকরা, দেখতে সতের বছরের বেশী বলে মনে হয় না, রোগা, সব সময় উৎসাহে যেন টগবগ করে ফুটছে। দেয়ালে বিজ্ঞাপন আঁটা, স্পেনবাসীদের জন্য চাঁদা তোলা, অথবা ব্লাঁ আর আমাদের পথ যে আলাদা—একথা জেফকে বোঝানো—যা কিছু করুক না—সবটাতেই তার অফুরন্ত উৎসাহ।

'ফ্যাসিস্টরা—ফ্যাসিস্টই—একথা ওদের বুঝিয়ে দিও'—লেজ্যাঁ উত্তর দিলে, 'ওরা কখনো থেলমানকে ছেড়ে দেবে না, কিছুতেই না। যদি ফরাসীরা মন দিয়ে লড়ে—তাহলে রুশরা তাহাদের সাহায্য করবে। স্পেনের ওদের কে সাহায্য করেছিল...? সরকার হ্যুমানিতেকে চেপে দিয়েছেন,

কিন্তু হয়ে দুই পারতুঁত, এখনো নির্বিঘ্নে বেরুচ্ছে জার্মানীর টাকায়…তাতেই মনে হয় ওরা হিটলারের সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবেও না। ওরা লড়াই করবে, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে।'

মিলেৎ জোরে লেজাঁর হাত ধরে ঝাকুনি দিল।

হাঁ, এই তো চাই। তুমি আমার কাঁধ থেকে ভারি একটা বোঝা যেন নামিয়ে দিলে…। আমার বুড়ো মা আছেন…তিনিও আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন; শুধু বলেন, কি করে তোরা ঐ জার্মানগুলোর দলে ভিড়লি ?…অবশ্য, আমি বেশ বুঝতে পারি, পার্টি কখনো হিটলারের সঙ্গে ভিড়বে না, আর সেই কথাই আমি ওদের বলেছি…আঁরি, এতে আমাদের দমাতে পারবে না—তুমি জান আঁরি, আমার কি ইচ্ছে করে…একবার এক মিনিটের জন্য ক্রেমলিনে গিয়ে শুনি, স্তালিন কি বলছেন। আমার কথা বুঝতে পারছ কি ?…'

'সন্ধ্যে হবার পরই নিভেল এল লাঁসিয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

'খবর না দিয়ে এসে পড়লাম বলে ক্ষমা করবেন—। আমি কর্তব্য মনে করেই এসেছি। পুলিশ দপ্তরে শুনলাম, যাদের আটক করা হবে তাদের তালিকায় লেজাঁর নামও আছে। আমি এটা ঠিক কি বেঠিক তা নিয়ে তর্ক করব না, আমি জানি রোস্-আইনের পক্ষে সে কত প্রয়োজনীয়, তাই আপনাকে জানালাম। আপনি যাতে হঠাৎ বিপদে না পড়েন, তাই আগে বলা…।'

মার্সেলিন রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন :

'হা, ঈশ্বর, এর মানে কি ? ওরা না জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করবে, তা না আমাদের দেশের লোকদের ধরেই জেলে পুরছে ! লেজাঁ গোয়েন্দা, একথা কখনোই আমি বিশ্বাস করতে পারব না। তার নিজের কতকগুলো ভাবধারা থাকতে পারে, কিন্তু সে লোক খুবই ভালো।'

নিভেল উত্তর দিলে :

'মসিয়ে লেজাঁ যে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে কারো সন্দেহ আছে বলে আমার মনে হয় না। না, না, কথাটা তা নয়—কথাটা হচ্ছে ফ্রান্সের নিরাপত্তার সঙ্গে তাঁর ভাবধারা খাপ খায় কিনা ? তা ছাড়া এসব প্রশ্নের

সমাধান আমি করছি না, দালাদিয়েরের নীতির সমর্থন করতেও আমি বসি নি। আমি শুধু বন্ধুভাবে আপনাদের সাবধান করে দিলাম—।'

নিভেল বেরিয়ে পড়ল। টর্চের আলো ফেলে সে পথ দেখে চলছিল, এমন সময় মাদোর সঙ্গে দেখা। মাদো তাকে কোনো সম্ভাষণ না করেই মোড়ে মিলিয়ে গেল। সে তখন ব্যস্ত, তার প্রতি মুহূর্ত মূল্যবান। নিজের কথা, নিজের লক্ষ্যহীন জীবনের কথা ভাববার তার সময় নেই। তার অস্তিত্বের মূল্য কি সে জেনেছে অন্তত এক ঘণ্টার জন্যও সে জেনেছে।...

জোসেৎ দরজা খুলে দিলে। মাদো মুহূর্তে বুঝতে পারল: তার দেরী হয়ে গেছে। মেঝেয় বইপত্র, কাপড়-চোপড় আর বালিস ছড়ানো।

"ভেবেছিলাম, সময় থাকতে আপনাদের সাবধান করে দেব..."

জোসেৎ হঠাৎ ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। এ সোহাগ স্বাভাবিক তো নয়, তাই বুঝি মাদোর চোখে জল দেখা দিল।

"ওরা ওকে ছ'টার সময় ধরে নিয়ে গেছে। গোছাবার আর সময় পাই নি।"

পল মাদোর হাত ধরে বললো:

'কমরেড, ধন্যবাদ।'

মাদো বাড়ী ফিরে শুনলো তার বাবা তখনো গর্জাচ্ছেন:

শুধু রোস্ আইনের যে কি ক্ষতিই হোল! সব কিছুর ভারই তো ওর উপরে ছিল।...আর লোকটাও ছিল খুবই ভালো। কাল ওর সঙ্গে তর্ক করতে করতে গরম হয়ে উঠেছিলাম...সত্যি, সবাই কেমন যেন পাগল হয়ে গেছে। ওরা মজুরদের ওপর হামলা চালাতে চায় কেন? আমাদের নিজেদের ভিতরে তো এককোঁটা মিল নেই।...কিন্তু জার্মানরা দেখ তো—হিটলারকে অনুসরণ করছে।...ওদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য আমাদের আছে, কিন্তু তবু এক ভীষণ পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। হাঁ, এ বিপদ ফ্রান্সের পক্ষে ভয়ংকর। আমি লেজাঁর জন্য সত্যিই দুঃখিত।'

লঁাসিয়ে অবাক হয়ে গেলেন, মাদো তাঁর কথায় প্রতিবাদ জানালো:

'তার মতো মানুষকে করুণা করা যায় না, তাঁর উপর ঈর্ষাই হয়...তাঁর মত মানুষের আছে বিশ্বাস, আর তাঁরা সে বিশ্বাসে অন্যকে প্রভাবিত করেন। কিন্তু আমাদের কি হবে? সব কিছুতেই তো আমাদের ভয়, আর আমাদের

তো কোনো কিছুর উপরই বিশ্বাস নেই···।' তার মনে পড়ল, পল তাকে 'কমরেড' বলেছিল, লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো মাদো।

নিভেল পুলিস দপ্তরের লম্বা বারান্দায় পায়চারি করছিল, হঠাৎ লেঁজার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। লেঁজা তখন পুলিশের হেফাজতে। সে বিদ্রূপভরেই সম্ভাষণ জানালো :

'কি, মঁসিয়ে নিভেল, আপনি যে আমাকে চিনতেও পারছেন না ?'

'আমি বড়ই দুঃখিত···। অন্ধকার···' হঠাৎ রেগে গিয়েই সে বললে, 'দেখলেন তো আপনার রুশরা কি করলো ?'

'কিন্তু এখন রুশরাই ফ্রান্সকে বাঁচাবে।'

যেদিন থেকে যুদ্ধ শুরু হয়, নিভেল ডায়েরী রাখছে ; এই দুর্যোগের অভিজ্ঞতার দলিল সে রাখতে চায়। নিজের জন্য না হোক, অপরের জন্য তো এর প্রয়োজন আছে। লেঁজার সঙ্গে দেখা হবার পর সে ডায়েরীতে লিখল :

"সীমান্তে এখন সব চুপচাপ। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়েছে ঘরে। লেঁজা বন্দী, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু মোটেই তা প্রীতিকর হয়নি। আমি জানি, কমিউনিস্টরা জাতির গণ্ডীর বাইরে। কিন্তু তবু নিরাশা দেখা দেয়, মুক্তির কোনো পথ খুঁজে মেলে না। জানি না, এই যুদ্ধে কাদের লাভ হবে। আমাদের তো নয়ই, জার্মানদেরও নয়। কিন্তু এখন আর বিচারের সময় নেই। হিটলার তার পথ বেছে নিয়েছে, সে এজন্য যা কিছু করতে রাজি। বলশেভিকদের সঙ্গে শেষে কিনা চুক্তি করে ফেলল! ওর অন্ধতা আমাকে অবাক করে দেয়। ও একজন জুয়াড়ী, জুয়ো খেলার টেবিলে সবকিছু বাজি রাখতে রাজি—আত্মীয়-স্বজন, দেশ, নিজের সম্মান—সব কিছু। যদি হারে আত্মহত্যা করে সব হাঙামা চুকিয়ে দেবে। এক জোড়া তাস, একটা নিষ্প্রভ নিবু নিবু মোম, ক্ষয় হয়ে তার শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে। এদিকে ভোর হয়ে এল—ধ্বংসের স্তূপ চারদিকে—ইওরোপের এই তো সমাপ্তির ছবি। আমার মনে পড়ছে শার্কের সঙ্গে সেই কথাবার্তা—সে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐক্যের কথা বলছিল। হয়তো শার্কে এখন জার্মান বাহিনীতে, আমাদের সীমান্তেই সে হয়ত এসে গেছে···। আমরা আজ লড়ছি পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয়ের জন্য, তাদের হ্বাইমারের জন্য নাৎসী-কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের

বিরুদ্ধে। কালই আমি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার জন্ত দরখাস্ত দেব, আমি সীমান্তে যেতে চাই। দপ্তর থেকে ওখানকার গর্তে জীবন অনেক সহজ, সরল। এখানকার পরিস্থিতি মনকে দমিয়ে দেয়; হতাশা আনে। সারা ইওরোপ এই নগরীর মতোই আজ নিষ্প্রদীপ, মনের প্রদীপও নিবে গেছে। অপহৃতা পার্সেফোন কাঁদছে, বোমা-প্রতিরোধকারী আশ্রয়ে, তার কান্না মানুষের ভাষায় রূপ দেব সে শক্তি তো আমার নেই।…"

সে শুয়ে পড়বে ভাবল, কিন্তু মত বদলে গেল, পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। কথা যেন উড়ছে তার সামনে, ঘূর্ণি তুলেছে, তাদের সে ধরতে চায়, কিন্তু ধরা তো যায় না, তারা মুঠো এড়িয়ে যায় বার বার। এক একটা ছত্র ভাঙা ঠুটো ডালের মতো ঝুলতে থাকে। তারপর অন্ধকার, ফাঁকা পৃথিবী ঘোর নিনাদে ভরে ওঠে। নিভেলের মনে শব্দের ভিড় জমছে, ধ্বনির তরঙ্গ উঠছে, তাদের কূজন আর দোলায় মন ভরে গেল। সে ভোর অবধি লিখল, তার মনে হোল এমন প্রেরণা লিখতে গিয়ে সে কখনো পায় নি।

অবশেষে এল দিন…। সে দাড়ি কামিয়ে বাইরে যাবার জন্ত তৈরী হোল। যা লিখেছে তা পড়তে সে চাইল, কিন্তু কেন যেন বাধা এসে দেখা দিল। শেষে সে পড়ে গেল তার লেখা। কি বাজে লেখা—সব যেন টেনে-বুনে আনা হয়েছে! ধ্বনি নেই, নেই মনের রং…। এখন হয়তো কবিতা লেখা যায় না। পাতলা কাগজগুলো সে দুমড়ে তালগোল পাকাল, হঠাৎ তার মনে পড়ল লেজ'ার সেই বিদ্রূপ সম্ভাষণ—সেই পুলিশ দপ্তরের আবছায়া-ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে বলেছিল। রাগে বিকৃত হয়ে গেল মুখখানা। হাঁ, এখন আমরা লড়ব, আর মসিয়ে লেঁজা তোমাদের দেব হারিয়ে!

## বিশ

বাদানুবাদের ঝড় বয়ে গেল সভায়। সার্জির প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করল বেলচেভ। সে জোর দিয়েই বললে, 'কমরেড ভ্লাকভ বাস্তববাদী নন, তাই তিনি গঠনের সম্ভাবনাকে অতিরঞ্জিত করেই দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি

পুরানো পদ্ধতির পাকে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তাই স্থানীয় সামর্থ্য কতটুকু সে কথা ভুলে গেছেন।' অবশেষে সে জানাল, 'কমরেড গ্রিগরিয়েভ্‌ই এ বিষয়ে ঠিক কথা বলেছেন'। বেলচেভ্‌ বেশ উত্তেজিত হয়েই বলল, তার কথা যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়েই বলছে, অথচ কালও সে সার্জির সঙ্গে একমতই পোষণ করত। গ্রিগরিয়েভ-এর বক্তৃতা তাকে বদলে দিয়েছে। সে সব সময়েই এমনি; ওপরওলাদের কারো কথা শুনলেই হয়, সে অমনি কাল বা একঘণ্টা আগে যা বলেছে, একেবারেই ভুলে যাবে। সার্জির কথা সে আমোলই দিলে না: "গ্রিগরিয়েভ যখন বলেছেন, তখন তা ঠিকই হবে…" কিন্তু সার্জি একগুঁয়ে। তার পরিকল্পনাটা আবার খতিয়ে দেখাই সাব্যস্ত হল। মনে মনে সার্জি বেলচেভ্‌কে গাল দিলে, কিন্তু খুশিই হল, যে সভায় খানিকটা ফল হয়েছে।

অক্টোবরের উজ্জ্বল সূর্যাস্ত। বুলেভারে ছেলেমেয়েরা খেলছে, দম্পতিরা বেড়াচ্ছে। রঙীন একখানা রুমাল-বাঁধা একটি স্ত্রীলোক লালফৌজের একজন সৈনিককে বলছিল, 'কি চমৎকার ক'টা গেলাস কিনেছি…এত পাতলা…।' ফুরফুরে হাওয়া, আকাশে হাল্‌কা রঙের খেলা। সার্জি মনে মনে ভাবল, কি আনন্দ আমাদের! আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়িনি!…সে মনে মনে নিষ্প্রদীপ পারীর ছবি আঁকতে গেল, কিন্তু পারল না—তার স্মৃতিতে আনন্দচঞ্চল পারীর আলো ঝলসে উঠলো।

আর মাদো?…কি হোল তার? বিষণ্ণ মনে সে ধপ্‌ করে বসে পড়ল একটা ফাঁকা বেঞ্চে, চোখ বুজে এল। মাদো তার দিকে এগিয়ে আসছে, পরণে তার সবুজ পোষাক, মুখে হাসি…।' না, তাকে আর খুঁজে পাবে না। একটা চিঠিও তো পায় নি…। তাদের দুজনের মাঝখানে এখন যুদ্ধ। পারী মিলিয়ে গেছে, যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে, ঢেকে গেছে খবর, বিজ্ঞপ্তি আর ইশ্‌তেহারের আড়ালে। কোথায় এখন মাদো, কোথায়?…একথা সত্যি—ভাগ্যের সঙ্গে লুকোচুরি চলে না…

কখনো কখনো সার্জির মনে হয়, সে মাদোকে ভুলে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে তো স্বস্তি নেই, বরং ভয় আছে। মনে হয়, নিজেকেই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। তারপর বিষাদ এসে চেপে বসে মনে, একটু আত্মস্থ হয়। তার নিজের উপর অভিযোগের অন্ত নেই—সে চঞ্চল, চপল তার স্বভাব। কিন্তু

এ অভিযোগ তো মিথ্যে—সে আনন্দ পেতে পারে, চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে আনন্দে, তবু তো মাদো বেঁচে থাকবে তার আত্মার গভীরে।

মস্কৌর জীবনের ঘূর্ণিতে সে ডুবে গেছে, প্রতিটি ছোট ঘটনা তার মনে রোমাঞ্চ নিয়ে আসছে। বুলেভারের বেঞ্চিতে বসে সে বেলচেভের সঙ্গে মনে মনে তর্কে মেতে উঠল। নির্দ্ধারিত উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় কেন?... গ্রিগরিয়েভ্ কর্মী হিসেবে ভালো, কিন্তু সে তো ভুলও করতে পারে। আর বেলচেভ্ তোতা পাখীর মত সে যা বলেছে তাই আউড়ে গেল...। এই তো গত বছরও এখানে ছিল একটা যেমন-তেমন মাথা গোঁজবার ঠাঁই, এখন দেখ ওরা কি তৈরী করেছে! মস্কো এখন আরো সুন্দর। পশ্চিমের ওরা বিশ্বাস করতেই চায় না যে আমরাও গড়ার পালা শুরু করে দিয়েছি। তারা কিছুই বিশ্বাস করে না। তারা চায় আঘাত এসে পড়ুক আমাদের উপর। কিন্তু জার্মানদের হাত থেকে নিজেদের কি করে তারা রক্ষা করবে? চেম্বারলেন সাহেবের ছাতা দিয়ে? ওরা তো হিটলারের পতন চায় না, চায় আমাদের। নিভেলের কথা শুনলেই তা বেশ বোঝা যায়...যদি আমরা আর কয়েকটা বছর সময় পাই...গ্রিগরিয়েভ ধরাবাঁধা নীতি অনুসারেই বিচার করে। সেই সেকেলে পদ্ধতিই আঁকড়ে ধরে আছে।...হাঁ, জার্মানরা এক ভয়ংকর শক্তি, কিন্তু এখন তো তাদের ঠেকানো সোজা—আমাদের সীমান্ত আমরা দূরে সরিয়ে দিয়েছি··

তার মনে পড়ল পোলাণ্ডের প্রান্তরের কথা। এখন সেখানে ছাই আর রক্ত...পারীর কি হবে? বাদাম গাছের তলায় সেই বেঞ্চি...না, মাদোকে পারী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না...। সে কি আবার তাকে নিয়ে সেই বেঞ্চিতে বসতে পারবে? না, আর সেদিন আসবে না!...

দুটি লম্বা মেয়ে বসে আছে ওর পাশে, রোদ-পোড়া তামাটে তাদের মুখ। একজন অপরাকে হেসে হেসে বললো, "ও ব্যাপারটা দেখেই এবার সুর বদলালো..." সার্জি হাসলো। মেয়ে দুটি চলে গেছে। যে হাসছিল সে ওলিয়ার মত দেখতে..., ওলগা বেশ মেয়ে, কিন্তু এখনো সে ভারি খুদে, ওর পাকা বিষয়বুদ্ধি দেখে হাসি পায়, ছেলেমানষিই মনে হয়। মার ডাক্তার দেখানো উচিত, বড় খারাপ হয়ে গেছে শরীর...তাসিয়া কেমন আছে? ঘুরে ঘুরে কেমন লাগছে তার?...

সার্জি ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে পাজি ছেলেদের মতো ট্রামে লাফিয়ে উঠে পড়লো।

লাবাজভরা বিয়ের ভোজের আয়োজন করেছে, গৃহপ্রবেশের উৎসবও একই সঙ্গে হবে। ওলগা জেদ ধরেছিল ভাসিয়া ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—ও একটা কাজে বাইরে গেছে। আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সে তার স্কুলের বন্ধু নাতাশা ক্রিয়োলভাকে নিমন্ত্রণ করলো, আর লাবাজভ করলো সম্পাদকীয় বিভাগের দুজনকে—একজন সহ-সম্পাদক পেত্রিয়া ভ্রজদভ্ আর একজন পররাষ্ট্র ব্যাপারে অভিজ্ঞ ষাট বছরের জামকভ্।

প্রথমে গৃহস্বামী অতিথিদের সারা ফ্লাটটা ঘুরিয়ে আনলো। ছোট্ট ফ্লাট, দুটি মাত্র ঘর কিন্তু সেমিয়ন আইভানোভিচ ঘুরে ঘুরে প্রতিটি খুঁটিনাটি দেখালো। পায়খানার কাছে এসে প্রায় ফিসফিসিয়েই সে বললো, "এইটে কি, আপনারা তো বুঝতেই পারছেন"।

লাবাজভের বয়স বত্রিশ; মোটাসোটা মানুষটি, রঙে ঔজ্জ্বল্য নেই, কেমন অস্বাস্থ্যকর ফ্যাকাসে ভাব। বয়স অনুপাতে একটু বুড়োই তাকে দেখায়, আর সব সময়েই মনে হয়, যেন এই ঘুম থেকে উঠে এল। চোখ দুটি তার ক্ষুদে, কাউকে বুদ্ধির লড়াইয়ে হারাতে পেরেছে, এমনি মনে হলেই সে চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। দু বছর আগে সে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছে, তার আগে সে কাজ করত ট্রেড ইউনিয়ন আফিসে। সংবাদপত্রের কাজ তার পছন্দ নয়, কিন্তু তাই বলে কাজে গাফিলতি নেই, অদম্য উৎসাহ নিয়েই কাজ করে। যাতে দশবার সে প্রুফ দেখে, প্রতিবারেই প্রুফে 'সন্দেহজনক' কিছু সে খুঁজে পাবেই। একটা নতুন উপমা, কি অপ্রচলিত বিশেষণ পেলেই হোল, তখনই সে উত্তেজিত হয়ে মুঠোয় চেপে ধরবে লাল পেন্সিল।

তার দপ্তরের লোকদের সে বলে, "ভুল এড়িয়ে চলাই হচ্ছে কৌশল", আর ওলগার কাছে সে স্বীকার করতে দ্বিধা করে না, "সবই ঠিক আছে মনে হবে, তার পরে হঠাৎ...। এর থেকে মাঠে একটা বোলতা ধরা বুঝি সহজ!" নিজের পদ নিয়ে সে সন্তুষ্ট, তাই সে পেত্রিয়া ভ্রজদভের উপরে চটা। ছোকরা ঠেলেঠুলে এগিয়ে যেতে চায়...সে চটে উঠে বলে..."তোমার এই এগিয়ে চলার মজাটি টের পাবে—যখন চলতে গিয়ে ঘাড় মটকে যাবে!"

ছোট্ট ফ্লাট, আসবাবপত্রে ভর্তি—যেন পুরনো জিনিষের দোকান আর

কি! সেমিয়ন আইভানোভিচ বেশ জাঁক করেই অতিথিদের রেডিও, মেহগনি কাঠের খাট, ডজন খানেক সিল্কের বালিস জড়ানো কাউচ, গোলকের আকারের ব্রোঞ্জের ঘড়ী দেখাল।

সার্জি বোনকে বললো:

"ইস্, কতগুলো ফুলদানি আমদানী করেছ! আমার তো চীনে মাটির বাসনের দোকানে ষাঁড় ঢুক পড়লে যেমনটি হয়, তেমনি অবস্থা…!"

ওলগা হেসে বললো:

"কিছু ভাঙলেও ক্ষতি নেই। শুধু গেলাসগুলো ভেঙো না। ওগুলো খুব বেশি নেই…।"

"আমার এসব কিছুই ছিল না," সেমিওন ইভানোভিচ বললো, "কিন্তু কি সময় দেখতে হবে তো—সবাই জিনিষপত্র কিনছে—তাছাড়া আমরা যখন ঘর বাঁধছি…"

ভাসিয়া এমনি কম কথা বলে, কিন্তু সে হঠাৎ ফোড়ন দিলে, নিনা জর্জিয়েভনার মনে হোলো কথাটা খুব সঙ্গত হয়নি।

"এইসব জঞ্জাল আমি পছন্দ করিনে। এগুলো না থাকলেই নিজেকে বেশ হাল্‌কা মনে হয়।"

ভোজের আয়োজন বেশ জমকালো। মাংস, কাঁকড়া, স্যালাদ, স্যামন, সবই আছে। স্যামনের রংটিও চমৎকার, বিয়ের ভোজেরই একান্ত উপযোগী। একটা শুয়োর ছানাও আছে, সেটা আবার কাগজের গোলাপ দিয়ে সাজানো। তারপর এলো বিয়ের কেক, এমন তার জৌলুষ যে স্যামন আর কাগজের গোলাপ যেন মিইয়ে গেল। তার পরে ভোদ্‌কা, চার রকমের মদ আর শাম্পেন তো আছেই। সেমিয়ন ইভানোভিচ খেলেও প্রচুর, গোগ্রাসে যেন সে গিললো, কিন্তু মনে হোলো যেন তৃপ্তি সে পাচ্ছে না, একটা কর্তব্য সারছে মাত্র। কিন্তু ওলগা খেল আস্তে আস্তে, প্রতিটি জিনিস সে তারিয়ে তারিয়ে খেল। পেতিয়ারও পেট টৈটুম্বুর, তার উপরে নেশাও হয়েছে মন্দ নয়, তবু ওলগার তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার ছোঁয়াচ তাকেও লাগলো। তাই কেকের পর, সে আবার শুয়োরছানার দিকে নজর দিলো। জামকভ নিস্পৃহ, সে যেন আফিসের ভোজনাগারে বসে খাচ্ছে। ভাসিয়া সামান্যই মদ খেয়েছে, তবু সে উৎফুল্লই হয়ে উঠলো, নাতাশা তার পাশে বসেছিল, তাকে সে বললো, সে

সার্কাসে গিয়ে এক সম্মোহনবিদকে দেখেছিল। সে বলছিল, সে নাকি মানুষের মনে কি ঘটছে দেখতে পাবে। একজন সম্মোহনবিদের ঘড়ীটা চুরি করে নিল, তখনই সে চেঁচিয়ে উঠলো: "পুলিশ পুলিশ!" তখন দর্শকদের ভিতর থেকে একজন উত্তর দিলে, "মানুষের মন যদি তুমি দেখতে পাও, তাহলে পুলিশের খোঁজ করছ কেন?" নাতাশা এমন হাসতে লাগল, যে সবাই এমন কি জামকভও না হেসে পারল না। সম্মোহনবিদের গল্প কিন্তু ওরা কেউ শোনেইনি।

এবার সবাই সার্জিকে অনুরোধ করলে, পারীর কথা বলতে হবে। তারা মন দিয়ে শুনলো, কিন্তু নিরাসক্ত হয়ে। সে যেন তাদের কাছে মধ্যযুগের রীতিনীতির অথবা গ্রহ-উপগ্রহের কথাই বলছে। শুধু নিনা জর্জিয়েভনাই অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে চাইলেন, পারীতে সার্জির কি হয়েছিল। জামকভ তার নোট বই বার করে জিজ্ঞেস করলেন।

"আজকাল জঁাদরেল পুঁজিবাদীরা কাকে সমর্থন করছে?"

নাতাশার ভারি মজা লাগলো, ওরা শীতের দিনে কাফের ছাদে অগ্নিকুণ্ড এনে রাখে। সে হেসেই বললে, "ওরা বুঝি ওই ভাবে পথ গরম রাখে—ভারি অদ্ভুত না ওরা!'

ভাসিয়া জানতে চাইল যুদ্ধের আগে পারীর বাড়ী সংখ্যা কত ছিল? সে স্থপতি, সে ভবিষ্যতের নগরগুলির স্বপ্নে মসগুল—সাদা, সবুজ আর নিরালা বাড়ীর সার সেখানে। এবার সে বললে:

"মিনস্ক্ দেখে চিনতেই পারবে না। একেবারে খাঁটি ইউরোপের নগর—"

সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠলো। সার্জির মনে হোলো, মিনস্ক্ সে দেখেনি বটে, তবু পারীর থেকে তার আকর্ষণ যেন ঢের বেশি। একটি তো স্বপ্ন, সে স্বপ্ন যদিও সুন্দর—আর একটি জীবন, ঐ বলিষ্ঠ ভাসিয়ার গম্ভীর স্বরের মতো, নাতাশার হাসি আর জামকভের কর্কশ স্বরের মতো। মিনস্কের বাড়ীগুলি, আর তার নিজের পরিকল্পনার ওপর যাই বলো না, গ্রিগরিয়েভ-এরই ভুল হয়েছে! আরো হাজারো ব্যাপারের উপর নির্ভর করছে এখানকার এই টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসা প্রতিটি মানুষের ভাগ্য।

ভাসিয়া এবার স্কুলের কথা পাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তার ধারা ঘুরে গেল স্থাপত্য থেকে শিক্ষার দিকে।

"ওরা ছেলেপুলেগুলোকে আস্কারা দিয়ে শাসনের বাইরে নিয়ে গেছে," লাবাজভ বললো, "আমার বাবা ছেলেবেলায় আমাকে পেটাতেন, তাতে আমার কোনো ক্ষতিই হয়নি।"

লিনা জর্জিয়েভনা চটে গেলেন :

"ঐ কথা যদি বল, তাহলে যখন 'ভাল গৃহস্থের কথা' লেখা হয়েছিল, সেই যুগে ফিরে গেলেই হয়। মাস্টারদের কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার, ওদের তো শিক্ষাদীক্ষার বালাই নেই। ছোট ছেলেমেয়েরা হচ্ছে চাড়া গাছ, তারা যে কোনো মুহূর্তেই ভেঙে যেতে পারে—"

সেমিয়ন ইভানোভিচ রেডিয়ো খুলে দিলে।

'দুনিয়ায় কি ঘটছে শোনা যাক্—'

ঘোষণাকারী বলতে লাগলেন বারানোভিচির সভার কথা, তারপর বিরাট ওজনের এক কুমড়োর কথা পাড়লেন। এত তার উৎসাহ আর উত্তেজনা যে তিনি নিজেই যেন সেই কুমড়োটা ফলিয়েছেন আর তাতে সারা দুনিয়া উদ্ধার হয়ে গেছে…'এবার আমরা বিদেশের খবর শোনাব'…ঘোষণাকারী এবার গুণতে শুরু করলেন, জার্মানরা আজ ক'খানা জাহাজ ডুবিয়েছে।

লাভাজভ ঠাট্টার সুরে বললো :

'খুব একচোট দেখাচ্ছে। যাই বলুন, ওরা লড়তে জানে, একথা না মেনে উপায় নেই—'

সার্জি রেগে উঠলো। একথা সত্যি, জার্মানরা যুদ্ধ করতে জানে। আর চেম্বারলেন আর দালাদিয়েরের কাছ থেকে কিছু আশা করাও বৃথা…কিন্তু লাবাজভ এত খুশি কেন?…

'ফ্যাসিস্টদের এই জয়ে আমাদের অত খুশি হবার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করিনে।'

'হেঁ হেঁ, আপনার ঐ শব্দটা একটু সেকেলে।' সেমিয়ন ইভানোভিচ যখন অফিসে লাল পেন্সিল মুঠোয় চেপে ধরে, তখন এমনি 'হেঁ হেঁ' করে।

'আমি রাজনীতিজ্ঞ নই—কিন্তু কালো কালোই, তার—'

'এখন—আমাদের এই সময়ে…' জামকভ-এর কর্কশ স্বর বেজে উঠলো,

'এই সেদিন খাদ্য সমিতির এক সভায় বক্তৃতা শুনলাম বক্তা সমস্যাটা নতুন-ভাবে এনে হাজির করলেন··· ।'

'বক্তাদেরও ভুল হতে পারে। জার্মানীর অবস্থা আমি জানিনে, আসার সময় শুধু জার্মানীর ভিতর দিয়ে এলাম। কিন্তু পারীতে একটি জার্মান কমিউনিস্ট মহিলার সঙ্গে দেখা হোলো···'

তারপর আনার দুঃখের কথা বললো সার্জি।

'পাজির দল!' নাতাশা চেঁচিয়ে উঠলো।

নিনা জর্জিয়েভনার চোখ জলে ভরে গেল। ভাসিয়া বললে :

'আজই হোক, কালই হোক ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বাঁধবে। পরে বাঁধাই ভাল, আমরা ততদিনে তৈরী হয়ে নেব··'

পেতিয়া ব্রজদন্ড কিছু বলবার জন্য হাঁসফাঁস করছিল। সবাই ভাবল সে বুঝি এবার আগুনে তেল ঢালবে, কিন্তু সে শুধু বললো :

'জানেন আজকাল জার্মানদের সবাই কি বলছে? আমাদের ভয়ংকর মিত্র।'

সবাই কথাটা শুনে হাসলো। সেমিয়ন ইভানোভিচ এবার গ্রামোফোনটা চালিয়ে দিল। পেতিয়া নাচলো ওলগার সঙ্গে, আর ভাসিয়ার সঙ্গে নাতাশা।

'ফরাসীর মেয়েরা দেখতে কেমন—সুশ্রী?' লাবাজভ সার্জিকে জিজ্ঞেস করলো।

সার্জি হাসলো :

'সব রকমই আছে। তাছাড়া এটা হচ্ছে নিজের রুচির ব্যাপার···' পেতিয়ার মুখে ভাবালুতাভরা হাসি :

'সিনেমা দেখে বিচার করতে গেলে কিন্তু ওরা খুবই সুশ্রী···তবে আমার মনে হয় ওদের পাওয়া সহজ। টাকা দিয়ে ওদের কেনা যায়।'···

সার্জি কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। নিনা জর্জিয়েভনা দেখলেন, সার্জির ভ্রূ কুঁচকে গেছে, তাঁর তাই যেন মনে হোলো। হঠাৎ সেমিয়ন ইভানোভিচ জোরে হেসে উঠলো :

'এদেশেও বহু মেয়ে পাওয়া যায় যাদের কেনা যায়···'

একটা বিশ্রী নীরবতা নেমে এসেছে। লোকটা একেবারে বাজে···সার্জির মনে হোলো। নাতাশা একখানা খবরের কাগজ নিয়ে পড়বার ভাণ করছে। ওলগা রান্নাঘর থেকে একটা চায়ের পট নিয়ে এল।

'এখন চা খাওয়া যাক।'

জামকভ একটু জ্যাম নিলেন, চামচেটা চাটতে চাটতে বললেন :

'চমৎকার ঘর বেঁধেছেন সেমিয়ন ইভানোচিভ। আর স্ত্রীও পেয়েছেন চমৎকার। এই তো সবচেয়ে বড় সুখ। আপনি নিজে হয়ত আজ এ সুখের তাৎপর্য কি বুঝতে পারছেন না।'

দু' বছর আগে জামকভ যার সঙ্গে ত্রিশ বছর ঘর করছিলেন, তাঁর সেই স্ত্রীকে হারিয়েছেন। আজ তিনি বড় অসহায় বোধ করেন। যখন কাজ করেন বা রাজনীতির আলোচনা করেন, তখনই তাকে প্রফুল্ল দেখা যায়। কিন্তু এখন ওলগাকে চা ঢালতে দেখে, তার প্রফুল্লতা উবে গেল, হঠাৎ যেন আরো বুড়িয়ে গেলেন। বিড় বিড় করে বললেন :

'হাঁ—এ এক মস্ত সুখ—'

লাবাজভ উত্তর দিলে :

"হাঁ, যে রকমটি হওয়া উচিত তেমনি স্ত্রীই বটে···বড়ই আফশোস হচ্ছে আগেই ছুটি নিয়ে ফেলেছি···সামনের গ্রীষ্মে আমরা সোচি যাচ্ছি···ওলগার খুব ইচ্ছে কিনা, তাই না ওলিয়া ?'

ওলগা উত্তর দিলে না। লাবাজভ বলতে লাগল :

"আমার কথা যদি বলেন আমার পছন্দ একটু আলাদা—বেশ নিরিবিলি জায়গাটি হবে, সঙ্গে থাকবে ছিপ···আমার রাতের কাজ···দায়ীত্বও খুব—ভুল হওয়াও খুব সহজ···তাতে স্নায়ুতন্ত্রের উপর যথেষ্টই চোট পড়ে···কিন্তু যদি ছিপ ফেলে বসা যায়···ভারি আরাম !···"

সার্জি হাসলো, না লোকটা খারাপ নয়···ওর ঐ ব্যক্তিত্বহীন মুখখানা দেখেই শুধু···

তাছাড়া ওলগাকে ও ভালবাসে···।

"আমি তো ওতে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি না," পেতিয়া বললে, "সারাদিন ধরে ঠায় এক জায়গায় বসে থাকা, তারপরে চুনোপুঁটি ধরে জাঁক করা।"

পেতিয়া বড় অস্থির, কথাও বেশি বলে, আর ওর মগজে আছে বড় বড় পরিকল্পনা। ছাব্বিশ বছর ওর বয়েস, এরই মধ্যে দু-দুবার বিয়ে আর বিবাহ-বিচ্ছেদ করে বসে আছে। ও প্রায়ই বাসা বদলায়, আর তার জন্যে কৌশলেরও অন্ত নেই, পেশা বদলানোও ওর স্বভাব। খবরের কাগজে কাজের আগে

ও কাঠের দপ্তরে কাজ করত, তার আগে ছিল চলচ্চিত্রের এক কারখানায়। প্রতি সপ্তাহেই ও কাগজটাকে একটু চাঙা করবার প্রস্তাব করে সেমিয়ন ইভানোভিচকে ভয় পাইয়ে দেয়। লাবাজভের তার শেষ প্রস্তাবের কথা মনে পড়ল, সে বললে :

'তুমি তো চুনোপুঁটিও ধরতে পারবে না। ও যা কথা বলে, মাছগুলো ভয় পেয়েই পালাবে। ও যেন এক ডায়নামো! কাল ও কি আমাকে বলেছিল শুনবেন? কাগজে এই এত বড় বড় শিরোনামা চালাতে? আমাদের কি বাজে খবরের কাগজ নাকি? ওর কথা শুনলে হয়েছিল আর কি…এ সবের কারণ ওর বড় হবার আশা…ঠেলে এগিয়ে যেতো ওকে হবেই…।'

"সবাই-ই তো এগিয়ে যেতে চায়…" পেতিয়া উত্তর দিলে, "আর এটা বড় হবার আশা নয়, এটা এক আবিষ্কারের নেশা বলতে পার ..."

"না, না ওসব চলবে না! এই তো আমি মোটাসোটা মানুষ, কিন্তু ছিপছিপে বলে ভাণ তো করিনে। আমাদের ফোটোগ্রাফারেরা বলে, যা কিছুরই ফোটো তোলা হোক, পেতিয়া সেখানে থাকবেই মনে ইচ্ছে, ওর ফোটোটাও উঠবে। আর বছর বসন্তকালে, অসুখে পড়লো, খিদে একেবারে ছিল না, কিছু খেতও না, ডাক্তার বললেন, পেটে আলসার হয়েছে, ওর পাঁচ কিলো ওজন কমে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কি?…আলসার-টালসার নয়. গুদালভ সম্মানের ব্যাজ পেয়েছিলেন, পেতিয়া তারই হিংসেয় অসুখে পড়লো। ওকে বহু কষ্টে টেনে তুলতে হোলো।"

"না, না গুদালভের ব্যাপার নয়! তবে আমার মনে কষ্ট যে হয়নি তা নয়, কিন্তু ব্যাজ ওর প্রাপ্য। আর শিরোনামার কথা যদি বলেন, সেটা অন্য ব্যাপার। ওর সঙ্গে বড় হবার আশার সম্বন্ধ কি? ওতে যে পুরস্কার পাবার আশা নেই, তা আমি ভাল করেই জানি। বরং বরখাস্ত হবার আশা আছে। কিন্তু আমি একবার অন্তত দুঃসাহসিক একটা কিছু করতে চাই! মায়াকোভ্‌স্কী লিখেছিলেন—আমাদের ঈশ্বর এই গতি, আমাদের হৃদয় তার বিষাণ।"

লাবাজভ বললো, সে কবিতা পড়ে তার কর্তব্য হিসেবে। সার্জি চুপ। নাতাশা ভীরুস্বরে জানালো, লারমান্তভ তার প্রিয় কবি। শুধু ভাসিয়াই সমর্থন করলো পেতিয়াকে :

"আমি কবিতা খুব বেশি পড়িনি—কিন্তু মায়াকোভ্স্কী—চমৎকার…!

গোল টেবিল, বড় একটা বাতি জ্বলছে। তারই নীচে বসে আর কি ওরা বলতে পারে?

পোগোজিনের নাটক, দাবা প্রতিযোগিতা, কৃষি প্রদর্শনীতে ভাল লেবু মেলে, ফ্ল্যাটের কথা, বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, আবার ছেলে মেয়ে—ওদের কি নম্র হতে শেখানো হবে না, আবার যুদ্ধ—ম্যাজিনো না সিগফ্রিড লাইন—কোনটা বেশি মজবুত—হাঁ, আর কি বলতে পারে ওরা? চারদিকে গভীর শান্তি, টেবিলের উপরে সুগন্ধি জ্যামের বয়েম রয়েছে, আর রয়েছে ওলগার শান্ত উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি—এখন আর কি বলা যায়? কেউ ওরা ভাবলো না, ভাবতে পারলো না যে, কোথাও এখন বোমা বাড়ীঘর ভেঙেচুরে দিচ্ছে—আর জাহাজডুবির পর যারা বাচলো, তারা নৌকোয়, ভেলায়, তক্তা আঁকড়ে ধরে বিরাট ঢেউয়ের মাঝখানে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল, এবার নীরবতা নেমে এসেছে। গোলক-আকৃতি ঘড়ীটার শব্দ এবার শোনা গেল। আস্তে আস্তে সে স্থিতির কাল আর ছন্দের কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

অতিথিরা চলে গেলেন। ওলগা নিঃশব্দে পরিষ্কার করে ফেললো ঘর। সেমিয়ন ইভানোভিচ কোট খুলে ফেললো, সার্টের বোতামও খোলা—এখন তাকে দেখে সেই গ্রাম্য লাবাজভ বলে মনে হয়, মাছ ধরতে যে ভালবাসে। তার মনটাও বেশ ভালো, সন্ধ্যাটা ভালোই উতরে গেছে। আর ওলগা—হাঁ, সেই তো মস্ত সুখ—জামকভ ঠিকই বলেছেন·· হঠাৎ ওলগা তার দিকে তাকিয়ে বললো:

"তোমার পদমর্যাদায় ভুলে আমি এসেছি, একথা মনে করলে ভুলই করবে। কালই আমি মার কাছে চলে যেতে পারি।"

"সে কি, তুমি যে নাটক করতে শুরু করলে?"

"তার কারণ, আমার বিরক্তি ধরে গেছে। তুমি হয়তো ভাবছ আমাকে তুমি কিনে নিয়েছ?"

ওলগাকে এই মুহূর্তে চেনা যায় না। তার উজ্জ্বল চোখ এখন কুটিল-কালো, তার সুন্দর ভাবলেশহীন মুখ কঠিন কঠোর। সে ফিসফিসিয়ে বললো:

"যদি তা ভেবে থাক, ভুল করেছ !..."

ওলগার এ ভাবান্তর সেমিয়ন ইভানোভিচের কাছে নতুন নয়। সে জানত, শুধু ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেই ওলগা চুপ করে যাবে, তখন সে হবে বড় অসহায়, নিজেকে সমর্পণ করবে। সে সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই ওলগার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো। ওলগা দূরে সরে গেল।

"আমাকে ছুঁয়োনা। আমি এখন ঘুমোব। আমাকে জাগালে ভালো হবে না!"

সে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিলে। সেমিয়ন ইভানোভিচ তার ফোলা গাল চুলকোতে লাগলো। মদও তো বেশি খায়নি...তবে? এমনিই মেজাজটা ওর খারাপ, কিন্তু সবার সামনে তো শান্তই ছিল। না, ওকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না—হয়তো সত্যিই ছেড়ে চলে যাবে...আর তারপর পেৎকা সারা শহরময় ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে...

ওলগার মনেও শান্তি নেই, কেন সে এল এই ফ্ল্যাটে? এখন ও ভাবছে, কিনে নিয়েছে?...ও যদি বাছাই করত, ইভানোভিচের থেকে ভাল কাউকে পেতই...সবচেয়ে সাংঘাতিক, এই যে লাবাজও ঠিকই বলেছে। টাকা দিয়ে সে অবশ্য কেনেনি, কিন্তু তবু ওকে কিনেছে.. এখন তো সে তার জেদ বজায় রাখলো, কিন্তু কাল কি হবে?.. সে এখন তার স্বামী, মাঝে মাঝে আগের মত দেখা করতে আসা তো নয়, তার সঙ্গে ঘর করতে হবে...বড় মুস্কিল. হাঁ বড়ই মুস্কিল। ওর থেকে আমি ভালো কাজ জানি, কিন্তু তবু আমি যে মেয়েমানুষ। আমি চাই সুখ, শান্তি আর তার জন্যই আমাকে দুঃখ সইতে হচ্ছে...

ভাসিয়া নাতাশাকে জিজ্ঞেস করলো সে কোথায় থাকে।

"চিস্তি স্ট্রীটে, ক্রোপোত্কিনস্কায়া থেকে বেরিয়েছে রাস্তাটা।"

"আমিও ঐ দিকেই যাচ্ছি...ঠিক ঐ দিকেই নয়, কিন্তু এমন রাতের পর একটু হাওয়ায় ঘুরলে ভালই লাগবে।"

নাতাশার পাশে সে নিঃশব্দে চলতে লাগলো। সবে পরশু সে ফিরেছে মিনস্ক থেকে, মস্কোর যা কিছু দেখছে ভাল লাগছে। পরিচিত পথঘাট, আলো, বিশেষ করে এই যে তার পাশে পাশে চলেছে নাতাশা, ওকে। কয়েকবার সে মনে মনে ভাবল, চমৎকার—চমৎকার মেয়ে!

নাতাশা হতাশ হয়ে গেছে। ও কিছু বলছে না কেন? আমাকে বাড়ি

পৌঁছে দিতে চাইল, অথচ কথাটি বলছে না—হয়তো ও ভাবছে আমি কিছুই বুঝব না। হাঁ, পার্টিতে যা-তা বকেছি বটে—শাম্পেন খেয়ে ধেই ধেই করে নেচেছি···নাতাশা মনে মনে নিজেকেই গাল দিলে: "আমার পেশাটাই বাজে, ওতে খুব কম লোকই আনন্দ পাবে।" হঠাৎ সে ঠিক করে ফেললো: "তা হোক না, ও জানুক নাচ ছাড়াও আমি কিছু করতে পারি!" কোনো ভূমিকা না করেই সে এবার অধ্যাপক বুভনভের গবেষণার কথা বলতে লাগলো: চাড়া গাছগুলি ক্ষিদেয় অস্থির—ওরা তো তেমন জল পায়না···যদি ওদের খাদ্য আর জলের বরাদ্দ বাড়িয়ে সুস্থ করে তোলা যায়, তাহলে সমস্ত পৃথিবী ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে · সে একটিবার থামলো না, অনর্গল বকতে বকতে বাড়ী পৌঁছে গেল। সঙ্গীর দিকে তাকাতেও তার ভয় হোলো—কি জানি, হয়তো সে তার কথা শুনে হাসছে। যেমন হঠাৎ শুরু করেছিল, তেমনি সে হঠাৎ চুপ করে গেল। ভাসিয়া বললে:

"ভারি চমৎকার তো আরো জানতে ইচ্ছে করে। আর আপনার বলার ধরণটিও চমৎকার।" সে আরো কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না; আর নাতাশা বুঝতে পারল, সে তাকে ঘৃণা করে না, কাপড়-চোপড় ছাড়বার সময় সে মনে মনে বললে: আমাকে ওঁর পছন্দ হয়েছে···। আবার তখনই নিজেকে ভৎর্সনা করলো: খবর্দার, ওসব কথা আর নয়। এবার চটপট বিছানায় শুয়ে পড়।···

শহরের ওপাশে তার বাড়িতে ফিরে গেল ভাসিয়া, মনে মনে হেসে বললে, চমৎকার মেয়ে! তবে চাড়া গাছ-পাগলা!···কিন্তু ভারি চমৎকার মেয়ে!

সার্জি নিনা জর্জিয়েভনাকে নিয়ে বাড়ি এল। তিনি বললেন,

"ওলিয়োচকা সুখী হয়েছে, হয় তো এই-ই ভালো—কোন উগ্র অনুভূতি নেই। যদিও আমি বুঝতে পারি না···কিন্তু ওলিয়া ভারি শান্ত মেয়ে, ওর ভালবাসা মরবে না, তাই না শেরিয়োজা? ··"

মন দিয়ে সে শোনেনি, তাই তার উত্তরও হোলো তেমনি!···প্রশ্নের সঙ্গে মিল নেই।

"ওর ঐ মাছধরার সখটাই আমার ভালো লাগলো···"

মাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সার্জি আবার শহরের পথে পথে ঘুরতে লাগলো। মাথার উপরে তার হৈমন্তী তারার দল ঝলমল করছে, কিন্তু সেদিকে তার

ভ্রূক্ষেপও নেই। সে পারীর রাত আর মাদোর কথাও ভাবছে না, দিনের কাহিনীও এখন অবলুপ্ত : তার পরিকল্পনা, গ্রিগরিয়েভ-এর সঙ্গে তার বাদানুবাদ, ওলগাদের পার্টি—কিছুই সে ভাবছে না। মানুষ কখনো কখনো বড় কিছু ভাবে, কিন্তু তার চিন্তাই যেন এখন নীহারিকার পর্যায়ে, হয়তো তা এত মহান, সে নিজেই জানে না কি ভাবছে। কথা আর কল্পনার ভিড় দ্রুত মিলিয়ে যায়। সার্জিরও সে রাতে তাই হোলো। সে মস্কোর মহান শান্তি নিজের দেহের প্রতি তন্তুতে তন্তুতে অনুভব করলো—খেলুড়ে ছেলে মেয়ের দল, নাতাশার বোঁচা নাক, তার হাসি, ওলগার সীসের মত ভারী মন, মার নিঃসঙ্গতা, হাজারো বাড়ীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, সেখানে মানুষের আসা যাওয়া, বুড়োরা বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে, সদ্যজাত শিশুর কান্না—সবই যেন শান্তি মাখা…পৃথিবীর মতোই পুরানো এই শান্তি—পুরানো এই সৌন্দর্যের মত—তুষারের মত। কিন্তু সার্জি তারই ভিতরে যুদ্ধের গন্ধ টের পেল ; বেতারের ভাঙা গলার চীৎকারে নয়, মানুষের কথায়। আসছে ভয়ংকর রাত—রাত—আলো নেই সেখানে, নেই ভালোবাসা, সুখ—আসছে, আসছে।…

সে নদীর ধারে এসে গেল। হঠাৎ ঠাণ্ডা ভোরের আলোয় তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো ক্রেমলিন—দুর্গ বটে, কিন্তু সেখানে রয়েছে সৌন্দর্য, আর অনমনীয় শক্তি। সার্জি হাসলো, অজান্তে হাত নাড়লো ; মনে আর চিন্তার লেশ মাত্র নেই। সে ভারি ক্লান্ত, কিন্তু মন তার শান্ত। এবার সে ফিরে চলল কুদরিনস্কায়ায় তার বাড়িতে।

## একুশ

কে যেন ঠাট্টা করেই নাতাশার বাবা দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ ক্রাইলভের নাম দিয়েছিল 'লিপেৎস্কের ডন কুইকসোট', যদিও সেই গোমরামুখো যোদ্ধার সঙ্গে তাঁর কোনো মিলই ছিলনা। তাঁর গোলাপী গাল, মুখখানা একটু গোলগাল—আর সর্বদাই হাসিখুশি ভাব। কেউ বিপদে পড়লে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য যে ব্যাকুলতা তাঁর দেখা যায়, সেই জন্যেই তাঁর এই

নামকরণ হয়েছিল। 'কেন তুমি কি সোভিয়েতের সভ্য নাকি?' বারবারা ইলিনিচনা গজরান। তিনি তার স্বামীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বড়ই উদ্বিগ্ন। স্বামী তো কখনোই খেতে বসে খাওয়া শেষ করতে পারেন না, কখনো ভালো করে ঘুমোন না, পঞ্চাশ বছর বয়সেও তিনি সকাল থেকে রাত অবধি সব সময়েই দুপায়ে খাড়া, একদণ্ড জিরোবার তার সময় নেই। দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ উত্তর দেন, 'বুঝলে না গিন্নি, আমি কমিউনিস্ট, তার মানে আমার বিরাট দায়িত্ব।'

তিনি চিকিৎসক, হাঁসপাতালে কাজ করেন, কিন্তু লোকে তার কাছে এমন সব ব্যাপার নিয়ে ছুটে আসে যার সঙ্গে গলা আর নাকের কোনো সম্বন্ধই নেই। লোকে বলে—যদি বিপদে পড়, ক্রাইলভের কাছে যাও, তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। একদিন পার্টির অর্গানাইজার তাঁকে বলেছিলেন:

'দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ, তোমার নিজের দিকে একটু নজর দাও! তুমি তো আর এখন ছোকরাটি নও ঘরের জন্য ঐ মেয়েটি তোমার কাছে ছুটে এসেছে কেন?...সে কর্তৃপক্ষের কাছে যাক্...'। দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ জ্বলে উঠলেন:

'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, তুমি পার্টির সভ্য হয়ে এমন কথা বলতে পারলে। কর্তৃপক্ষ হচ্ছে কর্তৃপক্ষ, আর মানুষ মানুষ। আমি কি করে ঐ ভদ্রমহিলার নাকের অসুখ সারাব, যদি অন্যায়ভাবে তার ঘরখানা কেড়ে নেওয়া হয়। উনি এখন ওর বোনের ওখানে আছেন, তার আবার যক্ষা—তুমি এখন বুঝতে পারছ তো? হাঁ, আমাকে অন্যের নাকের ব্যাপার ছেড়ে আমার নিজের নাক নানা ব্যাপারে গলাতে হয়। কমরেড, শুধু চিকিৎসা কি করে হবে সে পদ্ধতি খুঁজে বার করলে হবে না, তাকে কাজেও লাগাতে হবে। পদ্ধতি বার করেন যাঁরা, তাঁরা প্রতিভাবান—হাঁ—তাদের প্রতিভাবানই বলা উচিত। শুনছ তো? আর ডাক্তার যদি হাতুড়ে হয়, সে বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কারগুলো থাকা সত্ত্বেও রোগীকে পরলোকে পাঠাতে পারে। তুমি কমিউনিস্ট ছাড়া কমিউনিজম গড়ে তুলতে পারবে না। রোগ থাকে একটা, কিন্তু তার লাখোটা রকম আছে। কি পদ্ধতি তুমি নিলে সেইটেই বড় কথা, কিন্তু তুমি যদি পড়ে না বোঝ সে আলাদা কথা। আমি যদি কমিউনিস্ট হই, তাহলে সব কিছুতেই আমাকে মাথা ঘামাতে হবে। তুমি কি মনে কর আমি বুকে একটা

লেবেল সেঁটে লিখে দেব 'শুধু নাক আর গলার ব্যাপারে নিযুক্ত?' মোদ্দা কথা হচ্ছে, তুমি যদি সাহায্য করতে না চাও, আমি নিজে তদ্বির করবো, জেলা-সোভিয়েতে আজই যাব, হাঁ আজই...'

দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ জীবন্ত মানুষ, জীবনের পাত্র তার কানায় কানায় ভরা। নাতাশা কলম আর জমির কথা শুরু করলেই তিনি হাঁ হয়ে শোনেন, যেন মুগ্ধই হয়েছেন। তার স্ত্রী একজন লাইব্রেরিয়ান; কোনো বই পড়ে ক্রাইলভ চেঁচিয়ে বলেন, "ভেরিয়া, তোমার পাঠকরা কি বলবে? আমার তো মনে হয় নায়িকাটি আস্ত বোকা!..." তিনি এক হপ্তা ধরে তর্ক করেন, নায়ক ভুল না ঠিক করেছে। কোনো উপন্যাস যদি ভালো না লাগে, তিনি লেখককে গাল দেন, যেন লেখক তার সুমুখে বসে আছে। "কি করে ওসব মন-গড়া কথা লিখলে বলতো? মানুষ তো আর পচাগলা জিনিষ নয়, বা ঘুরপাক খাওয়া লেদও নয়—সে অনেক, অনেক জটিল ব্যাপার! হয় সোজা তার ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা কর, নয়তো লিখো না। কেউ তো আর তোমাকে বাধ্য করছে না। তার চেয়ে কাগজের কলে গিয়ে মেহনতি কর—তোমার তৈরি করা কাগজে ওরা টলস্টয়ের গ্রন্থাবলী ছাপবে। মনে রেখো কাগজ এখন দুষ্পাপ্য, আর সময়ও কম—সবগুলো ভালো বই পড়তে অমন দশটা জীবন লেগে যায়, আর উনি কিনা এলেন একগাদা বাজে বই নিয়ে!" নাতাশা তার বাবার সঙ্গে থিয়েটারে গিয়ে যেমন আমোদ পায়, তেমনি অপ্রতিভও কম হয় না। দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ ছেলেমানুষের মত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। যখন নাটক জমে উঠছে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি মনে হয়, মেয়েটি বুঝতে পারছে?..." তার মনে সব সময়েই ভয় বদমায়েসটার স্বরূপ বুঝতে নায়িকার হয়তো দেরীই হবে, অথবা ঈর্ষা-উন্মাদ নায়কের সময় মতো চৈতন্য হবে না। ক্রাইলভ যখনই যেখানে যান, সবার সঙ্গে তিনি আলাপ করেন, প্রশংসা আর ক্রোধ দুটো সমানভাবেই বর্ষিত হয়। "আহা কি চমৎকার আপেল!" "একে কি স্কুল বল? এ যে প্রচণ্ড নোংরামি!" বুড়োদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন। মেশিনের কাছে গেলে, কি করে সেটা চলে না জেনে নড়তে চান না, বা, পারেন না; তিনি পনীর দেওয়া পিঠে বা মাংস খেয়ে ঠোঁট চাটেন আর আনন্দে বিড়বিড় করে বলেন: "কি রকম দেশখানা আমাদের, তাই না?"

তাই ভালিয়া স্তেসেঙ্কো ডাক্তার ক্রাইলভের কাছেই ছুটে গেল। নাক বা গলায় তার কিছু হয় নি, আর সে এখনো চিত্র-তারকা হবার স্বপ্ন দেখে। যদিও চিত্র ভবনে কেউ ওর প্রতিভা আবিষ্কার করতে পারে নি। দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচকে দেখে ভালিয়া অবাক হয়ে গেল। সে ভেবেছিল ক্রাইলভ হবেন খুদে নিরীহ মানুষটি, চোখে থাকবে চশমা, কিন্তু তার সুমুখে এসে বসলেন বেশ মোটা সোটা একজন মানুষ; কসে সিগারেট-পোরা নলটায় টান দিচ্ছেন। ডাক্তার খেঁকিয়ে উঠলেন:

"কি হয়েছে তোমার? বল—সংক্ষেপেই বল—আমার হাসপাতালের দেরী হয়ে যাবে।"

"গলুবেভা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে, আপনার হয়তো তাকে মনে আছে—আন্তোনিনা ভ্যাসিলিয়েভ্‌না..."

"না আমার মনে নেই, সবাইকে মনে থাকবে এ আশাই বা কর কেন? কি বললে গলুবেভা? বেশ তাই, এবার কাজের কথায় এস..."

ভালিয়া কি বলবে ভেবে-চিন্তে ঠিক করে এসেছিল, কিন্তু এখন সে ঘাবড়ে গেল।

"আপনি তার সাইনাসের চিকিৎসা করেছিলেন, তাছাড়া কাজও জুটিয়ে দেন..."

"বলেছি তো আমার মনে পড়ছে না। পৃথিবীতে হাজার হাজার গলুবেভা আছে, আর সাইনাসেও বহু লোক ভুগছে, আর বেকারের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ—কি মগজে ঢুকলো তো? আসল কথাটা কি? ওরা আর চুক্তি করতে চায় না?..."

"না, না, ওর কোন বিপদ হয়নি; ও আমাকে পরামর্শ দিলে...আপনার কাছে যে অমনি ছুটে এসেছি তা নয়, আমি প্রথম খবরের কাগজে লিখি, তারপর চিঠিপত্রের দপ্তর থেকে উত্তর পাই, ওঁরা আমার চিঠি সেমিপালভকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—"

"বল তো, তোমার এই ভূমিকা কি সন্ধ্যের আগে শেষ হবে, না হবে না? আমার রোগীগুলো বোধহয় আমার বদলে তুমিই দেখবে? এবার সোজা আসল কথাটা বল, কি অলৌকিক ব্যাপার তোমার ঘটলো?"

"নিজের জন্য আমি আসিনি, শেষ অবধি আমার কথা শুনুন! ওর

কোনো দোষ নেই। গ্রাজকভ তাকে গুদাম থেকে ষাট গজ কাপড় নিয়ে আসতে হুকুম দিলে, সে রসিদ চাইতে গ্রাজকভ চেঁচিয়ে উঠলো : কি, ম্যানেজারকে তুমি অবিশ্বাস কর! সে মাত্র দু'মাস ওখানে চাকরী করছিল, উনিশ বছর তার বয়েস, মা পঙ্গু। ম্যানেজার রেহাই পেয়ে গেল, তার জামাই জেলার খাজাঞ্চি কিন্তু ওর হোলো তিন বছর জেল। ওর মা তো ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠেছেন—"

"তুমি কি বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা তো বুঝতে পারছেন?..."

"থাম তো বাপু! আমার কথার উত্তর দাও! যে কাপড় চুরি করেছে, সেই মেয়েটির নাম কি?"

"ম্যানেজার গ্রাজকভ চুরি করেছে, মেয়েটি সম্পূর্ণ নির্দোষী।"

"আমার কথার জবাব দাও! সেই নির্দোষীর নামটি কি বল?"

"নাদিয়া কার্ণাওকোভা।"

"সে তোমার বোন?"

"না, না। আমি কিয়েভ্ থেকে এসেছি, ও আমার পড়শী। ওদের ফ্ল্যাটে একটা ঘর আমি পেয়েছি, ওর মাকে একটু-আধটু সাহায্য করি, তিনি একেবারে পঙ্গু। নাদিয়া আমার কাছ থেকে পড়তে বই চেয়ে নিত।"

ভালিয়া হাসলো, অপরাধীর হাসি। ওর সাদাসিধে ভাবলেশহীন মুখ সুন্দর হয়ে উঠলো, দিমিত্রি আলেকসীয়েভিচ তর্জন-গর্জন থামালেন।

"তাহলে ও তোমার আত্মীয় নয়?.. কিন্তু কি করে তুমি জানলে সে এ নোংরা ব্যাপার করেনি—এমন ধারণা কেন তোমার হোলো?"

"সে আমার কাছে হতাশ হয়ে এল, আমাকে সে খুলে বললো কাপড়ের জন্য সে রসিদ নেয়নি। আমি ওকে আরো ভয় পাইয়ে দিলাম, বললাম ওর এখুনি উপরে জানানো উচিত। আমরা একটা বিবৃতি তৈরী করেছিলাম, কিন্তু সেমিপালব সেটা গ্রাজকভের কাছে পাঠিয়ে দিল। আর গ্রাজকভ তো ওকে ফাঁদে ফেলতেই চায়, তার ধারণা ছিল সে তা পারবেও, কারণ তার জামাই জেলার খাজাঞ্চি। আমি সব কাগজপত্র এনেছি...ওর উকিল বার বার বলেছিলেন, ও একেবারে নির্দোষ, কিন্তু মামলাটা ঘোরালো হয়ে উঠলো ওর জামাইয়ের জন্য—"

'হাঁ নিশ্চয়ই, জেলার খাজাঞ্চি আছেন হবে না! তিনি তো কেউকেটা লোক! আমরা কি জঙ্গলে আছি নাকি? আর তুমিই বা অমন ফোঁপাচ্ছ কেন, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত! তোমার এই বয়সে কোথায় দুর্গ দখল করতে যাবে তা নয়...আচ্ছা, আমি ব্যাপারটা যা পারি করব। এখন যাও তো বাপু। আমাকে এখন পোষাক বদলাতে হবে,...কি বুঝেছ তো?'

ক্রাইলভ দুটি মাস এই মামলায় নষ্ট করলেন। তিনি কার্নওকোভাকে তিনবার অভিশপ্তা বলে গাল দিলেন। বারবারা ইলিনিচনা গজরাতে লাগলেন, 'আমার কিন্তু বিশ্বাস, ঐ মেয়েটাই চুরি করেছে, ওরা এমনি চুরি করে...তোমার কি, একটা কিছু পেলেই হোলো। অমনি ক্ষেপে উঠবে! একটা কারখানার মেয়েকে একেবারে ড্রেফুস করে তুললে!' কিন্তু স্বামী তার কথা শুনলেন না। তিনি লাবাজবের সঙ্গে দেখা করতে চললেন, তার সঙ্গে নাতাশার ওখানেই পরিচয়।

'একটা সাংঘাতিক কেলেঙ্কারী সেমিয়ন আইভানোভিচ! আপনার সাহায্য চাই—চাই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য।' মামলার খুঁটিনাটি তিনি লাবাজভকে জানালেন। সেমিয়ন ইভানোভিচ বিরক্তিভরেই শুনলেন তারপর ঘুমন্ত চোখ জোড়া তুলে ক্রাইলভের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"আপনি মিছেমিছিই ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাবছেন দিমিত্রি আলেক-সিয়েভিচ। মেয়েটার তিন বছর জেল হয়েছে, তাই না? দোষ না করলে নিশ্চয়ই শাস্তি হোত না—ব্যাপারটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়, জেল খেটে স্বভাব শুধরে বেরুবে। ওকথা এখন থাক্।"

ক্রাইলভ গজরাতে গজরাতে চলে এলেন। নাতাশাকে এসে বললেন, "তোমার ঐ ওলগা একটা বরফ-দেওয়া মাছকে বিয়ে করেছে—বুঝেছ?"

কিন্তু দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ হাল ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, কার্ণাওকোভা নিরপরাধ, তাই সাফল্যও লাভ করলেন। রিপাবলিকের হাকিম হুকুম দিলেন, আবার মামলা হাজির করতে হবে। কিছুদিন পরেই কার্ণাওকোভা খালাস পেলে। গ্রাজকভ অভিযুক্ত হোলো, সেমিপালভের মামলা গেল কন্ট্রোল কমিশনের হাতে। ক্রাইলভ তো আহ্লাদে আটখানা। এমন কি বারবারা যখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন: "সবই তো হোলো, কিন্তু

তুমি যে নিজের শরীরের দিকে একবারও তাকাও না—" তখনও ক্রাইলভ শান্তই রইলেন।

"একবার ভেবে দেখ ভারিয়া, একটি মানুষকে জন্ম দেওয়া কত শক্ত—সে তো তুমিই জানো—নাতাশাকে ন' মাস তুমি গর্ভে ধরেছ, যা তখন চেঁচাতে মনে হোত কেউ তোমাকে খুন করছে। তারপরে কি হোলো? ওর পেছনে জীবনের ক'টা বছর কাটালে? প্রথমে দাঁত ওঠা, তারপরে হাম, তারপরে তরুণী মনের খামখেয়ালি কল্পনা, তারপরে ওর পেশা ঠিক করা নিয়ে সমস্যা। কিন্তু দু সেকেণ্ডেই একটা মানুষকে ধ্বংস করা যায়, একটা কলমের খোঁচায়। তুমি মনে কর, আমাদের লোকসংখ্যা বেশি বলে আমরা মানুষকে তুচ্ছ করতে পারি? হাঁ, সময় খারাপ বটে! ওই গোরা ফিনরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমাদের মাংশপেশির শক্তি যাচাই করছে ··আমি জানি, কাপড় মূল্যবান জিনিস, পাহারা দিয়ে তাকে রাখতে হবে·· পেছন দেখিয়ে বহু লোক তো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি হলে ঐ গ্রাজকভটাকে দশ বছর ঠুকে দিতাম, পাজিটা মাটি খুঁড়ুক বা গাছ কাটুক দশ বছর ধরে। কিন্তু বল তো—একটি মেয়ে, সে কি কাপড়ের চেয়ে ফেল্না? তাকে কি রক্ষা করা উচিত নয়?"

ভারিয়া ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিতে এল, হাতে তার ফুলের টব তাতে লিলাক ফুলের গোছা। সে বইতে পারছিল না—গাছটা ওর থেকে বড় বলেই মনে হয়।

"মস্কোতে ফিরেই নাদিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করবে। ওর মা আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আর ফুলগুলি আমার উপহার।"

"তারপরে আর কি? এইগুলো কোনো ছোকরাকে দিলে ভালো করতে, ওদের এখনো স্বপ্ন দেখার বাতিক আছে···বাঃ চমৎকার গন্ধ তো! যেও না। ভারিয়া তুমি আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে, এই যে ··ভালিয়া ও এসেছে। কি নাম যেন? সেৎসেস্কো? ঠিক আছে, সেৎসেস্কো খুব বেশি নেই, নামটা মনে থাকবে। নাতাশা, ওকে নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হবে। নিজের প্রতিবেশীর জন্য মেয়েটি লড়েছিল—বুঝেছ তো? বাইরে ওরা আমাদের সম্বন্ধে যা ইচ্ছে তাই লিখুক, কিন্তু আমরা ওর মতো ছেলেমেয়েদের পালন করব, মানুষ করে তুলব ..."

## বাইশ

ল্যাসিয়ে লিওকে সামরিক উর্দি পরা দেখে হেসে উঠলেন।

"তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে জানো? ঠিক প্রহসনের অভিনেতা যেন।"

"তাহলে তো ঠিকই আছে—এ তো সত্যিকারের প্রহসনই বটে, তবে অভিনেতা বদল বড় তাড়াতাড়ি হচ্ছে।"

"হাঁ, অবাক কাণ্ড বটে,—আজ পাঁচ মাস ধরে আমরা লড়ছি, কিন্তু এখনো টের পাচ্ছি না। উনিশশো চৌদ্দতে কিন্তু অন্য রকম ছিল ..."

লিও হাসলেন:

"কিন্তু হতাহতের সংখ্যা আছেই—সামান্তে একজন সৈনিক একঘেয়েমি এড়াতে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছে।"

"হাঃ হাঃ! ভাবি মজার তো! · কিন্তু তার চেয়েও মজাদার তোমার এই উর্দি-পরা চেহারা! কবে রওনা হচ্ছ?"

কাল—যাব বেলজিয়াম সামান্তে। কি যে বিশ্রী লাগবে ভাব তো।"

"তোমাকে হয় চীনা ভাষা শিখতে হবে, নয়তো পেসেন্স খেলা। লুই লিখেছে ওরা সময় কাটাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। আমি ওকে ডজনখানেক ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠিয়েছি।"

"আমার তো মনে হয় লিওর্তাইন একমাত্র মানুষ যে এটাকে সত্যি যুদ্ধ ভাবছে। ওকে ছেড়ে যাওয়াও এখন বিপদ। তুমি তো জানো ও এখন আসন্ন-প্রসবা · "

"ওর জন্য ভাবতে হবে না, আমরা ওকে দেখাশোনা করব—কিন্তু কতদিন থাকবে এই যুদ্ধ? ওরা তো বলছে গ্রীষ্মেই সিগফ্রিড লাইন ভেঙে ফেলবে।"

"আমি তো শুনেছি উনিশশো একচল্লিশের বসন্তকালের কমে শেষ হবে না। অবশ্য এর মধ্যে যদি আশ্চর্য কাণ্ড না ঘটে..."

"তা ঘটবে বৈই কি। কর্নেল ফিনেলো বললেন যদি ফিন্‌রা টিকে থাকে, তাহলে উত্তরে যুদ্ধ শুরু হবে। ওরা বলে ওয়েগাঁওরা বাকুর উপর হানা দেবে।"

"বোকার দল। জার্মানদের নিয়েই আমরা অস্থির। এখন আবার রুশদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাওয়া কেন?'

"এই তো তোমার রুশ রক্ত এবার গরম হয়ে উঠেছে. কথা বলছে ..." লাঁসিয়ে লিওর হাঁটু চাপড়ে দিলেন।

"না হে ঠাট্টা করছি। তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি ফরাসী। আর রুশদের কথা তুমি ঠিকই বলেছ, ওদের না ছোঁয়াই ভালো—ওরা সংখ্যায় বহু, তাছাড়া ক্যাপাও বটে! কিন্তু জানতো লিও, সব জায়গায়ই রাজনীতির খেলা। কেউ হয়তো এমনও ভাবতে পারে, আমরা যুদ্ধ করছি না, এ যেন নির্বাচনী প্রতিযোগীতা চলছে। যাই বলো, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি!"

"আমি হাঁপিয়ে উঠেছি তোমার চেয়ে বেশি। ভেবে দেখ, এই সং-এর সাজ পরে আছি আবার যে কোনো নন-কমব্যাটাণ্টকে সেলামও ঠুকতে হচ্ছে। আমি এরই মধ্যে জুন বা জুলাইতে ছুটির স্বপ্নও দেখছি। গ্রীষ্ম শেষ হলে বুঝব যে এটা একটা মস্ত তামাসার ব্যাপারই হোলো।"

"প্রসবের পরে লিওতাঁইন বিদার্তে যাবে। তুমিও গ্রীষ্মে ওখানে যেও না! লিওতাঁইনের ভাল লাগবে। আমিও হয়তো ততদিনে নিষ্কৃতি পাব। সত্যিই জায়গাটা যেন স্বর্গ। হাঁ, গেলিনো এর চেয়েও চমৎকার, কিন্তু আমার আছে সমুদ্র। ওখানকার মদও চাখতে পারবে। জানি, তুমি মুস্কাতেল পছন্দ কর, কিন্তু যুরাঁকো তোমার ভিতরে উত্তাপ সঞ্চার করবে। মদ তো নয় যেন বোতলে ভরা রোদ। মাদো ওখানে ছবিও আঁকতে পারবে—ওখানকার পাহাড়ের আশ্চর্য রং। কেমন বেগ নি—কিন্তু লিলাকের রং নয়, ভায়োলেটও নয়—এ যেন বুনো হায়াসিনথ।"

"ভারি আশ্চর্য!" লাঁসিয়ে ভাবলেন, "যুদ্ধের আগের চেয়ে এখন সব কিছু যেন আরো শান্ত হয়ে এসেছে। যুদ্ধের আগে আমরা কি আশা করেছিলাম, ঈশ্বরই জানেন! যুদ্ধ শব্দটায় সবার মাথা যেন গুলিয়ে গিয়েছিল। তারপর যুদ্ধের প্রথম পর্বে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো, গ্যাস-মুখোস না পরে কেউ বেরুত না, কেউ বা চলে গেল দূর পাহাড়ে। নিভেলই শুধু ধরে বসলো তাকে সীমান্তে পাঠাতে হবে। মনে হলেও হাসি পায়···তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষ যুদ্ধেও বাঁচে। হাঁ, একথা সত্যি যে পারী রাতে আঁধার থাকে, কিন্তু তারও সৌন্দর্য আছে বই কি। ভিলোঁর সময়ে এমনিই বুঝি ছিল। কিন্তু আমার খুব খাটুনি পড়বে। লেঁজা এখনো জেলে, ওরা এখনো তাকে পুরে রেখেছে, এবার তো লিওরও ডাক পড়েছে। ওছাড়া যেন সৈন্যই নেই! কিন্তু অভিযোগ করা তো

পাপ—যাই হোক যুদ্ধ তো চলছে—তা সে যতই মিছে হোক। মার্সেলিনের কিন্তু দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সে ভাবে তার লুই মরতে পারে। ভারি বুড়িয়ে গেছে, আগে বিশেষ কোনো ছুটির দিনেই গীর্জেয় যেতো, এখন প্রায়ই তো যায়। না, আমাদের সময় যুদ্ধ ছিল আলাদা · আমরা আক্রমণ করতাম, পেছু হটতাম, গোলা ফাটত, মেসিনগান গর্জাত—সে ছিল এক নরক ··কিন্তু এখন জার্মানরা আমাদের সৈন্যদের বাজনা শোনাচ্ছে। তুমি খবরের কাগজ খুলে দেখ, কে শত্রু বুঝতেই পারবে না। জার্মানদের সম্বন্ধে কয়েক ছত্র মাত্র লেখা, বাকি সব রুশদের নিয়ে। এ এক অদ্ভুত বিসঙ্গত সত্য। ভিলোঁ একদা লিখেছিলেন, খুব অদ্ভুত ব্যাপার বই কি!

আমাদের শত্রুরাই শুধু আসবে
আমাদের সহায় হতে
আমাদের সাধুদের নামেই রটবে কলঙ্ক
মধুর চেয়ে তিক্ত আর কি আছে জগতে,
শুধু প্রেমিক-প্রেমিকারাই বলবে
অর্থভরা কথা।

"কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকারা সব সময়েই অর্থভরা কথা বলে না। আমি বাজি রাখতে পারি বার্ট মাদোর প্রেমে পড়েছে। ও যখন জিজ্ঞেস করে মাদো কেমন আছে, তখনই তো টের পাওয়া যায়···কিন্তু যখন ওকে এখানে নিমন্ত্রণ করি, ও আসতে চায় না···এই তো আজও ফোন করলাম কিন্তু নানা ওজর দেখালে, বললে ভারি ব্যস্ত। বেচারী মাদো, রোগা হয়ে গেছে, কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ওকে ভালোই লাগে, যেন আরো সুন্দর হয়েছে। ও যে-কারো মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ও কিনা ধর্মযাজিকা-দের মতো জীবন কাটাচ্ছে···"

সন্ধ্যা হোল। মাদো আলো জ্বালবার জন্য সুইচের দিকে হাত বাড়ালো, হঠাৎ কেঁপে উঠলো তার দেহ। মনে হোলো সার্জি যেন তার পাশে! সার্জির বিদায়ের পর এই প্রথম সে জোরে উচ্চারণ করলো তার নাম। বেদনায় অধীর হয়ে সে ভাবলো: "ওর কথা বলতে পারি এমন কেউ তো নেই। কেন জানিনা, সার্বা ভাবে ও আমাকে ভালবাসে, ওর কাছে তো সার্জির কথা বলতে পারি না···।"

এই শীতে ওর নিজের বাড়ীখানা ওর কাছে হতাশা নিয়ে আসে, ওকে দমিয়ে দেয়। এমন তো কখনো হয়নি। ওর মা হয় কাঁদছেন নয় তো প্রার্থনা করছেন। বাবা পাগলের মতো শুধু বলছেন, বড় বড় কামান দিয়েই যুদ্ধ জেতা যাবে, আবার নিজেকে পর মুহূর্তেই শান্ত করছেন—যুদ্ধ তো নেই, মন্ত্রের মতো তাই রান্নার নিয়মকানুনগুলি আউড়ে চলেছেন!

"সাদা মদে ভিজিয়ে রাখ, তারপর প্রচুর পরিমাণে চর্বি ঢেলে দাও…" কেউ আশে পাশে নেই তবু এমনি ধারা কথা বলছেন! খবরের কাগজগুলো বলছে, ফিনল্যাণ্ডে রুশদের দুঃসময় যাচ্ছে, শীত প্রচণ্ড, মানুষগুলো জমে যাচ্ছে। হয়তো সার্জি ওখানে আছে—তাহলে কি হবে?…সে তো লড়াই করছে। আর কেন সে করছে তাও জানে। জোসেৎও জানে।

তার মনে হোলো ঘরে থাকা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে সে বেরিয়ে পড়লো। কোথায় যাবে জানে না। বাবা পেছন থেকে ডাকলেন:

"দেরী করো না! আজ ক'জন অতিথি আসছেন। আমি কোয়েনেল আর কানার্দ্য আ-লা রুয়ে তৈরি করেছি…"

অতিথিরা যুদ্ধের গতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন—এরা সবাই রণনীতি-নিপুণ, টেবিলের উপরে দেশলাইয়ের কাঠিগুলো তাদের দুঃসাহসিক পরিকল্পনার পরিচয় হয়ে দেখা দিল। শুধু একজন তর্কে যোগ দিলেন না, তিনি অধ্যাপক দ্যুমা। যখন লাসিয়ে তাকে সিগফ্রিড লাইন ভেদ করবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি উত্তর দিলেন:

"আপানারা শুধু দেশলাইয়ের কাঠিই নষ্ট করছেন"

নিভেল বললো: "আপনি ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছেন, এর সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ফিনল্যাণ্ড তারপরে লেনিনগ্রাদ।"

ডাক্তার মোরিলো হো হো করে হেসে উঠলেন:

"তাহলে এই-ই আপনার লক্ষ্য?…কিন্তু জানেন তো, আমরা সারব্রাকেনের দরজায় গিয়ে থেমে পড়ি। তারপর একটা গোলাও না খরচ করে লেজ গুটিয়ে আবার পেছন ফিরে দৌড়। এতো যুদ্ধ নয়, প্রহসন—তামাসা!"

লাসিয়ে মাদোর উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ হলেন—তিনি তাকে বার বার বলে দিয়েছিলেন; তিনি ভোজের আয়োজন করতে কল্পনা খাটাতেও কসুর করেন নি,

কিন্তু তবু সে এল না···ল'াসিয়ের রন্ধনের উপকরণের যুদ্ধেও ক্ষতি হয় নি। কিন্তু খুঁতখুঁতে নিভেল তবু কোয়েনেলের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতে পারলো না। ডাক্তার মোরিলো চলে যেতে বাধ্য হলেন; সন্ধ্যেটা মাটি হোলো। কিন্তু তার কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না। মোরিলো কখনো কখনো মুখের ওপর উচিত কথা বলে মানুষকে চটিয়ে দেন; কিন্তু আজ তার মনটা ছিল প্রফুল্ল, তাই সবাইকেই তিনি নানাভাবে আনন্দ দিচ্ছিলেন। ব্যবসার জন্য তাকে গরীব থেকে শুরু করে উঁচুতলার লোকের কাছে যেতে হয়, তাই তার গল্প, আর গুজবও অফুরন্ত। নিভেল যখন নতুন ধরণের বোমারু বিমানের কথা তুললো, মোরিলো বললেন:

"হাঁ, বোমারু বিমানের কথায় মনে পড়লো, আমাদের শাসনকর্তারা সরকারী দপ্তরে নতুন রক্ত-সঞ্চার করতে চাইছেন। ওরা একজন নতুন লোককে বিমান শিল্পের ভার দেবেন।"

ল'াসিয়ে প্লেটের উপরের হাঁস নিয়ে ব্যস্ত, তাই তিনি উদাসীনভাবেই ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করলেন:

"কাকে ভার দিতে চাইছেন?"

"আমি চিনি না। ওর নামও শুনেছি বলে মনে পড়ে না···গ্যাস্টন রয় না কি নাম।"

ল'াসিয়ের উপস্থিত বুদ্ধি যথেষ্টই, তাই মুখ থেকে বিস্ময়ে যে ধ্বনি বের হচ্ছিল, চেপে গেলেন। তিনি শুধু প্লেটটা সরিয়ে রাখলেন, টেবিল ন্যাপকিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। কিন্তু অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল···ডাক্তার মোরিলো বিশ বছরেরও বেশি মাদাম ল'াসিয়ের চিকিৎসা করছেন, তিনি করবেইয়েতেও ঘন ঘনই আসেন, কিন্তু তিনিও কখনো মার্সেলিনকে রাজনীতির আলোচনায় যোগ দিতে দেখেন নি। কিন্তু আজ মার্সেলিন চেঁচিয়ে উঠলেন:

"ওরা লুইকে সীমান্তে আটকে রেখেছে কেন? যদি যুদ্ধের ভার গোয়েন্দার হাতেই গেল, তাহলে লুই বা ছাড়া পাবে না কেন? দেখ, দেখ, কত তরুণের জীবন ওরা বিপন্ন করে তুলেছে!"

নিজের কথার এই ফলে মোরিলো অপ্রতিভ হলেন। মাদাম ল'াসিয়ে কেন উত্তেজিত হয়েছেন তাও বুঝতে পারলেন না। মোরিলো গম্ভীর হয়ে বললেন:

"আমি অবাক হইনি—ওদের মগজে কিছু নেই "

মার্সেলিন বলে উঠলেন বিদ্রূপভরে,

"ওদের বিবেক নেই "

তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। নীরবতা ঝরে পড়লো। লাঁসিয়ে বন্ধুদের কাছে মার্সেলিনের এই উত্তেজনার কথা ভেঙে বলতে পারলে না। আপন মনে বললেন, 'আমিও হয়তো চটে গিছলাম। রয়কে যদি অত বড় দায়িত্বের কাজ দেওয়া হয়ে থাকে, তিনি নিশ্চয়ই সৎলোক। জার্মানদের সঙ্গে তিনি ব্যবসা করতেন বটে, কিন্তু তখন তো যুদ্ধ বাঁধেনি·· " লাঁসিয়ে এবার বললেন :

"মার্সেলিনের স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। মার মন তো · এখন অবশ্য যুদ্ধ নেই, কিন্তু সীমান্ত যখন সরে সরে যাবে·· লুই জঙ্গী বিমান বাহিনীতে রয়েছে···"

"বাজে ব্যাপাব চলছে, এখন বন্ধ কবে দেওয়াই ভাল". দ্যুমা বললেন। লাঁসিয়ে তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না, তাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন : "আমি বলি, যদি শুরু করবার ইচ্ছে না থাকে, তাহলে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়াব এই-ই সময়।"

ডাক্তার মোরিলোকে মাদাম লাঁসিয়ের কাছে যেতে হোলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। অতিথিরা বিদায় নিলেন। শুধু দ্যুমা রইলেন মোরিলোর অপেক্ষায়।

বাড়ি ফিরে গিয়ে নিভেল তার ডায়েরীতে লিখল :

বিয়োগান্ত প্রহসন চলছে। যুদ্ধ, অথচ যুদ্ধ নয়। সবাই দুর্ঘটনার জন্য উন্মুখ, কিন্তু তবু তারা মুখে সিগফ্রিড লাইন ভেদ করবার কথা বলছে। এর থেকে ভয়ংকর যুদ্ধ বহু হয়েছে. কিন্তু আমার তো মনে হয় এর থেকে বোকামি আর হয়নি। লাঁসিয়েদের ওখানে এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মোরিলো যখন গ্যাসটন রয় নামে একজন লোককে নিযুক্ত করার কথা বললেন, মাদাম লাঁসিয়ে গোয়েন্দা বলে চেঁচিয়ে উঠলেন মূর্চ্ছাও গেলেন। গোয়েন্দা-বাই তাহলে শুরু হয়েছে। আমি রয়কে চিনিনা, তবে সে হয়তো জার্মান সভ্যতাই চায়। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। শার্কে জার্মান, কিন্তু ফরাসী সভ্যতার রং তার গায়ে। হয়তো তাকেও কোনো দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু যুদ্ধকে জীবন্ত করে তোলবার একমাত্র

উপায় আছে,—তাকে যদি বলশেভিকদের বিপক্ষে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। ওরা বলে হ্যচে নাকি তাই মনে করেন। কিন্তু হায় হিটলার যে নির্বোধ, মহান হতে পারে, কিন্তু নির্বোধ তো বটে! এর সমাপ্তি হবে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসে, তারপর হাজার বছর পরে ওরা ম্যালিয়লের মূর্তি খুঁড়ে বার করবে, যেমন ওরা মেলোর পঙ্গু প্রেমকে বার করেছিল। আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি। পুলিশ দপ্তরে কাতারে কাতারে বন্দী, বাইরে ঠাণ্ডা, তামাকের ধোঁয়া আর হতাশা…

## তেইশ

মিলেৎ এলো জোসেতের সঙ্গে দেখা করতে, সঙ্গে তার একটি রোগা মেয়ে। ম্লান তার মুখখানা, ছেলেমানুষ বলেই তাকে মনে হয়।

"এই সেই মারী, যার কথা তোমাকে বলেছি…ও কাল সারারাত ইশ্‌তেহার এঁটেছে আজ ভোরে দেখলাম, কত লোক ভিড় করে পড়ছে। ওরা জানতে চায়, আমাদের পার্টি কি ভাবছে…ওকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়, তাই না? কিন্তু তোমাকে বলছি, ও সবই বোঝে, জানে…"

মারীর উদ্দাম আনন্দ আছে, কিন্তু সে যেন বিষাদে ভরা। তাকে দেখে জোসেতের মনে পড়লো তার ছেলেবেলার কথা। জোসেৎ দেখলো মিলেৎ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে, আর মেয়েটি হাসছে, লাজুক সে হাসি। এই ভীরু ভালোবাসা ওদের গড়ে উঠেছে খানাতল্লাস, বিপদ আর নির্য্যাতনের ভিতরে। জোসেতের বুকটা ব্যথায় দুলে উঠলো।

যারা গ্রেফতার হয়েছে, তাদের পার্শেল পাঠাবার কথা ওরা বলছে, এমন সময় মাদো দরজার বেল টিপল। সে ঢুকেই বুঝতে পারল, সে এখানে খাপ খায় না—অপরিচিতই সে। 'তবে এলাম কেন? · ওদের এখন আমার সঙ্গে গল্প করবার সময় নেই"…মাদো অনুভব করল সে তার একঘেয়েমি আর করবেইয়ের কৃত্রিমতা নিয়েই যেন এসেছে। 'ওরা আমাকে ঘৃণাই করবে…"

মিলেৎ আর মারী চলে গেল পাশের ঘরে। মাদো এবার জিজ্ঞেস করলো:

"আঁরির কোনো খবর পেয়েছ ?"

"হাঁ, হেমন্তে তাব অসুখ হয়েছিল, এখন ভালোই আছে। কিন্তু অবস্থা বড সঙীন"···মাদো ভেবে পেল না আর কি বলবে, সে উঠে পডলো। সে কেমন হয়ে গেছে। জোসেতের তাকে দেখে দুঃখই হোলো।

"তুমি বাজনা ভাল বাসো না ? আমি তোমাকে একটু বাজিয়ে শোনাই · "

কোন্ গৎ বাজাচ্ছে ? মাদো ভাবল। গম্ভীর অথচ সহজ, সরল। এ ঝঙ্কার যেন গাছের পাতায় শিউরে ওঠে, বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে···তাহলে জোসেৎও শিল্প ভালোবাসে! দুই জীবনধারা তার। কিন্তু জোসেৎ তো তেমন নয়···সঙ্গীত তো সবার উপরে—তাকে বর্ণনা করতে হয় না, আঁকতে হয় না। সঙ্গীত হচ্ছে সময়। প্রথমে এল সূচনা, ইঙ্গিত—তার পরে পথ, বর্ষাধারা, জীবন, তারপর সব মরে গেল। এখন তো তাই। ট্রেন এখুনি ছাড়বে···মৃদু, আরো মৃদু হয়ে এল—এবার শেষ···

'ধন্যবাদ।'

মাদো এবার বিদায় নিলে।

বাইরে বড অন্ধকার, জোসেৎ বললো, "মিলেতের একটা টচ আছে, ও তোমাকে মেট্রো অবধি পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

পথিকদের টচের আলো জোনাকির মতো জ্বলছে। মিলেৎ উৎসাহভরে পথ আলো করে চলেছে—ওর সবেতেই এমনি উৎসাহ। হঠাৎ মাদো বলে উঠলো:

"মাদাম লে জাকে বোলো ভ্লাকভ তাঁকে আর আঁরিকে সম্ভাষণ জানিয়েছেন, আমি বলতে ভুলে গেছি···দেখ দেখি কি ভুল···ঐ জন্যেই ওখানে গেলাম।"

"কেন আমি মিথ্যে বললাম," মাদো নিজেকে জিজ্ঞেস করলো, "গব কি ? না তো ··তবু না বলে পারলাম না, ওই ছেলেটার কাছে ভ্লাকভের নামটা না করে পারলাম না। অন্ধকার তাই রক্ষে। ওর সঙ্গে আমার তো আর দেখা হবে না ··"

"নিশ্চয়ই বলব, আমি কমরেড ভ্লাকভকে চিনি, তিনি আমাদের দোকান দেখতে এসেছিলেন। তিনি সব বোঝেন, তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছি···ওরা যত খুশি মিথ্যে বলুক, আমি জানি রুশরা আমাদের সঙ্গে আছে। আমার ঘরে

একখানা ছবি টাঙানো আছে, আমি রিগার্ড' থেকে কেটে রেখেছি—ক্রেমলিনের ছবি। জানেন সেখানে কে থাকেন? ."

ল'াসিয়ে মাদোর ফেরার পথ চেয়ে অধীর হয়ে উঠছিলেন। মার্সেলিন বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন দেখে তিনি পাগল হয়ে গেলেন—নিজে কিছু সাহায্য করতে পারছেন না বুঝতে পেরে নিজের পুরুষত্বকে গাল দিলেন। তিনি রুদ্ধ স্বরে মাদোকে বললেন,

"মার অবস্থা খুব খারাপ। চুপ; বোধহয় এইমাত্র ঘুমিয়েছেন। কি সাংঘাতিক···ডাক্তার মোরিলো স্নায়ুতন্ত্রের কথা বলেন—হয়তো বা আমাকে মিছে ভরসাই দিচ্ছেন···"

মার্সেলিন ঘুমোননি, তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন। ফাঁড়া কেটে গেছে, এখন তিনি ভাবছেন, কেন অত ভয় পেয়েছিলেন। সে কি মৃত্যুর ভয়? না···এই জীবীতদের ছেড়ে যাওয়া বড় শক্ত। মরিস শিশুর মতোই অসহায়, তাকে যে কেউ ঠকাতে পারে, যে কেউ তার উপর অবিচার করতে পাবে, তাকে দিয়ে সাংঘাতিক কিছু করাতে পারে। লুই আছে সীমান্তে। মাদো ভাবি অস্থির, যেন পাগলই হবে এমনি ভাবখানা। স্বামীকে তিনি ভালোবাসেন, ছেলেমেয়েদের পালন করেছেন, পরিবারের সেবায় কাটিয়েছেন জীবন, আর এখন সব কিছু ধ্বসে পড়তে বসেছে।

ভোরের ঠিক আগে ল'াসিয়ে একটু বিশ্রাম করতে চাইলেন—মার্সেলিন এখন ঘুমোচ্ছেন। তিনি মাদোকে বললেন:

"কি ভয়ই যে পেয়েছিলাম। জানো, মা তো পাদ্রী ডাকতে বলেছিলেন।"

মাদো বসে রইল মার বিছানার পাশে। বিশ্বাসে কি সুখ! পাদ্রী ডাকলেই হোলো, অমনি মুহূর্তে হাল্কা হয়ে যাবে ··সার্জি বলেছিল, 'বিশ্বাস মানুষকে করতেই হবে'। হাঁ, সেও একটা কিছু বিশ্বাস করে···মিলেতেরও বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস করাটাই বড় কথা, জ্ঞানের থেকেও বড়। হাঁ, এও এক জ্ঞান, আবার তার চাইতেও কিছু বেশি ··যদি কিছুতে বিশ্বাস না করো তাহলে তো বড় ভয়ানক কথা···কিন্তু লুই? কিছু বিশ্বাস করে কিনা কে জানে! ·· ওর মন কুসংস্কারে ভরা, ও যা কিছু বলুক, অমনি কাঠ ছোঁবে, টেবিলে তেরো

জনের মধ্যে একেবারে শেষের আসনে কখনো বসবে না। হয় তো বৈমানিক বলেই এরকম ··ও সাহসী, কিন্তু যে সব চিঠি লেখে তা দুঃখের আমেজে ভরা। ওরা তো যুদ্ধ কাকে বলে জানে না, কিসের জন্য, কেন আর কেন?—তাও জানে না। সার্জি যদি ফিনল্যাণ্ডে থাকে সে বুঝতে পারছে···সে মৃত্যুকে ভয় করে না। মাও করেন না ··কিন্তু ওরা কত আলাদা। কি এলোমেলো ভাবছি·· !

সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জ্যোৎস্না রাত, গোল চাঁদ, উজ্জ্বলও আর খুব ঠাণ্ডা। চাঁদকে কেন প্রেমিকদের বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে? ওর তো কাঁদতে ইচ্ছে করছে···কাঁদ মৃত্যুর জন্য ঐ চাঁদের সৃষ্টি, ওর আলোয় সব বিষাক্ত হয়ে জমে গেছে, মরে গেছে। যদি মা মরে যান তাহলে···?

ভোর। মাদো চোখ মেলে তাকালো। কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না, কিছু ভাবছে না, শুধু মার ক্ষীণ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছে—যন্ত্রের মত একঘেয়ে শব্দ।

মিলেৎ জোসেতের কাছে ফিরে এল, খুব উত্তেজিতই সে হয়ে গেছে, কথা বেরুচ্ছে না। জোসেতের গলা সে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো, মারীর গলাও অমনি করে জড়িয়ে ধরে তার ইচ্ছে—কিন্তু বড় লাজুক ছেলে মিলেৎ। এবার সে বলে উঠলো :

"ভ্লাকভ তোমাকে সম্ভাষণ জানিয়েছেন, আরিকেও। বুঝতে পারছ? ভাবতে পার, তিনি আমাদের ভুলে যান নি। চমৎকার! আমাদের এমনি বন্ধুও আছে!"

সে ভাবনায় বিভোর, হঠাৎ সে ধীরে ধীরে জোসেৎকে জিজ্ঞেস করলো :

"ঐ মেয়েটি কি আমাদের কেউ?"

"না"।

"আমি কিন্তু তাই ভেবেছিলাম ··আমি ভেবে পেলাম না, ওর অতো দুঃখ কেন?···জোসেৎ তোমার কাছে আর ইশ্‌তেহার আছে?"

"পল আইভ্রির কাছে একটা প্যাকেট নিয়ে গেছে।"

"বেশ, আমাকে আরো শখানেক দাও। আমি মর্তকুজে যাব, মারী বাড়ী ফিরবে। ওর একটু ঘুমোনো দরকার।"

ওরা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেল।

জোসেতের মনে পড়লো মাদোর আসার কথা। ভ্লাকভের চিঠির কথা

এখানে বললে না কেন ? ··অদ্ভুত মেয়ে ··ওর সব কিছুতেই আন্তরিকতা ফুটে ওঠে, কিন্তু সবই তো ওর কল্পনা···আঁরিকে জানাতে হবে রুশ বন্ধু চিঠি লিখেছে ··রাত কম হয়নি, পল কোথায় গেল ? জোসেৎ বহুবার ছেলেকে এই গোপন আন্দোলনের কাজ থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছে : সে বলেছে, 'তুমি বড় ছোট, আর একটু সবুর করো।' কিন্তু বৃথা বলা। সে শুধু হেসে বলেছে, 'তুমি যদি তোমার সঙ্গে কাজ করতে না দেও আমি আমার যুব-কমিউনিস্ট সংঘে যাব। সে এখনো ছেলেমানুষ···মিলেৎ কেমন তার প্রেমিকাকে প্রশংসা করলো : 'সে সব কিছুই বোঝে আর জানে ··' ওরা এখনো ছেলেমানুষ ! ওদের এখন নেচে, নৌকো বেয়ে, ছুটোছুটি করে বেড়াবার সময়। কিন্তু এ বড় দুঃসময় ·

আঁরি লিখেছে, সব ভালো, কিন্তু কমরেডরা বলে—ওরা অপমান সইছে, অত্যাচার সইছে, ওরা ওদের পাগল করে দিতে চাইছে। কিন্তু ওদের নোয়াতে পারবে না, ভাঙতে পারবে না, ওদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি···এইসব ছেলে-মেয়েদের কি শক্তি ! ··আমরা অসংখ্য···শহরের অন্য প্রান্তে এখন হয়তো আর একজন মিলেৎ ইশ্‌তেহার আঁটছে। লিওন্স আর নিসেও ওরা আছে। আর আছে লণ্ডনে। হয়তো এমন কি বার্লিনেও ওদের দেখা পাওয়া যাবে এই ভাবনা জোসেৎকে সান্ত্বনা দিলে, সাথীদের হাতের স্পর্শ সে অনুভব করলো, উত্তপ্ত স্পর্শ ··এবার ক্লান্ত হয়ে সে এলিয়ে পড়লো কাউচে। পলের এখন ফিরে আসা উচিত···আঁরি তিনটে বালিস মাথায় দিয়ে শুতে ভালোবাসে। সে বলত, "আমি স্বপ্ন দেখছি"···সে কেমন আছে কে জানে ! মায়ের মতো সস্নেহে সে ভাবলো জেলখানার খাটিয়ার কথা, শীত, রোগ, নিঃসঙ্গতা সবই তার মনে ভিড় করে এলো। সে আত্মরতি কখনো করেনি, কিন্তু হঠাৎ তার মনে ঝলকে উঠলো একটা সত্যি—তারা পরস্পরকে ভালোবাসে—গভীরভাবেই ভালবাসে—শেষ অবধি, মৃত্যু পর্যন্ত সে ভালোবাসা থাকবে···।

## চব্বিশ

"এটা কি স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাপার? অধ্যাপক দ্যুমা করবেইয়ে থেকে বেরিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন।"

"এনজিনা পেক্‌টারিস, তারই প্রথম আভাস আজ দেখা দিল।"

তারা বহুক্ষণ নীরব রইলেন। দুজনেই তারা মাদাম লাঁসিয়ের জন্য দুঃখিত, দুজনেই তারা বৃদ্ধ—মৃত্যু তাদের থেকে দূরে লুকিয়ে নেই। তাছাড়া ভোজের টেবিলের ব্যাপারটা তাদের বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের মন মাসে লিনের অবস্থা থেকে ফ্রান্সের অবস্থায় চলে এল।

কিসের উপর যে তাঁদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে বোঝা যায় না, তাদের কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, কারো সঙ্গে কারো খাপও খায় না। দ্যুমা একজন মস্ত বিজ্ঞানী, আর ডাক্তার মোরিলো একজন সামান্য চিকিৎসক। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার নিয়ে খুব মাথা ঘামান না। তিনি তার ক্ষমতা সম্বন্ধে জানেন, তার পরিধিও সংকীর্ণ। তিনি বিজ্ঞানকে এক শ্রমসাধ্য ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন। দ্যুমাকে বরং উৎসাহী বলা যায়, আর মোরিলো সব কিছুতেই হাসেন আর বলেন, "যতই পরিবর্তন আসুক, সব জিনিষ কিন্তু ঠিকই থাকে।" কি আবিষ্কারে, কি সংস্কারে—কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই। তবু তাঁরা দুজনে দুজনকে পছন্দ করেন। অবিবাহিত দ্যুমা ডাক্তারের বাড়িতে বেশ সহজ হয়ে যান। একসময়ে তিনি মোরিলোর ছেলে পিয়ের আর রেনেকে পিঠে চড়িয়ে দৌড়ঝাঁপ করতেন। সে বহু দিনের কথা।

"রেনের কাছ থেকে কাল লম্বা এক চিঠি পেয়েছি", ডাক্তার বললেন। "সে এখন মেজিনো লাইনে আছে। ঐ নিয়ে ঠাট্টাও করেছে," সে লিখেছে: "আমরা যেন একশো বছর ধরে যুদ্ধ করছি এমনি মনে হচ্ছে। শান্তির কামনা আছে পুরোপুরি · রাতের নেশা নেই, অথচ যেন খোঁয়াড়ি আছে·· ওরা বলছে পিয়েরকে এপ্রিলে যেতে হবে। এমনি বাজনা যদি চলতে থাকে·· "

আবার তারা নিঃশব্দে চলতে লাগলেন. একই কথা তারা ভাবছিলেন।

মোরিলো এবার নীরবতা ভাঙলেন:

"আমার বোকামি হয়ে গেছে···কিন্তু কে ভেবেছিল? ···আমি এখনো

বুঝতে পারছি না ওরা রয়কে জানলো কি করে? কিন্তু অবাক হবার কিছুই নেই—এখন যাকেই কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে—সে হয় একেবারে নির্বোধ, নয়তো চূড়ান্ত পাজি। হয় তো মার্সেলিনের কথাই ঠিক, সে গোয়েন্দাই হবে··· এভাবে যুদ্ধ করা কি করে চলবে?"

দ্যুমা তর্ক করলেন না, আবার একমতও হলেন না। ওঁরা অন্ধকারে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন, এবড়ো খেবড়ো পাথর পা দিয়ে দেখে দেখে চললেন।

"ভয় কি, ঠিক গোলমালের ভিতর দিয়ে উতরে যাব", দ্যুমা হঠাৎ বলে উঠলেন।

"আমার কিন্তু সন্দেহ হয়। ফ্রান্স যেন একখানা সুন্দর বাড়ী, আমি সেকথা অস্বীকার করবনা, কিন্তু কেউ সে-বাড়ী রক্ষা করতে চায় না। তার কারণ, সবাই হয় তো মনে করে সে তো বাড়ীর কর্তা নয়। পরশু আমি এক রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। বার্টের কারখানার এক মজুর, প্লুরিসী রোগ হয়েছে তার। তার এক কারখানার বন্ধুও সেখানে ছিল। আমরা আলাপ করতে শুরু করলাম। ওরা দুজনেই অবশ্য কমিউনিস্ট বা অমনি কিছু হবে। ওদের রাগ দেখে কে? কোন কথা বিশ্বাস করতে চায় না। সবই বাজে বলে উড়িয়ে দেয়! ওদের কাছে কোগুলাররা নাৎসীদের চেয়ে সরেস নয়। এমনি সব কথা। বার্টির সঙ্গে বহুদিন দেখা নেই, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, এই সব দেশী মানুষের থেকে সে বিদেশী জার্মানদের বেশি পছন্দ করবে। দেশ চুরমার হয়ে যাচ্ছে, ধ্বসে পড়ছে, তাতে সত্যই অবাক হবার কিছু নেই—জাতিগুলো বুড়োদের মতোই জড়াগ্রস্ত। এবার মার্কিনরা লাফিয়ে এগিয়ে আসবে। তাদের কর্নেলী নেই, তাদের সম্বল মাত্র চিউইংগাম, কিন্তু তারা অতি তরুণ। আমরা আমাদের সময় পেরিয়ে এসেছি। তাই আর ভালো কিছু আশা করা বৃথা···"

তুমি বলছিলে না, "আমাদের প্রাহা ওদের হাতে তুলে দেওয়া হবেনা, রুশদের সঙ্গে চুক্তি করাও দরকার, তাহলে হিটলার আর যুদ্ধ করতে সাহস করবে না···। আমি জানতে চাই, কবে তুমি এই আশাবাদ ছাড়বে—বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে, না পরে?"

দ্যুমা কসে পাইপে টান দিলেন, জলন্ত ফুলকি উড়ে উড়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

"কেন ছাড়ব? ক্ষত এবার উপরে দেখা দিয়েছে। রয় কে? নিভেল

কে? দুষ্ট ব্রণ, তাছাড়া কিছু নয়! একটা জাতি কি হঠাৎ আত্মহত্যা করতে পারে? সে কি উচ্ছ্বাসপ্রবণ স্কুলের ছেলে? অথবা শেয়ারের বাজারের দালাল? জাতি হচ্ছে—রুটি, স্বেদধারা আর প্রতিভার সমন্বয়। জানিনা মানুষ কি করবে যখন তারা এই নোংরামিতে বাধা দিতে এগিয়ে আসবে। ফ্রান্স ঐ লম্বা টুপি পরা দালাদিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হতে পারে না, ঐ বদমায়েস খাদা-নাক বনেতের সঙ্গেও নয়। ভেবে দেখ রোবসপিয়ের আর সাঁত—জুস-এর পরে এইসব লোক এসেছে! যখন আমি কোনো চিত্রকরকে দেয়ালে ছবি আঁকতে দেখি, মুচি জুতোর তলায় হাতুড়ী ঠোকে, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী তার লাগায়—আমার মন তখনই চাঙা হয়ে ওঠে—ফ্রান্স এখনও বেঁচে আছে!"

"ডাক্তার, আমার কথা শোনো, আমরা হয়তো ভোর হওয়া দেখবো না, কিন্তু এমন অভিশপ্ত রাতের উপরই বা কি করে আস্থা রাখি বল..."

সত্যই এখন রাত, একটাও আলো নেই, পশমের মতো ঘন-ধূসর কুয়াশায় এই আঁধার মাঝে মাঝে একটু কমে, কিন্তু আজ তাও কমেনি। নিষ্প্রদীপ বাড়ির সার যেন নেই সেখানে। শহর তো নয় যেন অরণ্য। হঠাৎ আঁধারের ভিতর থেকে ভেসে এল এক শিশুর কান্না। ডাক্তার মোরিলো যেন সজীব হয়ে উঠলেন।

ঐ যে নতুন মানুষ—উত্তর পুরুষ, অধ্যাপক! একবিংশ শতাব্দীর নৃতত্ত্ববিদ ও।

তুমি কল্পনা কর, তোমাকে কি হিংসেই না ও করবে, তোমার ঐ মারী, তোমার চাটনি, পাইপ আর আশাবাদের জন্য। আমি নিশ্চিত জানি, যে ষাট বছরের ভিতরে আমাদের এই যুগকে গাথা-কাব্যের সামগ্রী বলেই মনে হবে, এক গ্রাম্য গাথা; এক স্বর্গ...'

উত্তরে দ্যুমা বিদ্রূপের শিস দিতে শুরু করলেন।

"তুমি যে দেখছি আনাতোল ফ্রাঁস আর কি!...আমি বুঝি না কি করে তুমি রোগ আরাম কর, তুমি তো কথার ভুবড়িবাজিতে সুস্থ মানুষকে কবরে পাঠাতে পার...পাহাড়ে ওঠার সময়ে, তোমার সব সময়েই মনে হবে, আর ওপরে না ওঠাই ভালো। যতক্ষণ না গিরিসংকটে পৌঁছলে ততক্ষণ এই ভাবনা...কিন্তু একবার রওনা হলে শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে..."

"দেখো, পড়ে যেওনা। সাবধান, এখানে একটা পাথর আছে।"

# দ্বিতীয় খণ্ড

# এক

নাতাশার থেকে ভালিয়া চার বছরের বড, তবু তাদের বন্ধুত্ব হতে দেরী হোলো না। না ভাব, না কথা—কোনোটাই ভালিয়া সুস্পষ্ট রূপ দেয় না, এইটেই নাতাশার ভালো লাগলো। সে যেন ধরা ছোঁয়া দিতে চায় না, নাতাশার মনে হোলো—আমার তো মনে হয় অভিনেত্রীরাই এইরকম হয়।... মস্কোতে ভালিয়া ভারি একা বোধ করছিল, পিকউইক ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গ পেতে ইচ্ছে করত, নাতাশার মত স্ফূর্তিবাজ আর কথুকী মেয়েকে সঙ্গী পেয়ে সে বর্তে গেল।

নাতাশা জন্মদিনের উৎসব করছে—বিশ বছর তার বয়েস। বাবা তাকে দিয়েছেন সুন্দর একটা হাতঘড়ী। মাঝে মাঝেই নাতাশা হাত তুলে কানের কাছে নিয়ে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'বাঃ ঠিক চলছে তো'—তার তো মনে হয় এমন ক্ষুদে-ঘড়ী তার অমন চওড়া লালচে হাতে চলতেই পারে না।

সুন্দর দিন। উজ্জ্বল উদ্দাম বসন্ত শুরু হয়েছে, সন্ধ্যেয় এলো অতিথিরা। ভালিয়া স্তেশেঙ্কো, ওলগা, হাঁ, আর ছিল ভাসিয়া। ওর বন্ধুরা যখন পার্টিতে কাকে কাকে বলা হবে নিয়ে জল্পনা করে, তারা প্রথমেই বলে—নাতাশা আর ভাসিয়ার নাম। ওদের আলাদা করে ভাবা যায় না। ওদের প্রায়ই দেখা হয়, কিন্তু কেন যে দেখা করে সে কথা ওরা নিজেরাই ভাবে না, ভাবতে চায় না। কথা যা বলার নাতাশাই বলে। ভাসিয়া হাসে, কিছু বলে না। ওদের প্রথম পরিচয়ের পর নাতাশার কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল—মেয়েটি চমৎকার! আজও সে একই কথা ভাবে। দিমিত্রি আলেক্সিয়েভিচ তার মেয়েকে একদিন বলেছিলেন, 'বুঝেছ তোমাদের ভ্লাকভকে আমার ভাল লাগে।' নাতাশা একটুও অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিয়েছিল—'নিশ্চয়ই, আমারও ওকে ভালো লাগে...'

নাতাশা সার্জিকেও নিমন্ত্রণ করেছে। একটা ব্যাপারে বহু জল্পনা-কল্পনা তাকে করতে হয়েছে: স্বামীকে বাদ দিয়ে ওলগাকে নিমন্ত্রণ করলে সে রাগ করবে না তো? দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ লাবাজভকে দেখতে পারেন না, নাতাশাও যে তাকে পছন্দ করে তা নয়। সে যেন বড় নিষ্প্রাণ...। তাই

লাবাজভকে আর নিমন্ত্রণ করা হয়নি। এতে ওলগা রাগ করলো বটে, কিন্তু বাইরে তা দেখালো না। সে শুধু বললো, সেমিয়ন ইভানোভিচ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার তাৎপর্য নিয়ে সুন্দর একটা প্রবন্ধ লিখেছেন।

তরুণ তরুণীরা উদ্দাম হয়ে উঠলো আনন্দে, কিন্তু দিমিত্রি আলেক-সিয়েভিচ যেন তাদের থেকেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেন। তিনি নাচ শুরু করে দিলেন। ভালিয়ার সঙ্গে নাচলেন ওয়ালৎস, সেই পুরনো ধরণের পায়ের কাজ, সঙ্গিনীকে এমন তাড়াতাড়ি পাক দিতে শুরু করলেন, ভালিয়া অনুযোগ না করে পারল না—

"দোহাই, দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ, আমার যে মাথা ঘুরছে···এবার জব্দ খেলা শুরু হোলো, শব্দ অনুমান করা, আবোল-তাবোল পদ্য বলা। এখানেও দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ সবাইকে টেক্কা দিলেন। একটা শব্দ ধরতে না পেরে তিনি জব্দ হলেন, খেসারতও দিতে হোলো। ভাগ্য গণনা তাঁকে করতে হবে। তিনি মাথায় জড়ালেন একখানা টার্কিশ তোয়ালে, তারপর নাতাশার ঘরে গিয়ে এক জোড়া তাস ছড়িয়ে বসলেন, কিন্তু কি মুশকিল, বিবি না সাহেব বড় এই নিয়ে ধোঁকা লেগে গেল, মাথাও বহু ঘামালেন। প্রথমে তার কাছে এলো নাতাশা। বাবা মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়ে উঠলেন:

"কে তুমি? তোমাকে দিয়ে হবে না! তুমি তো সবই জানো। বরং ছোকরাকে পাঠিয়ে দাও—" ভাসিয়া আসতেই দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ ভাগ্য গণনার কথা ভুলে গেলেন—তিনি তাক থেকে ছোট্ট একখানা কবিতার বই নিয়ে তাতে মন দিলেন, তারপর বইখানা মাথার উপর নেড়ে নেড়ে চিৎকার করে উঠলেন:

'ভারি অবাক কাণ্ড তো। কতগুলো এলোমেলো শব্দ, কিন্তু মনকে নাড়া দেয়, রহস্যঘন হয়ে ওঠে!

প্রশান্ত তুমি, তোমার কাঁধের পেছনে
আমি শুনি পাখার ধ্বনি···
আমার অন্তরে কার উজ্জ্বল চোখের কম্পন
সে যে ঝড়ের দূত—আস্রায়েল।

হাঁ—এই তো কবিতা। লাবাজভ কোনে যে 'নারী দিবসের জন্য বত্রিশ লাইন' গাঁক গাঁক করে চেঁচায়—এ সে জিনিস নয়।'

নাতাশা জিজ্ঞেস করলো :

"বাবা, তোমার ভাগ্য গুণে দিলেন ?"

"হাঁ, অবিকল", ভাসিয়া উত্তর দিলে।

ওলগার প্রশান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ একটু হকচকিয়ে গেলেন।

"হাঁ, মিনিটখানেক—তারই মধ্যে সব বলে দেব। আমার মা এমনি ভাগ্য গণনা করতেন—মনে কি শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেবে ? হাঁ, হাঁ শান্তি সে দেবেই ? ভাগ্যের ছলনা, তারপরে মনের কথা—তুমি তো জানোই—তারপরে আছে ভ্রমণ, আনন্দেরই হবে। জানিনা—অনাপা না, মালাকোভা—কোনটা তুমি পছন্দ কর—"

ক্রাইলভ সার্জির ভাগ্য আর গুনলেন না—যথেষ্ট হয়েছে।

"বল তো, পারীতে ওরা কেমন স্ফূর্তি করে। খুব নাচে বুঝি···একেবারে মেঝেতে চিড় না ধরিয়ে ছাড়ে না···"

সার্জি বহুক্ষণ ধরে বলে গেল, তিনি শুনলেন পারীর আমোদ-প্রমোদের কথা। হঠাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"ওদের জন্য আমি উদ্‌বিগ্ন। বিশৃঙ্খলার ওখানে বোধ হয় অন্ত নেই, জার্মানরা সারা শীতকাল ধরে তৈরী হয়েছে। বেশ, বেশ, ওরা খুব আমুদে শুনে খুশি হলাম,···কিন্তু গোণ্ডানিরও সামর্থ্য থাকা চাই, সইতেও জানা চাই··"

ভালিয়া দরজার কাছে ধীরভাবে অপেক্ষা করছিল : দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচকে দিয়ে ভাগ্যগণনা করাবার জন্য সে অধীর। কিন্তু তিনি ভুলেই গেলেন যে তিনি একজন গণৎকার। সে ঘরে আসতেই তিনি যেন রোগী মনে করেই খেঁকিয়ে উঠতে গেলেন। কিন্তু সময় মতো সামলে নিলেন, এবার তাঁর মনে পড়লো যে, তিনি একজন ফকির। তাসগুলো ছড়িয়ে দিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন :

"বার্দি, আলাসাগার্দি, বালাসাগার্দি···আমি সব দেখতে পাই···হাঁ একটি মেয়ে এল, আর একটি ছেলে। মেয়েটি তাকালো, ছেলেটি তাকালো··· আলাসাগার্দি···বুঝতে পারছ ? তুমি তাকে জিজ্ঞেস করলে, পারীর আজব সব গল্প শোনালে ছেলেটি। এবার যাও—নাচ গে ! ও তোমাকে ঘুরপাক খাইয়ে ছাড়বে, আর তো তুমি সে ঘূর্ণি থেকে রেহাই পাবে না···"

ভালিয়ার ভাবনা শুরু হোলো: তাইত, দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ জানলেন কি করে যে ওকে আমার ভালো লাগে? আমি তো বুঝতেই পারছি না। আমি নিজে তো জানাইনি—নিশ্চয়ই না…কিন্তু ওকে আমার ভালো লেগেছে, একথা সত্যি সত্যি। ওর ভাই সাধারণ মানুষ, কিন্তু ওতো তা নয়…ভারি অদ্ভুত লাগে—একজন ইঞ্জিনিয়ার কি করে কবি বা অভিনেতার মতো হয়। অমন একজনকে বন্ধু পাওয়াও তো ভালো।

"আচ্ছা আসি", সার্জি হাসলো, "আমি তো আপনার পদবী জানি না।"

"আলেকসিয়েভ্না।"

ভালেন্তিনা আলেকসিয়েভ্না। কিন্তু আমি কি আপনাকে শুধু ভালিয়া বলতে পারি না, যেমন দিমিত্রি আলেক্সিয়েভিচ বলেন?"

বহু পরে ভালিয়ার মনে হয়েছিল: ও আমার ভালিয়া নামটা এমনভাবে উচ্চারণ করেছিল, তাতেই মনে হোল আমাকে ওর ভালো লেগেছে…।

নাতাশাদের ওখান থেকে বাড়ি ফেরবার পথে সার্জির জামকভের সঙ্গে দেখা হোলো। দুজনে এক সঙ্গেই চললো। জামকভ তুললেন যুদ্ধের পরিস্থিতির কথা—পশ্চিমেও শীগ্‌গিরই যুদ্ধ শুরু হবে। হয় তো জার্মানরাই জিতবে, কিন্তু এমনি লড়ে লড়ে ওরা আর ভীষণ হয়ে উঠতে পারবে না।

…সার্জি আনমনা, সে ভাবছিল পারীর কথা, মাদোর কথা। জামকভ এক সময়ে চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বললেন:

"পেতিয়াকে আপনার মনে আছে? সেই যে যাকে লাবাজভের বিয়েতে দেখেছিলেন…শুধু এগিয়ে যেতে চায় বলে লাবাজভ ওকে ঠাট্টা করেছিল… সে যুদ্ধে মারা গেছে। কালই খবরটা পেলাম। নতুন বছরের আগের দিনের উৎসবে ও আমাদের সঙ্গে ছিল, তারপরেই ধরে বসলো ওকে ফিনল্যাণ্ডে পাঠাতে হবে। আমরা ওকে কথার তুবড়ি বলেই জানতাম… কিন্তু ও হোলো বীর। ম্যানারহিম লাইনে আক্রমণের সময়…মরবার পরে ও সামরিক সম্মান পেয়েছে। ওর মা এসে জানিয়ে গেলেন…। যাকগে, এবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আসা যাক্…"

সার্জি তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে পাশের এক রাস্তায় বেঁকলো। পেতিয়ার মুখখানা তার অস্পষ্ট মনে পড়ছিল। যুদ্ধকে যেন কাছে নিয়ে এসেছে মুখখানা, আরো কাছে…সে সেদিন নেচে, হেসে জীবন্ত করে তুলেছিল সন্ধ্যাটিকে…

সে বলেছিল সে লিখছে কতগুলি রেখাচিত্র · আমাদেরও তাই হবে…জানিনা ফরাসীরা কি করছে…ডাক্তার ঠিকই বলেছেন—সইবার শক্তি ধরতে হবে মানুষকে…

## দুই

প্রসব হতে দেরী-তো হোলোই কষ্টও পেল প্রচুর। সবাই তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক রিচেট—যিনি ঠাণ্ডা মাথার জন্য বিখ্যাত, এমন কি তিনিও ভেবেছিলেন লিওতাঁইন এ যাত্রা রেহাই পাবে না।

কিন্তু সে রেহাই পেল—বাঁচলো। পারীর বসন্তের উজ্জ্বল দিনগুলি সে বিছানায় শুয়ে ছেলেকে আদর করে কাটাতে লাগলো; সে তার উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল—চোখ তো নয় যেন ম্লান নীল এনামেলের দুটি বিন্দু; ওই চোখ দুটি তার কাছে যেন গভীর অর্থময় বলেই মনে হোলো। শুধু লিওর মুখের গঠনই পায়নি শিশু—পেয়েছে তার অভিব্যক্তি। ওর ক্ষুদে হাত দুটি দেখেতো সে আনন্দে আত্মহারা; তার কাছে সে বলে কত গল্প, শিশু যখন বুকে আঁকড়ে থাকে ওর তখন নিঃশ্বাস নিতেও ভয় হয়। সন্তান তাকে ভুলিয়ে দিল লিওর জন্য তার অসহ্য প্রচণ্ড উদ্‌বেগ।

সন্তান হবার আগে পর্যন্ত স্বামী তার সমস্ত জীবন পূর্ণ করে রেখেছিলেন। তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এক মজুরণীকে, হাজার হাজার মজুর মজুরণীর মতো পারীর এক শহরতলীর ধূলোভরা জীবনে সে গড়াচ্ছিল, তাকে তিনি দিয়েছিলেন সুখ আর শান্তি। তিনি ছিলেন লিওতাঁইনের থেকে বারো বছরের বড়। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন থিয়েটারে, শিল্পকলার রহস্য তাকে বোঝালেন, যে সব বই পড়েছিলেন তারই গল্প শোনালেন, নিজের অশান্ত যৌবনের গল্প শুনিয়ে তাকে আনন্দ দিলেন। তিনি এক ব্যর্থ নাট্যকারের আত্মা তাকে সমর্পণ করলেন, সমর্পণ করলেন সুবর্ণ অন্বেষীকে—যুগার্জিত সংস্কারময় পৃথিবীতে যাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। তিনি লিওন্স, আমেরিকা বা গভবারে যখন কিয়েভ-এ গেলেন সে শীতের অরণ্যের মতোই নিঃসাড়

হয়ে পড়ে রইল। আট বছর তারা একসঙ্গে কাটিয়েছেন, কিন্তু এখনো লিওর্তাঁইনের প্রেম প্রথম পরিচয়ের মতোই উদগ্র, তেমনি উদ্দাম। তখন সে ছিল বোকা মেয়ে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই সে লিওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল।

বহুদিন সে সন্তানের স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, তাই তার যখন তিন মাসের গর্ভ তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। সামরিক লম্বা কোট পরা লিওকে দেখে সে খুবই কেঁদেছিল, সে কল্পনায় দেখতো, লিও এক মুক্ত পরিত্যক্ত প্রান্তরে আহত হয়ে পড়ে আছে। তার স্বামী বৃথাই বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, নিরপেক্ষ বেলজিয়াম সীমান্তে শত্রুর গুলীর ভয় তার নেই, তিনি একঘেয়েমি ভরা শীতের সন্ধ্যার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু সে শান্ত হোলো না। লিও চলে যেতে তার চোখের জল বাগ মানলো না। চিঠি যে ক'দিন না আসতো, তার দিন কাটতো যন্ত্রণায়, এখন সে খানিকটা শান্ত হোলো: তাদের যে শীগ্‌গিরই আবার মিলন হবে, তারই যেন প্রতিশ্রুতি এই সন্তান তার ক্ষুদে মুখ এই সরলতা মাখা, এই যেন আবার বুদ্ধিতে গম্ভীর—লিওর্তাঁইন তারই মধ্যে লিওকে চিনতে পারলো। জানালার বাইরে বাদাম গাছে গাছে ফুল ধরেছে, তাদের দিকে চেয়ে তার এই ফিরে পাওয়া শান্তির আনন্দে সে হাসলো। সে এত খুশি হয়ে উঠলো যে, বিদার্তে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

তার থানা ভুলে বেঠিকানায় চলে গিছলো, তাই লিও ছেলের জন্মের খবর পেলেন দু'সপ্তাহ পরে। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে তিনি সবাইকে ডেকে ডেকে পড়ে শোনালেন লিওর্তাঁইনের চিঠি। পল্টনের সাথীরা, লেফটেনান্ট গার্টে, সরাইখানার মালিকের স্ত্রী, যেখানে ছাউনি পড়েছে সেই গ্রামের বাসিন্দেরা—কেউ বাদ গেল না। বিশেষ বিশেষ পংক্তি তিনি বার বার পড়লেন। স্বাভাবিক ওজনই শিশুর, ভারি চঞ্চল, মা তো লিখেছেন ঠিক বাপের মতো হয়েছে। মাদাম শার্দোনে বলেছেন, এমন সুন্দর শিশু তিনি জীবনে দেখেন নি। লিও ভেবে ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। এই চমৎকার ভদ্রমহিলাটি কে!

শুধু একটা খবরে তিনি মুষড়ে পড়লেন। তাঁর ছেলের নামকরণ হয়েছে রবার্ট। এতে অবাক হবার কিছুই নেই, সেই হেমন্তকালে ওঁরা ঠিক করে রেখেছিলেন যে, যদি ছেলে হয় তো তার নাম রাখবেন রবার্ট। লিও ভাবতেন,

পারীর নাগরিককে নাউম নামটা দেওয়া যায় না, কিন্তু বাবার কথা প্রায়ই তাঁর মনে পড়ে। তাই অন্তত ধ্বনিতেও সেই ম্লোবোদকার পাগলা দর্জির স্মৃতি জাগিয়ে তোলবার ইচ্ছে ছিল। আর তা ছাড়া তাঁর মাও ক্ষুব্ধ হবেন যে তার পৌত্রের নাম তার স্বর্গগত স্বামীর নামে হোল না। …কিন্তু উপায় নেই; তার ছেলে ফরাসী। লিও তার সাথীদের বললেন, "রবার্ট চমৎকার নাম—কি বল?"

পরদিন লিওর্তাইনকে চিঠি লিখবেন ঠিক করলেন। পিতা হবার যে আনন্দ তারই দীর্ঘ এক বিবৃতি। কিন্তু চিঠি শেষ না হতেই সাজেণ্ট দ্যব্রে ছুটে এল। সে উত্তেজিত চীৎকারে জানালো:

"জার্মানরা লাইন ভেঙ্গে ফেলেছে!…"

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হোলো। লিও মনে মনে গাল দিলেন: দ্যব্রেটা এরই মধ্যে মাতাল হয়েছে, অথচ এখনো দুপুরই হয়নি। …তিনি চিঠি শেষ করে খামে পুরলেন, এবার চললেন গ্রামের দিকে। এবার তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। গলানো লাভার মতো পথে বয়ে চলেছে জনতা: ঠেলা গাড়ী নিয়ে মেয়েরা, সদর ঘাঁটির বড় বড় গাড়ী আর মোটর বাসগুলি বেলজিয়ামবাসী, কনভেণ্টবাসিনী, গোলন্দাজ সেনা, শুল্কবিভাগের কর্মচারী বাপ-মার কোলচ্যুত শিশু, গাড়ীর চালকের দল, সেনাধ্যক্ষ বিহীন সেনাদল, সেনাদল বিহীন সেনাধ্যক্ষ, আসবাব বোঝাই লরী, ট্যাঙ্ক, পশুর পাল—সব যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে—সবাই স্রোতের মতো চলেছে দক্ষিণ দিকে। ওলটানো গাড়ী, চেয়ার আর প্যাকিং কেসে রাস্তার দুধার ভর্তি। হঠাৎ ভয় দেখা দিল, সেই স্রোত রোধ করে এমন শক্তি নেই। কেউ জানেনা, কি হয়েছে: তবু শোনা গেল, জার্মান ট্যাঙ্ক পেছনে এসে পড়েছে, স্যাপার বাহিনী সেতু উড়িয়ে দিতে পারে নি, সেনাপতিরা ঘুষ খেয়েছে, দুটি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে, ভস্মীভূত নগরের সার এখন পথের দুধারে, আর জার্মানদের শক্তিও অসীম—যত বাস্তুহারার ভিড় বাড়ছে ততো বেড়ে চলেছে গুজব। দক্ষিণ থেকে আসছিল সেনাদল, এই উন্মত্ত জনতার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হোল…পুলিশের কর্তার দল ভীত ম্লানমুখ আর্দালীর দল খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের সেনাধ্যক্ষদের, স্ত্রীলোকেরা পাগলের মতো গাড়ীর সারের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, চারিদিকে ধুলো ভরা গাড়ী আর ট্যাঙ্কগুলো, সীমান্তের অগ্রগামী

সেনাদল পেছু হটে এসেছে, তারা এই স্রোতকে আরো ফুলিয়ে—ফাঁপিয়ে তুলছে।

কে যেন হঠাৎ বলে উঠলো, পালানো বৃথা; জার্মানরা এখন সীমান্তে, কিন্তু জনতা থামল না, শুধু গতি বাড়িয়ে দিলো। লিও এই স্রোতে ভেসে চলেছিলেন। আঘাত অতর্কিতেই এসে পড়লো, লিওতাঁইনের কথা সেদিন ভোরেও তিনি ভাবছিলেন, তার সুমুখে যেন এসে দাঁড়িয়েছে সে, তেমনি কামনাময়ী, সুন্দরী লিওতাঁইন; সন্তানকে সে পালন করছে। যুদ্ধ কোথায়? এখন সে সুদূর নরওয়েতে···কিন্তু কি হোল? জার্মানরা কোত্থেকে এল?··· ফ্রান্সের কি শক্তি বেশী ছিল না, তবে? উদাসীনভাবে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, তারপর হেসে উঠলেন। তিক্ত হাসি: আমাদের কেমন ঠকিয়েছে ওরা! ···তিনি খবরের কাগজ ছিঁড়ে ফেলতে চাইলেন, ইচ্ছে হোল নিভেলকে গিয়ে এক চড় বসিয়ে দেন, পরিষদ সভায় গিয়ে কষে গাল দেন।

রাতে অনুভূতির তীব্রতা একেবারে উবে গেল, তিনি পথ থেকে কিছু দূরে মাটিতে বসে পড়লেন। ঘুম ভাঙলো ভোরে। গাড়ীময় পথের দিকে তিনি তাকালেন, অমনি মনে পড়ে গেল সব কথা। কি প্রতারণা! · আর ভয় তার নেই, তিনি রেগে গেলেন। ৬জন বাস-চালক পাগলের মতো—'জার্মান, জার্মান!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো, তাদের তিনি মনের সাধে গাল দিয়ে একটু হালকা হলেন। তারপর মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিলেন। যবের ক্ষেতে একটা পাখী কিচির মিচির করছে। লিও তারই উত্তরে গেয়ে উঠলেন: হাঁ এমনি মানুষই তিনি, সহজে মুষড়ে পড়েন না, তার প্রিয় গান গাইতে লাগলেন:

"যখন বসন্ত আসবে
ভাগ্য তো হাসবে তখন ··

সন্ধ্যের দিকে তার পল্টনের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হোল। লেফটেনাণ্ট গারচে কয়েকটি পল্টন থেকে জন পঞ্চাশেক সৈন্য জোগাড় করে নিয়েছিলেন। তারা এক ছাড়া গ্রামে রাত কাটিয়ে এসেছে। পরদিন তারা রিজার্ভ এক সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হয়, এবার তাদের উপর হুকুম এল, ট্রেঞ্চ খুঁড়ে তৈরী হয়ে থাকতে হবে। এরই মধ্যে এখানে ওখানে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছে। লিও ও শাবল নিয়ে উৎসাহ ভরে কাজে লেগে গেলেন, তারপর শুয়ে পড়লেন মাটিতে—কটা জার্মান বোমারু বিমান দেখা

দিল—আবার শাবল তুলে নিলেন—বোমায় ক'জন মরেছিল তাদের কবর দিতে হবে। রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষ জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। লেফটেনাণ্ট গারচে প্রধান ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এবার দেখা গেল সদর রাস্তায় কয়েকটা জার্মান ট্যাঙ্ক। সবাই চেঁচিয়ে উঠলো :

"আমরা এখানে কি করতে বসে আছি"।

"— এ এক জবর ফাঁদ !"

"গোল্লায় যাক ওরা ! জেনারেল এতক্ষণে পারীতে চলে গেলেন…"

দক্ষিণ দিকে ওরা এবার চলতে শুরু করল, পথ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে দূরেই চললো। একটা নদীর ধারে এসে থামলো। সেতু নেই : গারচে বললেন, 'এখান থেকে শত্রুকে ঠেকানো সোজা হবে।' 'ভোরের ঠিক আগেই ক'জন জার্মান চর দেখা দিল, লিও একজনকে মাটিতে পেড়ে ফেললেন, গুলী ছুঁড়তে তিনি অপটু নন। শিশুর মতোই খুসী হয়ে উঠলেন : যাক্ দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে ! জার্মানদেরও তাহলে রোখা যায় !—নির্বিঘ্নে সকাল কেটে গেল, লোকজনের মনে স্ফূর্তি, তারা প্রাতরাশ শেষ করলো। দুপুরে এসে পৌঁছিলেন একজন মেজর, গাড়ী থেকে না নেমেই তিনি গারচের মুখে সব শুনে বললেন :

'তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমি তোমার কথা জেনারেলকে জানাব। হাঁ, অবস্থাটা খারাপই বটে। হুকুম এসেছে—যে যেখানে লড়ছ, জায়গা ছেড়ে পালাও, ওইসের ধারে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলো !'

একমাস ধরে এই-ই চলেছে। লিও এরই মধ্যে এই ভয়ংকর খেলার নীতি ও কৌশল জেনে নিয়েছেন : নদী থেকে নদীর ধারে তারা পেছু হঠছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে, যখন জার্মান বিমান বহর এসে দেখা দিচ্ছে মাথার উপরে, সটান শুয়ে পড়ছে, মাঠের অন্ধকার পথে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে—তবুও জার্মানরাই সব দিকে এখন সামনে পথ আগলে আছে। সামরিক কর্মচারীরা প্রধান ঘাঁটিতে খোঁজ খবর নিচ্ছেন, কিন্তু কোন উত্তর পাচ্ছেন না—একটু প্রচেষ্টা নেই। কখনো কখনো আসছে হুকুমনামা—পেছু হঠতে হবে আবার ; কখনো বা কেউ…ট্রান্সপোর্টের কর্মচারীদের উপর হতাশায় খেঁকিয়ে উঠছে : 'ওরে পাজির দল থামা থামা।' কর্ণেল ক্যাপটেইনের কাছে বলছেন 'এবার

সব শেষ'—তারপর সামরিক ছেড়ে সাধারণ পোষাক পরছেন ;—ধর্মযাজকরা জোর দিয়েই বলছে; গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শাস্তি হিসাবেই এসেছে জার্মান ট্যাঙ্ক। কিছু করবারও নেই—শুধু পেছু হঠা আর পেছু হটা, দিনের পর দিন একই পুনরাবৃত্তি। অধিবাসীরা পালাচ্ছে তাদেরই সঙ্গে ; লিও একমাস ধরে দেখছেন একই লজ্জাকর আবৃত্তি—পথে পথে অবমাননার চিহ্ন পরিত্যক্ত বন্দুক, গ্যাস-মুখোস, টুপী আর চেয়ারের স্তূপ।

মানুষ তো এখন আর পালাচ্ছে না, পল্টনের পর পল্টন, কোনো এক নগরের মানুষও ছেড়ে চলে যাচ্ছে না, পালাচ্ছে গোটা দেশটা—পালাচ্ছে ফ্রান্স। তার কাণ্ডজ্ঞান নেই। এখনো সে জীবন্ত, উত্তেজিত আবার ভীতও বটে। মরতে সে প্রস্তুত, কিন্তু তবু সে একটা বাক্স, একটা নাচের পোষাক, ·একখানা টেনিস খেলার র‍্যাকেট বাঁচাতে চাইছে। গোটা দেশটাকে আর চেনা যায় না ; ধ্বংসীভূত, পরিত্যক্ত, বহ্নিমান। এ যেন এক বিরাট অরণ্য—চল্লিশ বছর ধরেও তা বুঝি পেরোনো যাবে না।

এবার সীন তাদের পেছনে—সীন!···ওরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরলো। আবার শাবল, বোমা আর পেছু হটা। ধ্বংসীভূত বাড়িগুলোর চেয়ে ঝিমিয়ে পড়া শান্ত বাড়ির সার আরো ভয়ংকর। এ যেন বিদার্তের সেই বাড়িগুলো। দেয়ালে দেয়ালে লতিয়ে উঠেছে সুগন্ধি উইসতারিয়া, গোলাপ বাগিচা, ফুটন্ত গোলাপ আর তার ডাঁটা—খোলা জানালা উদ্ঘাটিত করে দেয় শেষ মুহূর্তের রহস্য—শিশুর খুদে চেয়ারের পায়ের কাছে একটা বাটি, একখানা বই মেঝেতে পড়ে গেছে, একটা দাড়ি কামাবার ব্রাস, সাবানের ফেনা শুকিয়ে আছে।

"হাঁ, এই আমার বাড়ি", লিওর পাশে চলতে চলতে সৈনিক জানালো। সে হাসছে, বড় জোর হাসছে। সাথীরা চমকে পেছন ফিরে তাকালো, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। ছাড়া গ্রাম, শুধু উঠানে গরুগুলোর হতাশ চিৎকার। দুধ দোহাবার বুঝি সময় হয়েছে।

কেউ আর তর্ক করছে না, শপথও আর কারো শোনা যাচ্ছে না ; দীর্ঘ বিরতির পরে পরে ওরা হঠাৎ দু-একটা সংক্ষিপ্ত কথা এ ওকে ছুঁড়ে মারছে : 'জার্মান ট্যাংক' 'মারায়ের আর আয়ু নেই', 'আমরা গ্রামে পৌঁছতে না পৌঁছতেই শেষ হয়ে যাবে' 'একটু আগুন দাও তো হে।'···

ধ্বংসের স্তূপে লিও একখানা নীল নির্দেশ চিহ্ন দেখতে পেলেন। ওরলিন্স। বিদার্ত থেকে পারীতে ফেরবার পথে তিনি এখানে লিওর্তাইনের সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। এখানকার পুরানো বাড়িগুলো দেখে লিওর্তাইন তো অবাক, সে বলেছিল: কি অবাক কাণ্ড। এখানে একদিন কত লোকজন ছিল, আজ তাদের কথা কারো মনেও নেই, কিন্তু এখনো বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো কত সুন্দর, নতুন বাড়িগুলোর চেয়ে কতো ভালো—তাই না...' লোয়ারের পাড়ে একটা কাফেতে গিয়ে ওরা বসলেন তারপর, সুগন্ধি ফিকে রঙের মদ একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খেলেন, লিওর্তাইন বললো, 'আজ আমি তোমাকে চাই লিও—সেই যেমনটি প্রথম রাতে চেয়েছিলাম!'...

লিও নাক চাপলেন—বিকট গন্ধ! গুমোট দিন। কত মৃতদেহ চারদিকে পড়ে আছে, মিশে গেছে—নারী, শিশু, সৈনিক, ঘোড়া, একজন মোটাসোটা পাদ্রী আর তারই পাশে একটা খুদে কুকুর, উজ্জ্বল সাদা লোমে ঢাকা—মকমলের চেয়েও নরম...

দেয়ালে লেখার পর লেখা—জা, ৬।৫ তারিখের ভোরে এখানে ছিলাম। রোজের বেচে আছে।' 'লাসে আর তার পরিবার আঁগুলেমে চলে গেছে।' 'কারো যদি ক্যাপটেন দোলেবার্ডের সঙ্গে দেখা হয় তাঁকে বোলো আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে বুধবার এখানে এসেছিলাম।' পিয়ের আর তো প্রতীক্ষা করতে পারি না'...লিওর গলা বুজে এল অব্যক্ত ব্যথায়। হয়তো লিওর্তাইনও এখানে এসেছিল, কিন্তু দেয়ালে লেখার সময় সে পায় নি। সে হয়তো লিখতো: 'লিও, এখনো আমি বেচে আছি, রবার্টও বেচে আছে'...এখন সে হয়তো তাদের সন্তান নিয়ে এই বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের নীচে শুয়ে আছে। আবার তিনি নাক চাপলেন—কি দুর্গন্ধ...

'কি দুর্গন্ধ...পচে গলে গেছে,' একজন সাথী বললো, চল, এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি!...লিও চললেন তাদের পেছনে, যাবার আগে একবার তাকালেন। একটি স্ত্রীলোক দেয়ালের কাছে পড়ে আছে। হয়তো সেও কিছু লিখেছিল...

প্রতি শহর আর গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তিনি ভাল করে দেখছিলেন দেয়ালগুলি—গীর্জা, টাউন হল আর স্কুলের সাদা, ধূসর আর হলদে

দেয়াল। নামও তার চোখে পড়লো কত নাম। জঁা, লুইসি, ডেনিস, লুসি, থেরেস, মারী, ফ্রঁাসোয়া—কিন্তু লিওতাঁইন তো কোথাও নেই।...

মনে মনে হাসলেন লিও, লাখো লাখো মানুষের ভিড়ে কি করে একজনকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবু তিনি খুঁজতে খুঁজতে চললেন।

## তিন

সে এক ভয়ংকর দিন, যখন উন্মাদ পারী পরিত্যক্ত পারী থেকে চলে গেল। ঠিক সেই দিনেই মাদো এলো লিওতাঁইনের কাছে। ঠোঁট কামড়ে, লিওতাঁইন তাকালো তার দিকে—তার চোখ দুটি আয়ত, কিন্তু তাতে যেন দৃষ্টিশক্তি নেই। গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনার প্রবাহ তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। দিনে অন্তত দশবার সে খবরের কাগজ খুলে বসেছে, তাতে কি আছে জানতে চেয়েছে, বার বার ছুটে গেছে রেডিয়োর কাছে, তার কান্নায় ঘোষণাকারীর স্বর ডুবে গেছে, নরওয়ের যুদ্ধের কাহিনী ডুবে গেছে। সে বুঝতে পারলো না কাকে সে জিজ্ঞেস করবে, কি হয়েছে? ফ্রান্স কোথায়? সেনাবাহিনী কোথায়? কোথায় লিও? এক সর্বনাশা ছবি তার চোখে ভেসে উঠলো: এক বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত প্রান্তর, আর লিও তারই মাঝখানে পড়ে আছে, মুখ তার রক্তমাখা, বড় বেশি লাল আর ঘন রক্ত—যেন কৃত্রিম রং। সে তার সন্তানকে বুকে চেপে ধরলো; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুধু ডাকলো: রব,—রব!—

মাদো শান্ত, দুর্নিবার বিপদের শান্তি তাকে ঘিরে আছে। অবাক সে হোলো না, প্রশ্নও সে করলো না; বহু লোকের সঙ্গেই তার দেখা হোলো, তাদের মধ্যে সে-ই একমাত্র হতাশ হয়ে বসে রইলো। হয়তো সার্জি যে ভয়াবহ ছবি এ কেছিল, তাতেই সে সর্বনাশের জন্য তৈরী হয়েছিল। লাসিয়ে তখন উত্তেজিত—এ যেন জ্বোরো রোগীর উত্তেজনা। যখন মোরিলো জানালেন জার্মানরা ক্রয়েতে এসে গেছে, তিনি একটা স্যুটকেশ টেনে বার করে যত বাজে টুকিটাকি জিনিষ তাতে ভর্তি করে নিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ছুটে এল সাবাঁ। সে বললে, 'আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাই, রাশিয়া ইতালীর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।'…লাঁসিয়ে তাকে বিশ্বাস করলেন। মাদোকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, 'আমি বলিনি, রুশদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া করা উচিত নয়।' খোলা স্যুটকেশটা ফেলে তিনি এবার রেডিওর কাছে গিয়ে সেটা নিয়ে এক ঘণ্টা ধরে মস্কো ধরবার চেষ্টা করলেন। বহুক্ষণ পরে শুনতে পেলেন মস্কো থেকে ইংরেজিতে খবর বলছে। কি খবর—না, কৃষি প্রদর্শনী! লাঁসিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: ওরা আমাদের আবার বোকা বানাচ্ছে!…চল যাই!…

মাদোর উপায় নেই। সে তার বিচার-বুদ্ধি হারালো না, মাথা ঠাণ্ডা রাখলো—সারা পরিবারের কথাই তখন তাকে ভাবতে হচ্ছে। দু'সপ্তাহ আগে তার মার আবার অসুখ হয়। অধ্যাপক তখন বলছিলেন:—'ওর বিশ্রামটাই সবচেয়ে বেশি দরকার। দেশে যখন শান্তি থাকে, তখন অর্থনৈতিক সংকট কি পারিবারিক অসন্তোষ রোগীর কাছ থেকে চেপে রাখা যায়; কিন্তু আজ আর সে শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে?…উন্মাদ পারী। মনে হয়, এখুনি বুঝি ঐ ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি ওদের পৈঠে থেকে লাফিয়ে পড়ে লোয়ারের ওপারে ছুটে চলে যাবে। কিন্তু তবু মাদো মাকে শান্ত করে রাখলো। সে তাঁকে জানালো, পরিকল্পনা মতো শহর ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে, উনিশশো চৌদ্দ সালের মতো পারীর কাছে এলে তাদের অগ্রগতি এবার রুদ্ধ করা হবে না, এবার তার আগেই জার্মানরা হটে যাবে। আর খবর এসেছে লুইর কাছ থেকে—সে বেঁচে আছে—এখন সে সীমান্তে। লাঁসিয়ে আর শুনতে পারলেন না, তিনি মাথা চেপে ধরে ছুটে পালালেন—চোখের জলে যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে তার নিঃশ্বাস!

শেষ সন্দেহটুকুও যখন উবে গেল, লাঁসিয়ে পারী ছাড়বেন ঠিক করলেন। মাদো গেল লিওতাঁইনকে আনতে। সে তাকে ধীর ভাবে বললে:

"জানো, কি হয়েছে?"

লিওতাঁইন চেঁচিয়ে উঠলো:

'লিও?'

'না, না, শান্ত হও! তোমার স্বামীর কিছু হয়নি। আমাকে বিশ্বাস করতে পার, আমি হলফ্ করে বলছি, কিছু হয়নি তাঁর! চটপট পোষাক পরে তৈরী হয়ে নাও। তোমার কাছে আসতেই পারছিলাম না, সারা পথ গাড়িতে বোঝাই হয়ে আছে। মার শরীরও খুব খারাপ, কিন্তু উপায় যে নেই। …কাল আর উপায় থাকবে না। জার্মানরা সীন পার হয়েছে…।'

লিওর্তাইনের মাথায় তখন এক চিন্তা ঘুরছে, লিও তার কাছে নিশ্চয়ই আসবে, তার জন্যই ছুটে আসবে সে। এখন সে যাবে কি করে? সে এসে দেখবে ফ্ল্যাট শূন্য—না, না, তাহলে তো লিওর্তাইন আর তাকে খুঁজে পাবে না। আজকে তো আর সেনাবাহিনী নেই নেই ফ্রান্স। সে যদি বেঁচে থাকে, তার জন্যে সে ছুটে আসবেই। কিন্তু যদি সত্যিই সে স্বপ্নে-দেখা সেই মাঠের মাঝখানে পড়ে থেকে থাকে—তবে কি হবে?·· বেশ তো, তাহলে আসুক জার্মানরা, তাকে আর তার ছেলেকে খুন করুক!···তাকে পারীতে লিওর প্রতীক্ষায় থাকতেই হবে।

সে বুঝতে পারলো তার এই যুক্তি কেউ মেনে নেবে না, তাই সে মাদোকে মিথ্যে কথাই বললো—শান্ত, অতি শান্তভাবে সে তাকে বললো, ডাক্তার আসছে বাচ্চাকে দেখতে, সে অসুস্থ, তার পরে সে রওনা হবে, বোদে যা যাবে তার প্রতিবেশী অধ্যাপক সগারের সঙ্গে—তিনি তাকে নিয়ে যাচ্ছেন।

মাদো তর্ক করলো, পেড়াপীড়ি করতেও ছাড়লো না—লিওর্তাইন তার ছেলের জীবন বিপন্ন করতে পারে না। কিন্তু লিওর্তাইন এমনি দুর্বল আর বাধ্য হলে কি হবে, সে এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার উজ্জ্বল আয়ত চোখে দেখা দিল এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। মাদো সব দেখে শুনে আর কথা বললো না হঠাৎ সে ঝোঁকের মাথায় লিওর্তাইনকে চুমু খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো লিওর্তাইন লিওর প্রতীক্ষায়। পথে পথে অবিরাম কোলাহল—পারী গাড়ীতে, পায়ে হেঁটে আর ছুটে চলেছে—পারী! শিশু-ভর্তি মটর ট্রাক, সাইকেল-আরোহীর দল, ঠেলা গাড়ী—একটা আর একটার আগে এগিয়ে যাবে তারই চেষ্টায় অস্থির। অ্যাম্বুলেন্সের ভেঁপুতে, না শিশুর 'মা' মা' আর্ত চিৎকারে—কিসে যে তাদের হতাশা স্পষ্টতমো হয়ে উঠছে কে বলবে। নিবিড় কালো রাত, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেলেও কেউ নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছে। শহর এত অন্ধকার তো কখনো ছিল না···ভেঁপুর ভীষণ শব্দ, পায়ের শব্দ আর চিৎকারের একমুহূর্তের জন্যও বিরাম নেই। তবু লিওর্তাইন দাঁড়িয়ে রইল নির্জন সিঁড়ি থেকে পায়ের শব্দ উঠবে তারই আশায়। কিন্তু কেউ উঠে এল না—সবাই বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। সে রইলো লিওর প্রতীক্ষায়।

পরদিন সকালে তার হঠাৎ মনে হোলো লিও আর আসবে না। সে

তাড়াতাড়ি তুলে নিল তার শিশুকে, তারপর ছুটে নেমে এল পথে। পোর্তে দ্য ওরলিনসে যাবার দীর্ঘ পথ ধরে সে ছুটে চললো, মনে তার ভয়, সময় মতো জার্মানদের হাত থেকে সে পালাতে পারবে না। তার মনে হোলো লোয়ারে পৌঁছতে পারলে সে নিশ্চিন্ত—লিও সেখানে আছে। কিন্তু কিছুক্ষণের ভিতরেই শক্তি ফুরিয়ে গেল; সে বসে পড়লো কোনো বাড়ী থেকে ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া একটা চেয়ারে। পথে একখানাও গাড়ী দেখা যায় না; যাদের গাড়ী আছে তারা সবাই শহর ছেড়ে চলে গেছে। স্রোতের মতো চলেছে মানুষ, কারো কারো বা কাঁধে শিশুসন্তান। লিওতাঁইন দেখতে পেল একখানা ছোট্ট গাড়ী ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। সে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। চালকের আসনে টুপী-পরা একটা লোক। গাড়ী থেমে গেল। টুপি-পরা লোকটি একবারও জিজ্ঞেস করলো না সে কি চায়। কথার তো দরকার নেই, সবই তো সুস্পষ্ট। দু'জন স্ত্রীলোক আর একটি ছোট্ট মেয়ে পিছনের আসনে বসে আছে, তারা কি যেন চেঁচিয়ে বললো। টুপি-পরা লোকটি তারি পাশের একটা মস্ত বড় সুটকেশ টেনে নামিয়ে লিওতাঁইনকে বললো,

'ওঠ!'

প্রায় আশী মাইল তারা যেন হামাগুড়ি দিয়ে চললো—গাড়ীর পর গাড়ী; এবার গাড়ীর কল বিগড়ে গেল—ভোর অবধি তাদের বসে থাকতে হোলো। স্ত্রীলোক দুটি রবের ভার নিল। লিওতাঁইন বুঝতেও পারলো না, তারা কি বললে, তার মুখে ক্ষীণ হাসি, বার বার সে বলতে লাগলো: ধন্যবাদ আপনাদের হাজারো ধন্যবাদ!'...টুপি-পরা লোকটি চুপচাপ। তৃতীয় দিনে লোয়ার দেখা দিল—প্রশস্ত লোয়ার; সেতু নেই। দক্ষিণ পাড় বেয়ে তারা চললো। তারপর এক সময়ে থেমে পড়লো। গাড়ীর সার জমে আছে। সবাই বলছে দুখানা ট্রাকে ধাক্কা লেগেছে, পথ বন্ধ হয়ে আছে। হঠাৎ আকাশে শোনা গেল গুণগুণানি। টুপি-পরা লোকটি বললো যাও, 'ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়!' লিওতাঁইন একটা আলুর ক্ষেতের ধারে ছুটে গিয়ে সটান মাটিতে শুয়ে পড়লো। তার শুধু ভয় বাচ্চাকে হয়তো কেউ মাড়িয়ে যাবে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবার। লিওতাঁইন চাপা পড়ে গেল মাটির স্তূপে। তার মনে হোলো, এই বুঝি মৃত্যু। মনে মনে সে খুসি হয়ে উঠলো—আর তাকে ছুটতে

হবে না—ছোটার পালা তার শেষ, তারপর ভয় হোলো, ওরা আমাকে খুন করে ফেলতে পারে!—রব কেঁদে উঠলো, লিওতাঁইন শান্ত হোলো এবার।

টুপী-পরা লোকটি আর স্ত্রীলোক দুটিকে সে খুঁজলো, কিন্তু তারা তো চলে গেছে···

তারা কি চলে গেছে, না মারা গেছে? · কে জানে!

কয়েক ঘণ্টা এমনি শুয়েই তার কেটে গেল, তারপর উঠে আবার চলতে লাগলো। দুপুর রাতে সে গিয়ে পৌঁছলো এক বাড়ির দরজায়; ঘা দিল বার বার। রাতটুকু সে ঠাঁই চায় সেখানে। সে টাকা কবুল করলো, বাড়ির কর্তা বললো, "আমি টাকা চাই না", কিন্তু তার স্ত্রী ট্রেজারী নোটগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে বার বার বললো "কি বিপদ, কি ভয়ংকর বিপদ।···" লিওতাঁইনকে সে কিছু খাবার খেতে দিলে, তারপর তাকে নিয়ে গেল উপরে। "একটু বিশ্রাম করো বাছা"। লিওতাঁইন দু' রাত ঘুমোয়নি, সে এলিয়ে পডলো বিছানায়, ঘুম এল নেমে তার চোখে।

ভীষণ গোলমালে তার ঘুম ভেঙে গেল, সে জেগে উঠলো। তার মনে হোলো, কারা যেন দরজা ভাঙছে। বিছানা থেকে লাফিযে উঠে সে দেখলো, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সন্তানকে বুকে আকড়ে ধরে সে ছুটে বেরিযে এল বাড়ি থেকে। ধোঁয়ায় তার চোখ দিয়ে ঝরছে জল, মনে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি। কিছুদূর গিয়েই সে একটা নিশানা-পাথরের উপব বসে পড়লো। আগুনের শিখায় আকাশ আলোয় আলো, কালো আর লাল বঙের খেলা সেখানে। সে জামা খুলে ফেললো, রবকে মাই দিতে হবে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, মনে হোলো দশ যোজন দূর থেকে শোনা যাবে। কিন্তু কেউ শুনতে পেল না, জ্বলন্ত বাড়িগুলো থেকে সবাই জিনিসপত্র বাঁচাতে তখন ব্যস্ত।

ভোর হতেই যে চাষী তাকে বাতে ঠাঁই দিয়েছিল সে এল তার কাছে; সে একবার তাকিয়ে দেখলো, তারপর কোন কথা না বলে চলে গেল। কয়েকটি স্ত্রীলোক কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেল। তারা বললে, "ওর মাথায় কিছু একটা জড়িয়ে দাওনি কেন?"

লিওতাঁইন কেঁপে উঠে মরা ছেলেকে চেপে ধরলো তার বুকে। তার ঠোঁট কাঁপছে থর থর করে, চোখ বিস্ফারিত, সে চোখ বুঝি পলক ফেলতে

জানে না। রবকে কোলে নিয়ে সে দোলাতে লাগলো, তার মা যে ঘুম-পাড়ানি গান তাকে শোনাতেন, সেই গানই সে গাইলো কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বার হোলো না : "ক্ষুদে আমার খোকা, ঘুমোও, ঘুমোও

ক্ষুদে আমার পাখী ঘুমোও ঘুমোও

খোকা গো ঘুমোও

ক্ষুদে ছানা গো ঘুমোও !···

দুপুরে এল চারজন জার্মান ; তারা লিওতাঁইনের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। সে সারাদিন ঠায় বসে রইলো পাথরের উপর, দিন গেল, সন্ধ্যা এলো, তারপর এল রাত। ঠায় বসে থেকে কেটে গেল। পরদিন ভোরে একটি জার্মান সৈন্য এল তার কাছে, তার হাতে রেড-ক্রশের তকমা আঁটা। সে শিশুকে ওর কোল থেকে নিতে চাইলো—কিন্তু লিওতাঁইন নারাজ। সে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করলে। এবার সৈনিকটি ডাকলো তার সঙ্গীদের। তাদের মধ্যে একজন ফরাসী ভাষায় বললো :

"মাদাম ওকে কবর দিতে হবে।"

পাদ্রি ডাকা হোলো ; সেও সামরিক উর্দি-পরা একজন জার্মান সৈনিক। সে তার থলে থেকে বার করলো একটা জোব্বা আর প্রার্থনার বই, তারপর বিড় বিড় করে কি সব বললো। সৈনিকরা ঘেমে উঠলো। এত ছোট্ট কবর খোঁড়া হোলো, তারা যেন ফুলের বীজ পুঁততে যাচ্ছে। লিওতাঁইনকে এবার তারা শক্ত করে ধরে রাখলো—সে তখনো ধস্তাধ্বস্তি করছে। তার সন্তানের দেহ সে ছিনিয়ে নিতে দেবে না।

"বেশি মন খারাপ করবেন না, মাদাম, আপনার অল্প বয়েস, অমন কত সন্তান হবে আপনার।"

একজন সামরিক কর্মচারী বহুক্ষণ ধরে তার কাগজপত্র দেখছিল সে এবার বললো, "সিমিড্‌ট্‌, ওকে জমায়েতে নিয়ে যাও। ও পারীর অধিবাসিনী।"

লিওতাঁইনকে ওরা একটা ছোট্ট বনে নিয়ে গেল। এরই মধ্যে কয়েক শো লোক সেখানে এসে জড়ো হয়েছে—নারী, শিশু আর বৃদ্ধ তারা। লিওতাঁইন কাঁদলো না। সব কিছু সম্বন্ধেই সে উদাসীন। শিশুর কান্নাও তাকে তার স্তব্ধতা থেকে জাগিয়ে তুলতে পারলো না। একজন বৃদ্ধা তাকে কয়েকখানা রুটি আর চকোলেট দিলে। লিওতাঁইন তাকে ধন্যবাদ জানালো।

যে সব স্ত্রীলোকের সন্তান আছে, তাদের ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হোলো। লিওতাঁইন পোড়া সাদাটে পথ ধরে কয়েক মাইল হেঁটে অবসন্ন হয়ে ভেঙে পড়লো মাটিতে। তাকে এবার ট্রাকে তুলে নেওয়া হোলো। পারীতে ফিরে যন্ত্র চালিতের মতোই সে হেঁটে এসে পৌঁছলো তার বাড়িতে। ফ্ল্যাটের দরজা হাঁ করে খোলা। 'যাবার সময় আমি তো বন্ধ করিনি', লিওতাঁইন মনে মনে ভাবলো। ঘরগুলো এলোমেলো হয়ে আছে, নিশ্চয়ই কেউ এর মধ্যে কাবার্ডগুলি খুঁজে গেছে। পোশাকগুলি, লিওর স্যুট, গলাবন্ধ, স্নানের পোষাক, ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। পোশাকগুলি দেখতে দেখতে লিওতাঁইন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। ওদিকে পথে পথে দুপুর রাত অবধি চললো জার্মান সৈন্যের পানোম্মত্ত চিৎকার আর গান :

ভ্যালেরী—ভ্যালেরা !
জুচেইরাস্সাসা।

## চার

মাদো ত্যুরের কাছে সেই সন্ধ্যার কথা মনে করে শিউরে উঠলো। তেমনি প্রথম গ্রীষ্মের উজ্জ্বল সন্ধ্যা, যখন জেসমিন ফুলে ফুলন্ত হয়ে ওঠে প্রকৃতি—মাটি তখনো জুলাই-সূর্যের দাহে পুড়ে থাক্ হয়ে যায়নি, তখনো তার সবুজের সমারোহ আছে, আছে প্রতিশ্রুতি। চারদিকে আঙুরের খেত, শ্লেটের ছাদ, আবহাওয়া-মোরগটাকে দেখা যাচ্ছে মিনারের চূড়ায়। লাঁসিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পথে, তারই পাশে চেরী ঝোপ ফুলে ফুলে ভরা। মার্সেলিন দলিত ঘাসের শয্যায় শুয়ে, মুখ তার বিকৃত হয়ে গেছে ব্যথায়। যেন কেউ তার বুকখানা পাথর দিয়ে ঘা মেরে মেরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তিনি ভাবছিলেন, ওরা আমাকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছে।

পেট্রল ফুরিয়ে গেছে ওদের—তিন ঘণ্টা ওরা দাঁড়িয়ে রইলো। একজন সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে যাচ্ছিল, সে জানালো জার্মানরা প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে আছে। লাঁসিয়ে বিড় বিড় করে বললেন : ওরা তাহলে এখন ত্যুরের কাছে। মাদো, শুনছ, ওরা এখন ত্যুরের কাছে !…গাল বেয়ে তার চোখের

জল গড়িয়ে পড়লো। মাদো তাকালো তার মার দিকে, কিন্তু সে ভেবে পেল না মাকে নিয়ে কি করবে।

বার্টি এসে ওদের বাঁচালো। লাঁসিয়ে তার এমনি হটাৎ এসে পড়াকে দৈব ঘটনা বলেই মনে করলেন, কিন্তু বার্টি মাদোর কাছে স্বীকার করলো সে সব সময়েই তাদের পেছনে পেছনে আসছিল। যখন তাদের গাড়ি অচল হয়ে যায় সে তুর‍্যরে গিয়ে প্রকাণ্ড এক গাড়ী যোগাড় করেছে। মাদাম লাঁসিয়ের এবার নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারবেন, তাদের বোর্দোয় নিয়ে যাবার মত যথেষ্ট পেট্রোল আছে। বার্টি সবই পরে জানালো। শুধু এখন সে ছুটে এসেছে লাঁসিয়েকে শান্ত করতে। জার্মান অগ্রগামী ফৌজ এখনো প্রায় তিনশো মাইল দূরে, এবং মাদাম লাঁসিয়ে তুর‍্যরে নিরুদ্বেগেই রাত কাটাতে পারবেন; সে এ কথাও বললো যে সে ঘরও একখানা অতি কষ্টে ঠিক করে এসেছে, আর তা নিশ্চয়ই রোগিনীই পাবেন।

লাঁসিয়ে গভীরভাবে বিচলিত হয়েই বললেন, "তুমি মার্সেলিনকে বাঁচালে। এই নিয়ে দু'বার তুমি আমাকে বিপদ'থেকে বাঁচালে। প্রথম বারে টাকা দিয়ে বাঁচিয়ে ছিলে, এবার করলে এই সাহায্য। এমনি মুহূর্তেই মানুষ প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পায়...।"

'আঙুরের ক্ষেতেই বা শুধু কেন?' মাদো ভাবলো, "সেই দুর্গটাও তো আছে। কবিরা তাকে নিয়ে লিখলেন কবিতা, পরিদর্শক বিদেশী পর্যটকদের কাছে দেখিয়ে বেড়ালো তার হলের পর হল, ছাদ তার এঁকে বেঁকে গেছে, বাগানে ঝরছে ঝরণা...। এক ভঙুর কল্পনার জগত, সে জগত আজ আর নেই, ধ্বসে পড়েছে। এক টিন পেট্রোলের জন্য মানুষ আজ লিমোসিন গাড়ি দিয়ে দিচ্ছে। সব কিছু তারা ছেড়ে পালাচ্ছে, দোকান, বাড়ি, ঘর, ছবি—সব কিছু। আর কবি অভিশাপ দিচ্ছেন এক গেলাস জলের জন্য। সবাই উলঙ্গ, ফ্রান্সও তাই। এক সময়ে যে পুসিন এখানে ছিলেন, আজ আর তার কোনো দাম নেই। এই পার্কে বসে যে বধির রোঁসার কবিতার ধ্বনি শুনতেন, আজ সে কথা কে মনে রাখে! সে তো তুচ্ছ বুদ্‌বুদ, মানুষ আজ অন্য কিছু নিয়ে বাঁচছে,—হয়তো তা রুটি, হয়তো তা রক্ত ..."

বার্টিকে ধন্যবাদ, ওরা নির্বিঘ্নে বোর্দোয় এসে পৌছলো। এখানে লাঁসিয়ে একটু চাঙা হয়ে উঠলেন, হয়তো জার্মানদের বাধা দেওয়াও যাবে।...পরিচিত

মুখ দেখে শান্ত হলেন লাঁসিয়ে—পদে পদে পারীর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সবাই যদিও বলছে, আর উপায় নেই, কিন্তু এই সব মানুষ, যাদের সঙ্গে তার সুখের দিনের সম্বন্ধ, তাদের দেখে তো মনে হয় ফ্রান্স এখনো মরেনি। এ যেন এক প্রতিশ্রুতি, এক শপথ, সে শপথ বুঝি ভাঙবে না। এই তো, তিনি নিজেই বলেছেন যে, কোনো আশাই নেই, কিন্তু এমন তিক্ত কথা বলতে গিযেও তার মুখে হাসির রেখা খেলে গেছে। নিজের মনে মনেই তিনি এ আশা পোষণ করেন যে তিনি একটু উত্তেজিত হযেই পড়েছেন, এবং একটু অতিরঞ্জনই করছেন, এমনি অভ্যেস তো তার আগে থেকেই আছে। মার্সেলিনেরও ভালো লাগলো। অনেক ভালো তিনি এখন। একজন তাকে খবর দিলে লুই বেঁচে আছে, আর বেশ ভালোই আছে—তাকে সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে দেখা গেছে। লাঁসিয়ের মনে পড়লো বিদার্তের কথা—জার্মানরা সেখানে কখনো যেতে পারবে না। লিওতাঁইন সেখানে নিশ্চযই আছে, আর হযতো লিওও সেখানে এসে মিলবে।..আর পেট্রলের ভাবনাই বা কি, বার্টিই খানিকটা যোগাড় করবে।

আগের বোর্দো আর নেই, তার চেহারা বদলে গেছে। তার স্থাযী বাসিন্দেরা বিভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল আত্মসচেতন পারীবাসীদেব ভিড়ে হারিযে গেল। এরা যে বাস্তহারা একথা এখনো মনে হযনি, তাবা যেন স্টীমারের ডেকে ভিড জমিযেছে। তারা কাফেতে ঘুমোচ্ছে, খবরের কাগজের অফিসে অফিসে ভিড জমাচ্ছে, আত্মীয়স্বজনের খবর জানবাব জন্যে তারা অধীর। আর আছে লড়াইয়ের খবর জানবার অধীরতা, পরস্পরের কাছে গুজবও তারা রটাচ্ছে—আমেরিকা এবার বাধা দেবে, সরকাবের সংকট উপস্থিত, শান্তির কথাবার্তা চলছে।

লাঁসিযে তর্ক করলেন ঃ

'আমাদের ঐ অচল শান্তিকেই মেনে নিতে হবে—অবস্থা একেবারেই আশাপ্রদ নয়।...'

দু'দিন পরে ভীতির ঝড বয়ে গেল বোর্দোতে। শহরের উপর পড়লো বোমা। হতাহতের সংখ্যাও বহু। মানুষ দেখল স্ট্রেচার, শব আর পিচের রাস্তায় রক্ত। শহরে সৈন্যের ভিড়, দাড়ি কামানো হয়নি তাদের, স্নানও হয়নি বহুদিন—আর তারা ক্ষুধার্ত।

সৈন্যেরা বর্ণনা করলো তাদের অভিজ্ঞতা—জার্মানরা যেন সব কিছু তছনছ করে দিয়ে ছুটে চলেছে, এ যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা ;—আর তাদের ট্যাংক-প্রতিরোধকারী কামান নেই, তাছাড়া যোগসূত্রও ছিন্ন। যাদের এখনো উন্মাদনা আছে, তারা ছুটে গেছে স্পেনের সীমান্তে। এবার রুটির বরাদ্দে ঘাটতি পড়তে শুরু হোলো, দলে দলে মানুষ শুধু শুনছে, জার্মান বেতারের ঘোষণা। স্টাটগার্ট দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিচ্ছে, বোর্দ্যোর নাভিশ্বাস উপস্থিত, আর ক'ঘণ্টা মাত্র তার আয়ু।

ল'াসিয়ে তবু বলছেন,—

"আমি তো বুঝতে পারছি না মাদো, কি হোলো···আমি ভার্দ্যুনে ছিলাম। ছোকরারা যা ইচ্ছে তাই বলুক না, কিন্তু আমি তো জানি ফরাসীরা ভীরু নয়। কিন্তু জার্মানরা আসছে দেখনা, মনে হয় যেন গাড়ি দাবড়ে বনভোজনে চলেছে। কাল তারা আরো একশো কিলোমিটার এগিয়ে এসেছে। আমাদের ট্যাংক-প্রতিরোধকারী কামান কোথায়? দোহাই তোমার, বল তো, কি হচ্ছে!"

"আমাকে জিজ্ঞেস করে কি হবে? বন্দুক কি করে ছুঁড়তে হয় তাই-ই আমি জানি না···সব কিছুই এখন ভাঙনের মুখে। তাসের বাড়ি যেন, কিন্তু আমরা সেদিনও মনে করতাম এই সাবানের ফেনা চিরদিনই টি'কে থাকবে। আমাদের তাই মনে হোত—কিন্তু আমরা বিশ্বাস তো করতাম না। হাঁ, কোন কিছুর উপরেই আমাদের বিশ্বাস ছিল না—"

মাদো ভাবলো: "আমি তো সার্জির কথাই বলছি, হাঁ, ও যা বলত তাই আউড়ে যাচ্ছি। আজকাল ওর কথা খুব কমই মনে হয়, কিন্তু এখন তো ও যেন আমার হয়েই কথা কইছে।"···

"কি বোকামি—আমার মতো একটা পাগলীর আবার কোন বিশ্বাস আছে নাকি?···শুধু এখনই আমি জীবন কি জানতে পেরেছি।"···

ল'াসিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন:

"না, না, মাদো, ফ্রান্স সাবানের ফেনা নয়। যা বলবে ভেবে বল। এর আর একটা ব্যাখ্যা আছে—সে হচ্ছে রাজনীতি। হাঁ, রাজনীতির ফ্যাঁকড়া বড় বেশি। ওরা বলে সেনাপতিদের দোষ—অবিশ্যি আমি তা ঠিক কিনা বলতে পারব না, কিন্তু রাজনীতিজ্ঞদের দোষ যে পুরোদস্তুর একথা আমি ঠিকই জানি।

আমাদের যখন বিমানের প্রয়োজন, ওরা তখন তুমুল তর্ক শুরু করেছে, সংকট আর ধর্মঘটের জন্ম দিয়েছে···যদি পেঁতা আজ ফ্রান্সের সর্বাধিনায়ক হন, তা হলেই আমাদের মুক্তি আসবে। তিনি জার্মানদেব প্রতিরোধ করবেন—তিনি রাজনীতিজ্ঞ নন, তিনি একজন পুরনো সৈনিক।”

লাঁসিয়েরা ডকের কাছে একটা ছোট্ট হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। আগে এই হোটেলে এসে উঠলেন। তংনো এই হোটেলের আসা-যাওয়া করত। ছোট খাটো নৌ বিভাগের কর্মচারী, জাহাজী আর কাছাকাছি পানশালা আর বেশ্যালয়ে ফতুর হয়ে যাওয়া সৈনিকের দল। ঘবের সব কিছুতেই পানোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতা আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ছাপ—ফেটে চৌচিব আরসী, নোংরা টেবিল, দাগী দেয়াল। এই পাবিপার্শ্বিকতা মরিস লাঁসিযেব মনের অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে—তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করছেন—যেন ভিখাবী বনে গেছেন—ফ্রান্সকে তাঁর কাচ থেকে ছিনিযে নেওয়া হযেছে—। এই কিছুদিন আগেও তার জীবনে ছিল সংহতি আর সঙ্গতি—হাঁ, তিনি তা পেয়েছিলেন বই কি! লাতিন কোয়ার্টাবে তার যৌবনের দিনগুলি, মার্সেলিন, ভাহ্নন, তার কাজ, তার পরিবার, তার বইয়ের সংগ্রহশালা ··এখন অতীতের স্মৃতিতে শান্তি নেই, সে তাকে মনে কবিযে দেয় সে জীবন ছিল কত তুচ্ছ। একটা স্বপ্ন যেন—হয়তো সুখস্বপ্নই হবে—কিন্তু তবুও সে তো শুধু স্বপ্ন।—তখন কত বন্ধু ছিল তাঁর, কিন্তু আজ জরুরী কথা নিয়ে আলোচনা করবার মতোও কেউ নেই। সবাই এখানে আশ্রয়ের খোঁজে ব্যস্ত সবাই খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে, পেট্রলের সন্ধান করছে। সবাই অস্থির, তিরিক্ষি তাদের মেজাজ। কিন্তু বার্টি শান্ত, কিন্তু তার সঙ্গে কথা কওয়া অসম্ভব—সে সব সময়েই তর্ক করে—আর সে তর্ক ন্যায়সঙ্গতও বটে—কিন্তু সব সময়েই তো ন্যায় শাস্ত্রের এই কচকচি ভালো লাগে না—অসহ্যই মনে হয়।···

“দেখ, দেখ, কে এসেছে!' লিও এসে ঢুকলো এই বিশ্রী হোটেলে! তারা নিঃশব্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন, —কথা বলতে কেউ পারলেন না। লিওর পরণেসাধারণ পোষাক, উর্দি নয়। রোগা হয়ে গেছেন তিনি, বিশ্রী তার চেহারা, কিন্তু মুখের রোদ-পোড়া তামাটে রং দেখে তাকে অল্প বয়েসী বলেই মনে হয়। লাঁসিয়ে মনে মনে ভাবলেন, ভারি আশ্চর্য তো—কিন্তু ওর চেহারা তো ভালোই আছে।···

"লিও, কোথা থেকে এলে ?…"

"বিদার্ত থেকে। লিওতাঁইন কোথায় ?"

"সে সগারের সঙ্গে গেছে।"

"সগারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সে ওর খবর জানে না ..."

"হয় তো সে পারীতেই আছে", মাদো বললে।

লঁাসিয়ে লিওকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন।

"পারীতে যদি থাকে তো ভালোই করেছে। রাস্তায় যে কি ঝক্কি সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না !" ..

"আমি জানি…"

"আমাদের কি করে খুঁজে পেলে ?"

'আমার মনে হোলো, তোমরা বোর্দ্যোতেই আছ। আর কোথাযই বা যাবে, গোটা পারীটাই তো এখানে এসেছে—তাই না ? কাল সারাদিন তোমাকে খুঁজেছি। সবাই তোমাকে এখানে দেখেছে, কিন্তু কেউ আর কোন খবর দিতে পারলো না। ভাগ্যি ভালো, আমার চট করে বাটির কথা মনে পড়লো। ভাবলাম, তাকেই জিজ্ঞেস করব। লুইর খবর কিছু পেয়েছ ?"

"কেউ বললে, তাকে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে দেখা গেছে—জায়গাটা তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ, ওখান থেকে জেনিভায় যেতে পারবে। আমাদের পুরাণো বন্ধু সার্জেন্ট আর তার স্ত্রী সেখানে আছে। আচ্ছা, লিও, বল তো, কি ব্যাপার ? তুমি বুঝতে পারছ কিছু ?"

"না, আমিও বুঝি না। আবার মাঝে মাঝে ভয় হয় বুঝি বা ভাল করেই বুঝি। এ এক বিলক্ষণ তামাসা ! আমরা লড়তে চেয়েছিলাম। হঁা, আমাদের মধ্যে সব চেয়ে যারা ভীরু তারাও তাই চেয়েছিল…কিন্তু শুধু দৌড়ের উপর থাকলে কি আর সুখ থাকে, আর লাভের মধ্যে যখন তোমার উপর যখন তখন বোমাও ফাটছে..। কিন্তু একটা কথা বুঝি না—আমাদের সেনাপতিদের ব্যাপারখানা কি—তারা কেমন ? কেউ কিছু বলতে পারে না। জঁাদরেল সেনাপতিরা সহজভাবে বলছেন, আমাদের গ্রেফ্‌তার কর ; সামরিক কর্মচারীরা সাধারণ মানুষের পোষাক পরে বলছে : আর কি, সব শেষ হয়ে গেছে।… এমনও সময় এসেছে, আমরা জার্মানদের বাধা দিচ্ছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুকুম এসেছে, 'পেছু হটো !' কোনো কিছুই তৈরী নেই—না ট্যাংক-প্রতিরোধকারী

কামান, না বিমান বহর। তুমি বহু সময়ে বলেছ, আমি খাঁটি ফরাসী দেশের মানুষ। হয়তো তা সত্যি, তাই বুঝি এখন আমার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে ইচ্ছে করছে। ঐ ভদ্রলোকেরা তো অভিনয় করছেন, আর সে আত—অভিনয়ই বটে। যদি বিপ্লব হয়, সে-বিপ্লবে প্রথম যোগ দেব আমি। এ সব দেখার থেকে মরাও ভালো! ···

মনে মনে লাঁসিয়ে লিওর কথায় সায় দিলেন, কিন্তু লিওর চড়া স্বর আর তিনি যেসব কড়া কথা বলছেন, তাতে তিনি খুসি হতে পারলেন না।

"বিপ্লব হলেই একেবারে সব সুরাহা হয়ে যাবে না, দেশ তো ধ্বংস হয়ে গেছে, আর নতুন ধাক্কা কেউ সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না। তোমরা তাহলে লড়াই আর করবে না ঠিক করেছ?"

"না, না, তা নয়। সেনাপতিরাই লড়াই বন্ধ করে দিয়েছেন···আমি যে এই ভদ্র পোষাকে এলাম তার মানে, তোমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার আমার ইচ্ছে ছিল না। শতছিন্ন হয়ে গিছলো আমার উর্দি···আমার পল্টনেরও পাত্তা ছিল না। অন্য সেনাবাহিনীতে আমাকে ভর্তি করে নেবার জন্য এইমাত্র সামরিক দপ্তরে দরবার করে ফিরছি, কিন্তু সেখানে তারা বলছে, দোকান-পসার বন্ধ করবার সময় হয়ে এসেছে···পাজির দল! কোথায় লিওতাঁইন! কোথায় আমার ছেলে? কেউ নেই!···তারা রেণু রেণু হয়ে গেছে!"

রাতে ওরা একটা রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেন। মুহূর্তের জন্য মনে হোলো তারা যেন পারীতেই আছেন। জার্মানরা নেই, ধ্বংসস্তূপ নেই—সাদা টেবিল-ঢাকনা, মেয়েদের হাসি মুখ, বাধ্য পরিচারকের দল···তারা নিঃশব্দে ধুমপান করতে লাগলেন। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সব···পেতাঁর স্বর ভেসে আসছে বেতারে। ভাঙা গলা, বার্ধক্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বললেন, আর প্রতিরোধ করে কোন ফল হবে না, তাই তিনি শত্রুর কাছে যুদ্ধ-বিরতির আবেদন পেশ করেছেন।

লাঁসিয়ের চোখে জল।

"লিও, শুনছ?···এইত খাঁটি ফরাসী মানুষ! রাজনীতিজ্ঞ নয়, একজন সৈনিক!···

"কি লজ্জা!" লিও গর্জে উঠলো, "এর চেয়ে বেইমানি আর আছে!···আমি তোমাকে বলেছি, আমার ভাই একটা ক্ষ্যাপা—আমি ভেবে পাই নি ওরা

কি ভাবে বেঁচে আছে ··কিন্তু আমি তো ক্ষ্যাপা নই—তুমি তা বুঝতেই পারছ ? কিন্তু তবু আমি এখুনি পথে ছুটে গিয়ে জোর গলায় আমার সাথীদের ডেকে বলতে পারি ··হাঁ যাদের সঙ্গে আমি পার হয়ে এলাম অভিশপ্ত প্রান্তরের পর প্রান্তর · আমি তাদের কাছে চেঁচিয়ে বলতে পারি : গুলী চালাও, জার্মানদের উপর গুলী চালাও, ঐ বুড়ো জরদ্গবটার উপর চালাও গুলী ' ··"

লাঁসিয়ে জলে উঠলেন, "লিও ভার্দ্যনের বীর নায়ককে কি করে অপমান করলো ?' তিনি রেগে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন :

"ওকথা তুমি ফরাসী নও বলেই বলতে পারছ ' তোমার বাপ ঠাকুর্দা তো এখানকার বাসিন্দে ছিলেন না, তারা এ শহরগুলিও গড়েননি, এ দেশের মাঠে তারা ফসল ফলান নি। ফ্রান্সের ভাগ্যে যা-ই ঘটুক তোমার কিছু যায় আসে না। তুমি চাও শুধু ভাবধারা, রাজনীতি। কিন্তু মাশাল বাঁচাতে চান ফ্রান্সকে, তিনি চান ফরাসী শহরগুলি বাঁচাতে, ফরাসী ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে। বুঝতে পারছ আমার কথা, না বোঝ নি ? আমি ফরাসী মানুষের কথাই বলছি।·· "

লিও তার টেবিল-ন্যাপকিনখানা ছুঁড়ে ফেলে দিযে কোনো কথা না বলে চলে গেলেন।

লাঁসিয়ে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেকেই গাল দিলেন : তিনি কি করে লিওকে অপমান করলেন ? অবশ্য, পেঁতাই এখন একমাত্র গতি। কিন্তু রাজনীতি নিযে বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করা সাজে না। আব লিও খাঁটি ফরাসী, শুধু একটু কেমন অস্থির স্বভাব। ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশে এসেছে ওরা ওর মন ফিরিয়ে দিয়েছে। অনেক রাতে বাতির সাহায্যে লিওকে খুঁজে পেল লাঁসিয়ে।

"আমারই ভুল, আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সবারই এখন অবস্থা খারাপ, আর তাই তো স্বাভাবিক। আর সবার উপরে আছে মার্সেলিনকে নিয়ে ভাবনা···কিন্তু বন্ধুত্ব বন্ধুত্বই। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধর বন্ধু, আমি যাতে বুঝতে পারি তুমি রাগ করনি।"

লিও হাসলেন। লাঁসিয়ে আর লিও দুজনেই অপ্রতিভ হলেন, লাঁসিয়ের মনে হোলো লিও বুঝি এখনো অপমানের কথা ভুলতে পারেন নি। তাই তারা সতর্ক হয়েই কথা বললেন, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ বিরতি এসে দেখা দিলো।

দুদিন পরে লিও বললেন :

"আমি পারীতে ফিরে যাচ্ছি, লিওর্তাইন সেখানেই আছে।"

ল্যাসিয়ে মনে মনে ভাবলেন : ব্যাপারটায় বিপদ আছে, জার্মানরা তখনই টের পেয়ে যাবে যে লিও একজন ইহুদী কিন্তু সে-কথা কি করে তিনি তাকে বোঝাবেন ? সে হয়তো রাগ করেই বসবে।...

"তোমার কি মনে হয় এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া যায় ?"

"হাজার হাজার মানুষ ফিরে যাচ্ছে। অবিশ্যি আমি আর কিছুর জন্য যাচ্ছি না। শুধু লিওর্তাইনের জন্যই আমার যাওয়া...

"সব দিক বিচার করে দেখা উচিত। তুমি তো জানো জার্মানদের কি বদ্ধমূল সংস্কার...

"শুধু জার্মানদেরই বা হবে কেন", লিও কঠোর স্বরে বললেন, "কিন্তু লিওর্তাইন আর আমার ছেলে আছে পারীতে। ওরাই আমার এখন সব..."

লিও চলে যেতে ল্যাসিয়ে আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। বার্টি এরই মধ্যে দুটি ভালো ঘর ল্যাসিয়েদের জন্য যোগাড় করে ফেললো। সে সাহায্য করবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ণ তার ভাব। শুধু মাদোকে দেখলেই সে খুশি হয়ে ওঠে।

বৃষ্টি-ঝরা এক বিষণ্ণ প্রাতে মার্সেলিন মারা গেলেন। বহু যন্ত্রণা পেয়েই তিনি মরলেন, শেষ পর্যন্ত ছিল তার চেতনা...কি সময়, এই সময়ে কিনা তিনি প্রিয়জনকে ফেলে চলে গেলেন।...লুই নিরুদ্দেশ, হয়তো হতই হয়েছে ; মাদো তো বহুদিন থেকেই নির্জীব হয়ে আছে ; মরিস নিজে তো এখন বুড়িয়েই গেছেন। ফ্রান্স লুটিয়ে পড়েছে, মার্সেলিনের মতই সে মুমূর্ষু। অন্তিম প্রার্থনা, কি মাদোর চোখের ভালোবাসাভরা দৃষ্টি তো তার যন্ত্রণা উপশম করতে পারল না।

"লুই যদি ফিরে আসে, ওকে বোলো—"

আর কোনো কথা তিনি বলতে পারলেন না, এই কটি তার শেষ কথা।

এর চেয়ে শোকাবহ অন্ত্যেষ্টির কথা ভাবা যায় না। বার্টি তার যথাসাধ্য করলো। হাওয়া ধুলোর ঝড় নিয়ে বয়ে গেল, অন্ধ-করা ঝড়। ল্যাসিয়ে চললেন আগে আগে। হঠাৎ থেমে গেল কফিনের গাড়ী—জার্মান ট্যাঙ্কে পথ অবরুদ্ধ। জার্মানরা পথ ছেড়ে শবযাত্রাকে পথ করে দিল না। এক ঘণ্টারও

বেশি মোড়ে অপেক্ষা করতে হোলো। ধূলোর ঘর্ণি তাদেব চারিদিকে। জার্মানরা গাইছে গান, আর ল’াসিয়ে বৃদ্ধার মতো চীৎকার কবে কাঁদছেন।

মাদোর হাতে শাবল তুলে দেওযা হোলো, মাটি দিতে হবে শবাধারে। মাদোর মনে হোলো, সে সব কিছু কবব দিচ্ছে—তাব জীবন বাঁধা ছিল শেষ সুতো গাছায়. তাও ছিঁড়ে গেল।

বাটি দাঁড়িয়েছিল কিছু দূরে, তারপর ল’াসিযে আর মাদোকে সে বাড়ি নিয়ে এলো। ল’াসিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন ঃ

“মধুচন্দ্রে মার্সেলিনের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, তাব পবেও দু-দুবার এসেছি। সে বোদে্যাকে ভালবাসতো, বলতো, এখানকার সব কিছুতেই ভ্যানিলা আর কলার গন্ধ। হায়, আমি জার্মান বোমায় মরলাম না কেন ?…”

## পাঁচ

তাব অন্তিম দিনগুলিতে মার্সেলিন ভাবতেন তাব ছেলের কথা, লুই তখন বোর্দে্যাতেই ছিল, কিন্তু সে জানত না যে তার মা কাছেই মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আছেন। হঠাৎ মাদোর সঙ্গে তার পোস্ট অফিসে দেখা, তাবা তখুনি ছুটলো কবরখানায়।

“মা তোমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার আগেই তিনি মারা যান…”

লুই তার মাকে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন উদ্দাম, একটা না একটা কিছু নিয়ে তাকে থাকতেই হোত। তার ছিল উচ্চাকাঙ্খা—তার মাকে ভাল লাগতো তার সংসারের অনভিজ্ঞতা, সরলতা আর স্বভাবের নম্রতার জন্য। সে বহুক্ষণ নতুন-তোলা সমাধি স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বিবর্ণ গোলাপ ফুলের একগাছা মালা সমাধিকে ঘিরে আছে। তারপর সে এক মুঠো মাটি তুলে তার রুমালে সন্তর্পণে বেঁধে নিলে।

“আমি ভাবপ্রবণ নই…পরে জানতে পারবে কেন আমি নিলাম।…”

ল’াসিয়ে ফুঁসে উঠলেন—“ওরা তাঁকে কবরখানায় নিয়ে গেল না কেন।”

কিন্তু শীগ্‌গিরই এ ভাব কেটে গেল। ছেলেকে দেখে তিনি খুশিই হলেন। লুই জীবিত, আর সে যুদ্ধ-বন্দী হয়নি। যেন ছোট্ট খোকা—এমনি ব্যাপার শুরু করলেন, বললেন : "এমনি বাচ্চারা কি লড়তে পারে ? ···" তবু তাকে শুনতে হোলো লুইর কথা। কিন্তু লুই যুদ্ধের কি বুঝবে ?···কি বরাতের জোর যে, ছেলেটা যুদ্ধ থেকে রেহাই পেয়ে গেছে !···

রাতে তিনি বললেন :

"বেশ, বেশ, লুই আমাদের ফিরে এসেছে। কিন্তু ওর মা আজ দেখলেন না, এই দুঃখই রয়ে গেল। আমি আর সইতে পারছি না, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতেই হবে।"

সন্তানদের কাছ থেকে পরামর্শ তিনি চাইলেন না, তিনি আপন মনেই বকে গেলেন :

"আলপের্ত বোধহয় এতক্ষণে পারীতে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে যে রোস-আইনেকে বাঁচাতে পারবে সে আশা করি না। জার্মানদের চোখে ও তো ফরাসী নয়···আমারও পারীতে ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। কিন্তু বাঁচতে তো হবে। যদি ফিরে না যাই, জার্মানরা হয়তো কারখানা আর করবেইয়ে নিয়ে নেবে···"

হঠাৎ লুই বাধা দিলে :

"কি, আপনি জার্মানদের হয়ে কাজ করবেন ?"

লঁাসিয়ে ক্ষুব্ধ হলেন। 'ওভাবে কথা বলছ কেন ?···তোমার মার মৃত্যুতে এত আঘাত পেয়েছি যে কাজে মন বসাতে পারছি না।

'হঠাৎ কথাটা আমার মনে পড়লো। আর হয়তো তোমাকে ফিরে পেয়েই কথাটা মনে পড়লো। তোমাকে আর মাদোকে নিঃস্ব করে দিয়ে আমার কাজ থেকে অবসর নেবার অধিকার নেই।···'

মাদো বললে, "আমি কিছুই চাই না, পারীতে ফিরে যেতে আমার ইচ্ছে নেই।·· "

লুই জোরে বললো :

"আমার কথা আপনি ভাববেন না। আমি এখন সৈন্য বাহিনীতে আছি···'

"কিন্তু সৈন্য বাহিনী তো এখন ছিন্নভিন্ন।'

"বিশ্বাসঘাতককে আমি মানতে রাজি নই।"

"কার কথা তুমি বলছ?"

"পেঁতা।"

"লুই!"

"কি?"

"ভার্দনের বীর-নায়ককে বিচার করবার মতো বয়েস তোমার হয়নি। তাছাড়া, তুমি একজন নিচুদরের লেফটেনাণ্ট, একজন মার্শাল সম্বন্ধে একথা বলতে তোমার সাহস হোলো কি করে? যে শৃঙ্খলার কথা এই মাত্র বলছিলে, তা কি এই?"

"আমি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সেনাপতিদের কথাই বলছিলাম, কিন্তু পেঁতা একজন বিশ্বাসঘাতক বই তো নয়। একজন ক্ষুদে লেফটেনাণ্টেরও তার সামরিক তকমা ছিঁড়ে ফেলবার অধিকার আছে। আমি সীমান্তে ছিলাম। আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতাম··তারপর···আমরা পেছু হঠে যেতে পারতাম আলজিয়ার্স কি কঙ্গোতে—হাঁ, যে কোনো জায়গায় আমরা যেতে পারতাম! এই অপমানের থেকে যে কোনো জায়গা ছিল ভালো!"

"তোমার বিশ বছর বয়েস, তাই তুমি এভাবে কথা বলতে পারছ। বরাত ভালো যে তোমাদের মতো দুধের শিশু দিয়ে দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয় না। একজন মার কি অনুভূতি তা বুঝতে পার?···"

"কি রকম মা হবেন, তার উপর নির্ভর করে তার অনুভূতি···পাজি যারা তাদেরও মা থাকেন···মা বেঁচে থাকলে বুঝতেন কেন আমি এমনি ধারা বলছি···"

"তোমার কি মনে হয়, তোমার মার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবেই আমি ভাবি? হয় তো আমাকেও তোমার বিশ্বাসঘাতক, অসাধু বলে মনে হয়।" ল'াসিয়ে কি যে বলছেন নিজেই বুঝতে পারলেন না। "যখন যুদ্ধ-বিরতির স্বাক্ষর শেষ হোলো, তখন অস্ত্র ঘোরানো তো ভারি সোজা। তুমি নিজেই তো বলেছ, তুমি একবারও আকাশে বিমান নিয়ে লড়তে যাওনি। তাহলে মার্শালকে বিচার করবার অধিকার তোমাকে কে দিলে? তিনি ভার্দনে ছিলেন, আমিও ছিলাম সেখানে। তার মানে কি আমি জানি···কিন্তু তুমি তো বাচ্চা ছেলে, ঢিল ছুঁড়ে খেলা করছ···"

তিনি থেমে মুখের ঘাম মুছলেন। দীর্ঘ বিরতির পর লুই উত্তর দিলে,

"পেঁতা আজ পঁচিশ বছর পরে ফ্রান্সকে বিক্রি করে দিতে যাচ্ছেন, ভার্দনের কি মূল্য রইলো আর? আমি তর্ক করতে চাই না, কিন্তু আপনি আমাকে বাধ্য করছেন...রোস আইমের দখল আমাকে দিয়ে যেতে পারবেন কিনা এ নিয়ে আপনার ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু বলুন তো—আপনি আমাদের উত্তরাধিকার হিসাবে কি দিয়ে যাবেন—ফ্রান্স না জার্মানদের প্রমোদশালা? আপনি কোন কিছুই ভাবছেন না। আর এই ভাবে আপনি আমাদেরও মানুষ করেছেন—ভাবনা করতে আমরা পারি না। এখন আমাদের গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।"

মার্শেলিনও একটা কথা প্রায়ই বলতেন: দুর্ভাগ্য তার ভাইকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে আনে, একা সে আসে না। ক'দিন পরে মাদো বাবাকে বললে,

"কাল লুইকে বিদায় দিয়ে এলাম।"

"বিদায় দিয়ে এলে মানে? কোথায় গেল সে?'

"জানি না। বোধ হয় লড়তে..."

লঁাসিয়ে বসে পড়লেন, মুখ তার হাতে ঢাকা। এমনি অনেক রাত অবধি বসে রইলেন। নিজের ছেলেকে দিলেন অভিশাপ, আবার মনে মনে তাকে তারিফও করলেন। কিন্তু ছেলের চাইতে নিজের কথাই ভাবলেন বেশী—নিজের প্রতি অনুকম্পা হোলো—তার পরিবার ভেঙে চুরে গেছে, ধ্বসে গেছে—ফ্রান্সের মতোই তার ভাগ্য...কি হবে বেঁচে থেকে, কি হবে এই এক ঘেয়ে ব্যবসা করে, পারী গিয়েই বা লাভ কি—সেখানে তো উদ্ধত বর্বর বিদেশীরা বাসা বেঁধেছে ..

মাদোর ভাইয়ের বিদায়ের কথা মনে পড়লো। সে তখন তাড়াহুড়ো করছে, মুখে শুধু 'যাও, যাও' বুলি। মাদো তাকে জড়িয়ে ধরলো।

"আমাকে তুমি দুষছ না তো মাদো?"

"তোমাকে দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।"

"কেন? তুমিও তো একাজ করতে পার।"

"না, পারি না। লুই, আমার যে কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই। তুমি কি তা জানো? আমার ভিতরটায় কিছু নেই। হয় তো, এমনি ভাবেই আমি জন্মেছি! কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি, তুমি সুখী হও, তাই

আমি চাই। জানি, আমার অন্য কিছু বলাই উচিত ছিল…তোমাকে আমি বিজয়ী দেখতে চাই লুই

রাতে, আঁধার পথে তারা কথা বলছিল। তাই লুই মাদোর চোখের জল দেখতে পায় নি।

## ছয়

গত ক'মাসে সার্জি বহু ঘুরেছে—ইয়ারোস্লাভল, রোস্তভ গোর্কি—কত জায়গা! এখন সে একেবারে ধাতস্থ। সে খুসিতে ভরপুর। নিনা জর্জিয়েভনাকে সে বললে যখন কাজ করি তখন আর কিছুর অস্তিত্বই টের পাই না। আমার তখন মনে হয় গোটা মানুষ জাতির ভাগ্যটাই একটা সেতুর উপর নির্ভর করছে ··

কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। বিষণ্ণ আর উদ্বিগ্ন মন নিয়ে পাশ্চাত্যের পরিস্থিতির দিকে সে লক্ষ্য রাখছে। ঘোরালো হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। প্রতিদিন ভোরে সে কাগজ খুলেই দেখে—জার্মানদের অগ্রগতি কি রুদ্ধ হোলো?… একদিন চায়ের পাতায় একটা সংক্ষিপ্ত খবর বেরুলো: জার্মানরা পারী দখল করেছে।'

মাদো!…বুকটা তার কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। এখন আর মাদোর কথা তেমন করে তার মনে পড়ে না, তার দিন এখন খসড়া, হিসাব আর মানচিত্রের কাজে পরিপূর্ণ। সে বোঝে অতীতের আর পুনরাবৃত্তি হবেনা, নিজেকে সে ভৎসনাই করে। কেন সে এ মোহকে চেপে রাখেনি? মাদোর চোখের জলের জন্যে সেই তো দায়ী। কিন্তু সে হয় তো তাকে ভুলেই গেছে। সে কি বলেনি: 'এতো—জীবনের গণ্ডীর বাইরে—তাই না সার্জি?"· কিন্তু তবু সার্জিই দায়ী…। শুধু কচিৎ মাঝ রাতে, মাদোর কল্প-মূর্তি এসে দেখা দেয় তার সুমুখে, আর সেই ক্ষণে সে নিজের মনে মনে স্বীকার করে অমনি করে সে আর ভালোবাসতে পারবে না—কখনো পারবে না। তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ সে তাকে দিয়েছে—মানুষ যতখানি দিতে পারে তা' দিতে

সে কার্পণ্য করে নি—সে দিয়েছে নিজের বুকের কামনা, তার স্বপ্ন। কিন্তু ভোরে উঠেই তার আর মনে থাকে না স্বীকৃতির কথা—জীবন তাকে দখল করে বসে, নিজের দাবী জানায়।

এখন তো মনে হচ্ছে, বুঝি যবনিকা পড়ে গেল। ভাবাবেগের সংঘাতের ভিতরে, এই আত্মিক জটিলতা আর অসঙ্গতির মধ্যে সে শুধু এক বিষয়ে সচেতন—মাদোর দারুণ বিপদ। পারীর মতোই তারও বিপদ—

জার্মানরা এখন পারীতে। · কি ঘটেছে তারই তাৎপর্য সে বুঝতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। কতবার সে মাদোকে বলেছে তার মাকে বলেছে যে, নীচ অসাধুর দলের দ্বারা ফ্রান্স শাসিত হচ্ছে অন্তঃসংঘর্ষে সে ছিন্নভিন্ন, নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি তার নেই, গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে তার জীবন। এ ফ্রান্স তো টি কবে না, যেই হিটলারের সুসজ্জিত বাহিনী তার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে, অমনি ধ্বসে পড়বে তার প্রাকার তবু এমন ধ্বংসের ছবি সে কল্পনাও করতে পারেনি। সে সংগ্রামের আশা করেছিল। যত ক্ষণস্থায়ীই হোক সে সংগ্রাম হবে জীবনমরণের ব্যাপার থাকবে তাতে বীরত্ব। কিন্তু পারী একটা গুলী না ছুড়েই যে লুটিয়ে পড়লো, এ তো তার কাছে মস্ত আঘাত হয়েই বাজলো। সে প্রলাপ বকতে শুরু করলো যে সেনাধ্যক্ষ চারটি বিপ্লবের মহিমায় মহিমান্বিত নগরকে মুক্ত বলে ঘোষণা করতে সাহসী হোলো, সে যেন দাড়িয়েছে তার সুমুখে। পাজির দল ওরা ওদের যেন একটা হোটেলে ঢুকতে দিলে আর কি।

লেঁজার কথা মনে পড়লো তার, মনে পড়লো সেই শ্রমিকের কথা, যার সঙ্গে রোস্ আইনের কারখানায় তার আলাপ হয়েছিল. সেই বিলাঁ কোর্টের মানুষ. সুরেনে আর ইভ্রে তাদের কথাও। ওরা বশ্যতা স্বীকার করবে না...কিন্তু ওদের গ্রেফ্তার করা হয়েছে, ওরা এখন বন্দী শিবিরে, নির্যাতনও সইছে। বর্বরের দল। ওরা ফ্রান্সকে কমিউনিস্ট শূন্য করতে চায়, ফ্রান্সকে জনহীন করতে চায়, তাই জার্মানদের ওরা নিয়ে এল প্লাস গুলা বাস্তিলে।

এবার তার নিজের জীবন খতিয়ে দেখতে বসলো সার্জি—কি জীবন সে কাটিয়েছে। মস্কো, নানা পরিকল্পনা, তার মা, আর ভেলিয়ার নীহারিকার মত অস্পষ্ট হাসি ( তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, হয়তো সে তার মন টেনেছে—তার কথাও সে চিন্তা করে, এখন, এই মুহূর্তে চিন্তা করছে। এই নিয়েই

তার জীবন। সে পৃথবীর কথা ভেবেছে, ভেবেছে গাছপালা আর ফুলের কথা। এখনো এখানে শান্তি, মেয়েরা এখনো ডেইজি ফুল দিয়ে ভাগ্য গণনার খেলা খেলছে, মাদোও অমনি করত। সে তো এই মুহূর্তে ভাবছে, আজ কি ভালিয়া তাকে ফোনে ডাকবে। এখনো মায়েরা সন্তানদের পালন করছেন ছেলেমেয়েরা এখনো শিখেছে ক্রিয়ার ব্যবহার, এখনো তৈরী হচ্ছে বাড়ীর সার। ওরা বলাবলি করছে কোথায় দেওয়া যায় বেড়া, কাউচ কোন কাপড় দিয়ে মোড়া যায়। এখনো শান্তি এখানে, নীল আকাশে, হালকা পালকের মতো মেঘ এখনো ছড়িয়ে আছে—এ দেশে এখনো শান্তি। কিন্তু ওখানে···কত তাড়াতাড়ি ফ্রান্সকে পিষে ফেললে!—পুড়িয়েছে, লুট করেছে, খুন করেছে ···। সার্জির মনে পড়লো আনার কথা। ওরা আমাদের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়বে···ফ্রান্সকে শুধু হজম করার ওয়াস্তা, তারপর দু'তিন বছরের ভিতরে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বেই···।

ডিনারে বসে সার্জি বেলচেভের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে। কাগজ খুলেই বেলচেভ তৃপ্তির হাসি হাসলো, তারপরে শক্ত গোরুর মাংসের টুকরো চিবুতে চিবুতে বললে :

"ফরাসীদের যাহোক একহাত নিয়েছে—কি হে তাই না ?"

সার্জি রেগে উঠলো। বেলচেভ পারীকে না ভালোবাসতে পারে, ভাল বাসা না বাসা তার ব্যাপার, আর সে তো ওখানে যায়ও নি—তাছাড়া বেশী পড়াশুনোও তার নেই। সে কাজের লোক, কিন্তু দৃষ্টি বড় সংকীর্ণ, কিন্তু তবু!···অতীতের পারীও তো ইতিহাসেরই এক খণ্ড, আর সে ইতিহাস আমাদের কাছে মূল্যবান। তাছাড়া ফ্যাসিস্টদের এই বিজয়—এ তো এক সর্বনাশ—আর এত সহজ সে বিজয়! ওদের মাথা ওতে বিগড়ে দেবে। পারী ভাল কি মন্দ—আজ তর্ক তা নিয়ে নয়—আজ সে আমাদের। সবাই তা বোঝে। কিন্তু বেলচেভ বুঝতে চায় না।

"অতো গরম হয়ে উঠছ কেন ? চমৎকার একটা ধাক্কা—একেবারে···

সার্জি বিরক্তই হোলো, কেমন তৃপ্তিভরে শেষ কথাটা ও বললে। আর এই আত্মতৃপ্তি বেলচেভের খুবই। তার উপরে সে তার এই আত্মতৃপ্তি লোকের কাছে রোজই জাহির করে, কেউ যদি তাকে বলে : 'আজ ভীষণ বরফ পড়ছে', সে অমনি উত্তর দেবে, 'বরফ পড়া তো ভালো, স্যাঁতসেঁতে ভাবটা তো নেই।'

আবার দারুণ বর্ষায় সে বেশ খুশি হয়েই বলবে, 'একটুও শীত করছে না'।... আর বলতে গিয়ে মুচকি হেসে গালে বা মোটা নাকটায় হাত বুলোবে। আজ যেন সে আরো খুশি, ঠিক অমনি হাসি মুখেই বললে : 'অতো গরম হবার কি হোলো হে ?.. '

সার্জি না-ছোড। বেলচেভ এবার মারমুখো হয়ে উঠলো : সার্জির বিরুদ্ধে তার অভিযোগ—তার দ্বান্দ্বিক গতিতে বিশ্বাস নেই, পানসে তার ভাবাবেগ। তর্কে ক্লান্ত হয়ে, সে বরফ দেওয়া ফলের ঘন বসে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললে :

"ওবা গোল্লায় যাক্ না।...ওখানে যে কাবো রাজনীতির জ্ঞান আছে, আমার মনে হয না।..."

"কমিউনিস্টদের কথা কি তুমি ভূলে গেলে ? ভূলে গেলে কি শমিক আর জনগণের কথা ?.... কেমন বলশেভিক তুমি ?"

"আমরা আমাদের নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত..."

হঠাৎ পাভেল সার্জিয়েভিচ লুকুতিন তর্কে যোগ দিলে। তর্কে যোগ দেওয়া তার রীতি নয়। সে একজন কাজের মানুষ বটে, কিন্তু রাজনীতিক চেতনা তার কম। বড লাজুক, কম কথা কয়, তাই তার সঙ্গে যারা বহু বছর কাজ করেছে, তারাও তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। চল্লিশ বছর তার বয়েস, কিন্তু সব কিছুই তার সাবেকী—তার ধরণ-ধারণ, কথা বলার ভঙ্গী—সব। যখন বেলচেভ বললে, আমাদের নিজের কাজ নিয়েই আমরা ব্যস্ত—, পাভেল সার্জিযেভিচ সে তর্ক শুনেছে কিনা সবার সন্দেহ, কিন্তু সে বলে উঠলো,—

"বাধা দিচ্ছি বলে ক্ষমা কর, কিন্তু তোমার মত আমি মানি না। আমরা নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত, একথা বলা ভুল। আমি তো ভাবতেই পারি না...। সব কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন আমরা তাহলে—হাঁ, বিচ্ছিন্নতাবাদীই বলতে পার—এ ছাড়া আর যুতসই কথা খুঁজে পেলাম না. এই ছুরিখানার কথাই ধর না, আমাদের দেশেই তৈরী—আজ আমরা বড়াই করেই একথা বলতে পারি। আমি সাহস করেই বলছি, এমনি ছুরি তৈরি করার সঙ্গে গোটা মানুষ জাতটারই সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের কাছ থেকে মুক্তি আশা করে বলে, কেউ কেউ আমাদের তারিফ করে, কেউ বা আমরা টেবিলে ব্যবহারের ছুরি তৈরি করছি বলে ঘৃণা করে। শুধু তাই নয়, আমরা টিঁকে আছি বলেও ঘৃণা করে, তাই তো আমাদের

ভাগ্যকে গোটা মানুষজাতের ভাগ্য থেকে আলাদা করে দেওয়া অসম্ভব। আমরা যদি জিতি, সবাই জিতবে। আমি যা বলতে চেয়েছি, বলতে পেরেছি কিনা জানি না। আমি শুধু এই বলতে চেয়েছি, যখন অন্য দেশের মানুষ জখম হয়, আমরা তাদের ব্যথা অনুভবকরি—এইখানে···

সে তার বুক দেখিয়ে দিলে।

বেলচেভ উঠে পড়লো :

“তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। অন্যকে শেখাবার আগে নিজে কয়েকখানা বই পত্তর পড়লে ভালো হয়···”

রাতে সার্জি গেল তার মার সঙ্গে দেখা করতে। সে জানে তিনি খবর শুনে মুষড়ে পড়বেন। নিনা জর্জিয়েভনা তাকে দেখেই বলে উঠলেন :

‘শেরিয়োঝেঙ্কা কি করে এমন হোলো ?···’

যে-প্রশ্ন সে আজ ভোরেই নিজেকে করেছে, তিনি আবার সেই প্রশ্নই করলেন। লাখো লাখো মানুস করছে সে-প্রশ্ন।

‘পারী—আত্মসমর্পণ করলো ! কিন্তু জনগণ আর শ্রমিকদের খবর কি ?’···

“শ্রমিকরা এত শক্তিশালী যে বুর্জোয়ারা হিটলারকে সত্যিকারের বাধা দিতে সাহস করে নি, লড়তে চায় নি, কিন্তু শ্রমিকরা ক্ষমতা কেড়ে নেবে তত শক্তি তো তাদের নেই। আর সাধারণ মানুস—ফ্রান্সের মানুষ—সে তো কিছুই জানে না। তার কাণে পাঁচ বছর ধরে এই কথাই বার বার বলা হয়েছে,—জনগণের সংস্থার থেকে হিটলার ঢের ভালো ; তাকে বলা হয়েছে, কমিউনিস্টরা তার সবজীব ক্ষেতটুকুও কেড়ে নেবে, তার সামন্য বিলাস মদের উপর জারী করবে নিষেধাজ্ঞা, মেয়েদের করবে জাতীয় ভোগের সম্পত্তি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ফ্রান্সের সাধারণ মানুসকে বোকা বোঝানো কত সোজা। সব কিছুই তারা অবিশ্বাস করে, এই ভাবটা তারা দেখায়, যেন কত ঝুনো তারা, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে···তারা শিশু, খাঁটি শিশু···এবার তারা দেখবে, ফ্যাসিবাদ কাকে বলে ? এখনো ফ্যাসিবাদ তার শেষ শক্তি প্রয়োগ করে নি···’

‘আমি জানি, জনগণই জিতবে, কিন্তু বড় ভয় হয়, যখন তারা জিতবে তখন যে কিছুই বাকি থাকবে না। না, আমি নোতরদাম আর ল্যুভরের কথা বলছিনা, আমি চাই ফরাসী মানুষ আর তার ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতি,

সহজ স্বাধীন তার ব্যবহার, আর তার জীবনের জটিলতা।··· চেয়ে দেখো জার্মানীর কি হোলো·· শেরিয়োঝেঙ্কা আমি কেমন হতাশ হয়ে পড়ছি।

সার্জি নিরুত্তর, মাদোর কথা আবার তার মনে পডছে। নিনা জর্জিয়েভ্না বুঝি বুঝতে পারলেন তার মনেব ভাবনা, তিনি করুণ স্নেহে তার হাত চেপে ধরলেন। মার এ ব্যাপার তার কাছে এত অস্বাভাবিক বলেই তার মন দুলে উঠলো, সে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

বহুক্ষণ তারা বসে রইলেন নিঃশব্দে। এবার নিনা জর্জিয়েভ্না বললেন: "আমাদের স্কুলের একটি ছাত্রী বলছিল: 'ওরা পারী দখল করেছে, কিন্তু আমাদের কাছে আছে তাদের কমিউনের ঝাণ্ডা।' 'সে তো ম্যসোলিয়ামে রয়েছে···"

'বেলচেভের প্রশ্নের এর চাইতে সেরা উত্তর আর কি হতে পারে। মা, তুমি জান, কারা পারীকে বাঁচাবে? আমাদের মানুষ! আমার এ দৃঢ বিশ্বাস। আজ আমি কালোয়েভস্কায়ায় বেড়াচ্ছিলাম, অন্যদিক থেকে আসছিল কয়েক-জন লাল ফৌজের সেনা। তারা স্নানাগারে চলেছে, গান গাইছে··তারা আমাদের আশা। আমাদের ভরসা···সমস্ত পৃথিবীর চোখ এখন তাদের দিকে!"···সে হাসল তারপর ভাবিত হয়ে বললে, অপরিচিত স্বর যেন কথা বলছে—"যদি যাদু-তার—এক হৃদয় থেকে সোজা আর এক হৃদয়ে পাঠান সম্ভব হোত, আমি তাহলে পারীতে লাল ফৌজের কালায়াভস্কায়ায় এই গান গেয়ে মার্চ করে যাওয়ার বর্ণনা করে তার পাঠাতাম।"

ঠাট্টা করে, অথচ মৃদুস্বরে নিনা জর্জিয়েভ্না জিজ্ঞেস করলেন:

'কোনো মেয়ের কাছে কি?'

সে মাথা নাড়লো।

না···একটি ছেলের কাছে, রোস আইনের কারখানায় সে কাজ করে।"

সে রাতে নিজের বাসায় ফিরে সে ভালিয়ার কথা ভেবে আপন মনে চেঁচিয়ে উঠলো: "আবার যুদ্ধ হবে! এখনই না হোক, কয়েক বছরের ভিতরে তো হবেই'···সার্জির মনে পড়লো সাথিদের সঙ্গে কত সে খেলেছে! শান্তির দিনে সে বেড়ে উঠেছে, সে জানে না কি করে দুটি বিমান হামলার বিরতির মাঝখানে মানুষ সুন্দর কাচ তৈরী করছে, বাড়ী তৈরী করছে, গোলাপ গাছ লাগাচ্ছে।

তাকে সে রাতে যদি কেউ বলতো, যুদ্ধে যাবার এক ঘণ্টা আগে একটি মেয়েকে চুমু খাওয়া সম্ভব একথা সে বিশ্বাস করতো না।

ভোর। শান্ত নীল আকাশে পাখীর পালকের মতো হাল্‌কা মেঘ ডোরা কেটে কেটে দিয়েছে। সার্জি আসন্ন ঝড়ের কথা বহুবার ভেবেছে, এমন করে, বুঝি তার বয়সী কেউই ভাবে নি। সে বিপক্ষের শিবির দেখেছে, সেখানে সে ছিল, তাই ফ্যাসিস্টরা তার কাছে শুধু খবরের কাগজের বুলি নয়। কিন্তু যুদ্ধের কথা সে চিন্তাই করেছে, তার ঘ্রাণ পায় নি। সে বিজয়ীর হাসি হেসেই গ্রিগরিয়েভকে বললে :

'দেখছ তো—এ কল্পনার জগত নয়। সময়ের ঢের আগে থেকেই আমরা সব তৈরী করে রাখব'...সন্ধ্যেয় সে ভালিয়াকে ফোন্‌ও করলো।

## সাত

সেপ্টেম্বর মাস, বিষণ্ণ আর বাদলা ভরা। কিন্তু তারই ভিতরে একটা দিন সুন্দর হয়েই দেখা দিল। রুশীয় হেমন্তের এক মহান সৌন্দর্য আছে। মনে হয় দীর্ঘ শীতের আশঙ্কায় গাছগুলি তখনো তাদের শেষ সৌন্দর্যটুকু জিইয়ে রেখেছে। সূর্য তখনো তাপ দিচ্ছে, আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে উদ্দীপ্ত করে তুলতে চাইছে আর বলছে—বসন্ত আবার এসে সবুজে ভরে দেবে বাগান, দুপাল্লা জানালা বিঁধে সূর্যের আলো আবার ছড়িয়ে পড়বে।

পাভেল সার্জিয়েভিচ লুকুতিন তার স্ত্রীকে ফোন্ করে জানালেন, ডিনার খেতে আজ আর বাড়ী ফিরবেন না। পথে পা দিয়েই তার চোখে পড়লো আলেকজান্দ্রোভস্কী পার্ক—সব কিছুই সোনায় সোনা হয়ে গেছে, উত্তাপ যেন জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে, ক্রেমেলিনের রক্তিমাভ দেওয়ালের দিকে তিনি তাকালেন। তিনি হাসলেন, আত্মবিশ্বাসের সে হাসি।

লুকুতিনের জীবন বাইরের ঘটনাপ্রবাহে জটিল হয়ে ওঠেনি তার জীবনকে তিনি জটিল করেছেন বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অনুরাগে। তাঁর বাবা ছিলেন উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক, তিনি ছিলেন অতীত শতাব্দীর ভাবধারায় পুষ্ট। তাঁর অনুরাগকে তিনি টলস্টয়ের পাপের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আর উদার নিয়ম-

তন্ত্রের স্বপ্ন—এই দুয়ের ভিতরে ভাগ করে দিয়েছিলেন। যখন বিপ্লব এল, তিনি খুসিই হলেন, কিন্তু শীগগিরই আবার হতাশ হয়ে পড়লেন। 'আবার রক্ত…!' শরীর ভেঙে পড়লো, বাড়ি থেকে বাইরে বেরুনো প্রায় ছেড়েই দিলেন, ঘরে বসে পড়তে শুরু করলেন প্লেটো। একজন বন্ধু যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কিহে তুমি কি ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছ নাকি?' অধ্যাপক গর্জে উঠলেন. 'না ভাই, ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা এ নয়, আমি রাগে জ্বলে মরছি।'…তার কিছুদিন পড়েই তিনি মারা গেলেন।

তার বাবা ইতিহাস নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক শুরু করেছিলেন, পাভেল সার্জিয়েভিচ নিজের হাতে তা তুলে নিলেন—। যখন তিনি ছেলে মানুষ, নিজের স্কুলের খাতায় 'ঝড়ের বিরুদ্ধে' এই কথা ক'টাই লিখে রেখেছিলেন। তিনি সাহিত্যে অনুরাগী, আবার তা' রোমান্তিকও বটে, বায়রণ আর লেনাও তিনি মূল ভাষায় পড়েছিলেন, কিন্তু তবু ঠিক করে বসলেন গড়াব বিদ্যা শিখবেন। নিজে নিজেই ভাবলেন, জনগণ চিরদিনই ঠিক পথে চলে, জনগণের সেবাই প্রতি মানুষের কর্তব্য। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে তিনি কাজান বেরেজনিকি, কুজেনৎস-এ কাজ করলেন, কয়েক বছর হোলো তিনি মস্কোতেই আছেন। নিজের কাজ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট, কিন্তু সময়ে সময়ে যে কাজের জন্য তিনি জীবন আর আত্মা নিবেদন করেছেন, সেটা ঠিক কিনা এই সন্দেহে মনে কষ্ট পান। পাঁচজন সরকারী কর্মচারীর অভদ্র ব্যবহার ও নিষ্ঠুরতায় তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু নিজেই আবার মনে মনে তর্ক করতে বসেন: এর কারণ, আমরাই অগ্রণী, প্রথম দল। বিশ বছরের ভেতরেই মানুষ বদলে যাবে ··কিন্তু কখনো কখনো আবার হতাশ হয়ে ভাবেন, এদের ঢেলে সাজা চলে না · বাপের মতোই তিনি, অন্যায়ের তিনি শত্রু, তিনি জ্বলে ওঠেন প্রতিটি অন্যায়ে, তবুও বাপের থেকে তার চরিত্র ভিন্নই, যদিও টলস্টয়বাদ তাকে প্রভাবিত করেছে। অধ্যাপক যে কোন ব্যাপারে হুলুস্থুলু বাঁধিয়ে দিতে ভালবাসতেন, কিন্তু পাভেল সার্জিয়েভিচ সংযত, মেজাজ কখনো খারাপ করেন না। নিজের মনে হেসে হেসে বলেন: খাসা লোক তো তুমি বাপু, ঘরের ভিতরে বসে প্রতিবাদ কর। কিন্তু এ ভীরুতা নয়, তার মনের দ্বি-মানসের সঙ্গে তিনি বাঁধা—হয়তো তিনি যে ভাবে পালিত হয়েছেন, তারই সঙ্গে এর সম্বন্ধ—হয়তো অতি সংযমীর এই-ই ভাগ্য।

গত বিশ বছর ধরে তিনি কত কিছু ভেবেছেন, কেই বা তা জানে। হস্টেল, কুঁড়ে ঘর, রাশিয়ার দূরগামী ট্রেনে বসেই হয়তো ভাবনার জাল বুনে গেছেন—দূরগামী গাড়ীগুলো দেখে মনে হয় ভাবনার জন্যই বুঝি তারা তৈরী। তিনি তার যুগের সঙ্গে এমনি করেই মিশে গেছেন ধীরে ধীরে, কষ্টও তার জন্য পেয়েছেন। তাই তিনি না নিজেকে, না তার পরিবেশের মানুষকে বিশ্বাস করতে পারেন। লোকে তাকে নাগরিক জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন বলেই মনে করে, কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি শুধু যে বিপ্লব পড়ছেন তাই-ই নয়, যা কিছু পড়েছেন, তাকে মেলাতে চেষ্টা করেছেন যা কিছু দেখেছেন তারই সঙ্গে। সংস্কৃতির বিকাশে তিনি কাজ থেকে ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চান নি। ফ্যাসিবাদ তাকে প্রচণ্ড আঘাত হয়েই বেজেছে। ভালোর স্বরূপ বুঝতে তার দীর্ঘ দিনই লাগে, মনে থাকে সন্দেহ, কিন্তু মন্দকে চিনতে এক মুহূর্তও দেরী হয় না। মন্দের উপর তার এই ঘৃণা তাকে অনেক বিপরীতধর্মী ভাবধারা থেকে রেহাই দিয়েছে। তিনি খুব কমই বিচলিত হন, ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসও তার খুব—তিনি জানেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধ আছে সুমুখে—সেই যুদ্ধেই এসপার কি ওসপার হবে।

জীবনে কয়েকবার প্রেমেও তিনি পড়েছেন, কিন্তু তার লাজুক প্রকৃতি তার মনের এই ভাবাবেগকে প্রকাশিত হতে দেয় নি। বেশী বয়সে তিনি বিয়ে করেছেন—তিনি বিয়ে করেছেন একথা ঠিক বলা যায় না, কাতিয়াই সব কিছু ঠিক করেছিল। কাতিয়ার চোখ দুটি অপূর্ব—তাতে এক স্বর্গীয় মায়া ( অন্ততঃ লুকোতিন তো তাই ভাবতেন )। তার সংসারী বুদ্ধিও খুব, ভাবপ্রবণতাকে সে তুচ্ছই করে। কাতিয়া কখনো বাইরে যেতে চায় নি। ওদের বিয়ের আগে লুকুতিন একটা ভালো চাকরীই করতেন। সে লক্ষ্য করত, তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লুকুতিন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠেন, তাই সে একদিন লুকুতিনকে নিজের ঘরে ডেকে আনলো, বন্ধুকে দিল বাইরে পাঠিয়ে। এক সপ্তাহ পরে নিতান্ত মামুলী ভাবেই বললে, 'এখন আমরা গিয়ে রেজেষ্টারী করতে পারি।' ...একটি মেয়ে সে প্রসব করেছে, ঘর-দোর আগের থেকে বাসযোগ্য করেও তুলেছে। লুকুতিনও তাকে জীবনের অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছেন। কাতিয়ার রোজগার বাড়াবার জন্য পেড়াপীড়ির অন্ত নেই, সে

তাকে নানা গুজব আর তার দোকানের কথা শুনিয়ে বিরক্তি ধরিয়ে দেয়। এ যেন এক মৃত্যু-যন্ত্রণা।

বাড়ী এখন যেতে হবে না, এই ভেবে লুকুতিন খুশিই হলেন ; ঠিক করলেন একটা কাফেতে বসে কিছু খেয়ে নেবেন। জানালার কাছে একটা টেবিল বেছে নিয়ে তিনি বসে পড়লেন। বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন হেমন্তের সূর্যাস্তের দিকে। কখন যে ডোরাদার স্পোর্ট স্যুটপরা একজন ঢ্যাঙা লোক তার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পেলেন না। লুকুতিন অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালেন। পাতলা ছিপছিপে মানুষটি, একটু চমক-লাগা দৃষ্টি, পাতলা কোঁকড়া চুল··· পরিচিত বলেই মনে হয়, কিন্তু কোথায় দেখেছি—ঠিক মনে পড়ছে না।··· আগন্তুক তাকে জার্মান ভাষায় বললে,

'আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি। ১৯২২ সালের জুলাইয়ে কুজেনস্কের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে···

আট বছর আগে একদল জার্মান এসেছিল কুজেনস্কে, তাদের মধ্যে ছিল বার্লিনের এক তরুণ স্থপতি, নাম তার কার্ট রিকটার। তার কবি-কবি চেহারা, আর উদার ভাবধারার জন্য ক'দিনেই তার নাম ছড়িয়ে পড়লো, সে যা কিছু দেখত, তাতেই সে আনন্দে মুখর হয়ে ওঠতো। ভিত্তি গড়বার জন্য খাত খোঁড়া, ইঞ্জিনিয়ারদের দুঃসাহসিক খসড়া, কসাকদের পোষাক—সব কিছু দেখে, সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো আর চেঁচিয়ে বলত: 'এ যে এক বিরাট কাণ্ড।' জার্মানীর কাটাছাঁটা সুনির্দিষ্ট একঘেয়ে পরিবেশের বাইরে তার মনে হোত এ যেন রূপকথার দেশ। নিজের মনে মনে সে ভাবত : 'আমি ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট বনে যাচ্ছি।'

এক হপ্তা সে কাটিয়েছিল কুজেনস্কে, তখনই লুকুতিনের সঙ্গে তার পরিচয়। লুকুতিন ভালো জার্মান জানতেন। অনেকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি তাকে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখবার ভার নিয়েছিলেন। তার বিরক্তি ধরে যেত। রিকটার হয়তো একটা খাত দেখাত, লুকুতিন অমনি বোঝাতে শুরু করতেন : 'কিছুদিন আগেও এখানে মানুষ থাকত না'—কিন্তু তার কথা না শুনেই জার্মানটি বলে উঠত, 'আরে এ যে এলাহী ব্যাপার! সব যেন ছবির মতো!' কমিউনিস্ট হবে এই ঠিক করে রিকটার একদিন পাভেল সার্জিয়েভিচকে জিজ্ঞেস করলে : 'আপনি কি পার্টির বহুদিনের সভ্য?' লুকুতিন যেন

অপরাধ করেছেন, এমনি লাল হয়ে উঠে বললেন, না. আমি পার্টির সভ্য নই।'

বহুদিন আগের কথা, তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে. কিন্তু ভারি অবাক লাগে যে রিক্‌টার লুকুতিনকে চিনতে পেরেছে, আর পাভেল সার্জিয়েভিচেরও মনে পড়ছে তাদের পরিচয়ের কথা।

রিক্‌টার তেমন বদলায় নি, হয়তো বা একটু সংযত হয়েছে। লুকুতিনের দিকে তাকিয়ে তার যৌবনের কথা মনে পড়লো, মনে পড়লো তার উদ্দীপনা আর স্বপ্নের কথা। আর লুকুতিন ভাবতে লাগলেন রিক্‌টার কেন এসেছে মস্কোয় ; যারাআজ সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ও কি সেই হতভাগ্য-দেরই দলে, না. ও উঁচু দরের কোনো ফ্যাসিস্ট ?...

না, রিক্‌টার উনিশ শো বত্রিশ সালে কমিউনিস্ট হয়নি। দেশে ফিরে সে ঠিক করলে রাজনীতির আওতার বাইরেই থাকবে। মানুষের কি তা ছাড়া আর কামনা নেই ? হিল্ডার সঙ্গে তখনই পরিচয়। ছোটখাটো, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ঠিক যেন সাদা নিগ্রো মেয়েটি। রিক্‌টার পাগল হয়ে গেল, দু'বছর ধরে সে হিল্ডার পেছনে পেছনে ঘুরলো। তার কাছে যেই আসত, তার উপরই তখন তার ঈর্ষা. এমন কি বুড়ো ইংরেজ শিক্ষকটি পর্যন্ত রেহাই পেলেন না। তার পরে যখন তাকে সে পেল, বিয়ে করেই ফেললো কিন্তু যন্ত্রণা তো গেল না বরং বাড়লো। তার মনে হোত হিল্ডা তাকে ভালবাসে না, সে অবিশ্বাসিনী. কাজে না হোক. মনের দিক থেকে তো বটেই। রাতে ঘুমোতে তার ভয় হোত—কয়েকবার সে শুনেছিল ঘুমের মধ্যে তার স্ত্রী কি যেন বিড় বিড় করে বলে ; সে কান পেতে থাকত. যদি তার কোন অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম শুনতে পায়। হিল্ডাকে দেখে মনে হয় সে শান্ত ; তার শিশুর মত সরল অথচ রহস্যময় চোখ দেখে তার মনে হয়, ওর ঐ বেড়ালের মত চোখে নিস্তরঙ্গ জলধারার মতো হৃদয়ের ছায়া ভেসে উঠছে...

রাজনীতি দিয়ে সে কি করবে ? টাকা রোজগার সে ভালই করত, হিল্ডার সঙ্গে যেত থিয়েটারে, আর একটা ঝোঁকও তার দেখা দিল :—সে মনঃসমীক্ষা। কিন্তু রাজনীতি অনাহূতের মতোই তার দরজায় একদিন ঘা মারলো। নাৎসীরা তখন ক্ষমতা পেয়েছে। রিক্‌টারের মত তখন এই যে, এই 'নতুন ব্যবস্থায়' জার্মানীর হয়তো ভালোই হবে—হাঁ কে তা বলতে পারে ?

...কিন্তু সংস্কৃতিবান মানুষের পক্ষে এ এক অন্তরায়। বহু দুর্বল লোকের মতো সে নিজেকে দৃঢ়চেতা বলেই মনে করত। অন্যে যা বলে তারই সে পুনরাবৃত্তি করত আর মনে মনে ভাবত নিজের কথাই সে বলছে—হাঁ, এই তার গোপন মনের কথা: তার বন্ধুরাও তার কাছে ফিসফিসিয়ে তৃতীয় রাইখের কর্তাদের নিয়ে নানা হাসির গল্প করত। হিল্ডা বলত:—'বাড়ীর বাইরে যেতে ভয় হয়—কাল ঝঞ্ঝা-বাহিনীর ক'জন সৈন্য একটি মেয়েকে পথে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সবাই বললে, মেয়েটা ইহুদীর সঙ্গে থাকত—ওরা থুথু ফেললে ওর মুখে। দেখ দেখি, কি বিশ্রী ব্যাপার! কার সঙ্গে কে ঘর করছে, তা দিয়ে ওদের দরকার কি?—সরকার মানুষের বিছানাও তল্লাস করবে নাকি?—আর ছেলেপুলেগুলোর কি হবে?—ওরা কি করছে দেখেছ? ওরা ওদের সৈন্যের মতো কুচকাওয়াজ করাচ্ছে—এতে ভালো হবে না!'· রিক্‌টার মনে মনে ভাবতো:

ওর ঐ মেয়েটার উপর অতখানি দরদের মানে আমি বুঝি—ও অবিশ্বাসিনী হতে চায়, এমন কি ইহুদীর কাছে যেতেও ওর আটকাবে না!...তবু তার মনে হোত, হিল্ডা ঠিকই বলেছে—ঝঞ্ঝাবাহিনী কি করে দেশ শাসন করবে?—

কিন্তু যখন হিটলার অস্ট্রিয়া নিয়ে নিলেন, রিকটার বলে উঠলো, 'তোমরা যাই বলো, লোকটার নাক দেখে প্রতিভা আছে বলে মনে হয়। হাঁ, প্রতিভাধরের নাকই হবে।—ভেবে দেখো, জার্মানীর যুগ যুগের স্বপ্ন, এক ফোঁটা রক্তপাত না করেই সফল করলো!'...হিল্ডা তর্ক করলো না। কয়েক বছর আগে সে তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল ভিয়েনায়। পুরানো শহরের সৌন্দর্য দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল, আর দেখেছিল ভিয়েনার বিলাসিনীদের। যুদ্ধ ছাড়া সেই ভিয়েনা জিতে নিলো। তার জানালার বাইরে ঐ যে পাজি ছোকরার দল চেঁচাচ্ছে, ওরাই বুঝি ঠিক করছে? ভিয়েনা তো এখন বার্লিনের মতোই কুশ্রী হয়ে যাবে··

ভিয়েনার পরে প্রাহা। রিক্‌টার ভাবলো, এবার থামবার সময়। উনিশ শো আঠারো সালের গল্প সে তার বাবার কাছে শুনেছিল, সেই গল্প এবার মনে পড়লো। ধর যদি ফ্যুরারের স্নায়ু-বৈকল্য দেখা দেয়?—যুদ্ধকে তার ভয়—পরাজয়কে তার ভয়—আর ভয় তাকে যদি যুদ্ধে যেতে হয়। সে তো ভয়ানক ব্যাপার—খাতে বসে গোলার প্রতীক্ষা, কখন সে এসে টুকরো টুকরো করে

ফেলবে।—হিল্ডার কি হবে?—হিল্ডাকে ছেড়ে সে থাকবে কি করে?.. ছ'বছরের সহবাস, জীবনের আনন্দ, ভোজ, সংসারের দেনা-পাওনার হিসেব, ওষুধপত্র, ছোটো-খাটো সাজানো সংসার—এই সব কিছু তার সেই ভয়ংকর ঈর্ষারোগ আরাম করতে পারে নি। ব্রেমেনে দু-তিন দিনের জন্য যেতেও সে ভয় পেত, যে কোনো সময় সে আফিস থেকে ফিরত আর কনসার্ট শুনতে বাধা হোত, পাছে হিল্ডা অন্য কারো সঙ্গে কনসার্টে যায়, এই ছিল তার ভয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তার স্ত্রী দেখতে ছিল বিশ্রী, এখন সে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যে, তাই সে আগের বৃথা বয়ে-যাওয়া সময়ের ক্ষতিপূরণ করবার সুযোগ খুঁজছে।

যুদ্ধ বাধলো। সাময়িক অব্যাহতি সে পেলো বটে, কিন্তু সারা শীত ধরে তার উদ্বিগ্নতার আর অন্ত রইল না···সব সময়েই শুধু ভাবনা : আমার পালা শীগগিরই আসছে। তার বাবা একবার তাকে ফরাসী গোলন্দাজদের পটুতা আর সেনগালীদের সঙ্গীন চালানোর কথা বলেছিলেন। তাকে কি গিয়ে ওইসবের মধ্যে পড়তে হবে?···তারপর হঠাৎ হোলো ফ্রান্সের পতন। রিক্‌টার আর সবাইয়ের সঙ্গেই চেঁচিয়ে গলা ভাঙলো। কিন্তু তবুও যেন কি একটা ভয় তাকে কুড়ে খেতে লাগলো :—ধর যদি সব কিছু একটা বিপর্যয়ে শেষ হয়ে যায়? কে জানে আমেরিকার মনে কি আছে? রাশিয়ারই বা কি মতলব?—কি বলবে তখন রাশিয়া? আসল কথা হচ্ছে, কখন ফ্যুরার থামবেন আর একেবারে থামবেন কিনা তাই বা কে জানে!—

এক নাৎসী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করবার পর (তখন তার সবই কেমন গুলিয়ে গেছে) রিক্‌টার বিশ্বাস করতে শুরু করল জার্মানী ইওরোপের সংগঠনের ভার নিয়েছে—আর সে ভারও মহান। নীট্‌শে আবার সে পড়লো, তার যেন মনে হোলো সেও শক্তিমান হতে পারে, হতে পারে নিঃসঙ্গ, গর্বিত আত্মা—নীটশে-বাদের সেই তো মূর্ত প্রতীক। হঠাৎ সে টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়েও উঠলো একদিন, "আমরা জার্মানরা অশান্ত জীবনই যাপন করব—এই-ই আমাদের ভাগ্য?'···

যা—হিল্ডা চমকে উঠলো। সে অবাক হয়ে তার গোল বেড়াল-চোখ তুলে তাকিয়ে বললে : "আমি চাই শান্তি, নিরিবিলিতে থাকা আমার পছন্দ। কে চায় এই রাজ্য জয়?—তোমাকেই তো যে কোন মুহূর্তে সীমান্তে পাঠিয়ে দিতে পারে···" রিক্‌টার ভাবলো, সত্যি কথাই ও বলেছে। জীবন নিয়ে জুয়ো খেলা চলে না, আর তা চালানো উচিতও নয়। কাইজারদের

সময়ে জীবন ছিল অনেক সরল আর সহজ। তখন উদার হতে পারত মানুষ, তারা সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরী করেছিল, সত্যিকার শক্তি ছিল তখন জার্মানীর। ফলের দোকান থেকে আপেল হাত-সাফাই করবার মতোই পারী ওরা নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু এর ফল ওদের ভুগতেই হবে—তা এক বছরেই হোক আর বিশ বছরেই হোক…

হিল্ডার ভাই এল ফ্রান্স থেকে ফিরে; সে সুগন্ধি, মোজা আর চকোলেট নিয়ে এল। হিল্ডা তো মহা খুশি—বড়দিনে ক্রিস্টমাস গাছ দেখে যেমনি খুদে মেয়েরা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে শুনলে যে তার ভাইকে ইংলণ্ড জয় করতে পাঠানো হচ্ছে, সে কেঁদে ফেললে, হাতের চকোলেট গলে গেল। ওর ভাই বললে, 'ভাবনা কি! তিন চারমাসে আমরা ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেব। আমাদের শুধু পার হবার ওয়াস্তা।…তারপরে আমাদের ট্যাঙ্ককে রোখে কার সাধ্যি!'

ওর কথা শুনে রিক্‌টার হকচকিয়ে গেল। কি জানি ফ্যুরার হয়তো ভুলই করেছেন, কিন্তু তিনি সবার উপরে। কিন্তু রুয়েঁর মতো পুরানো শহর চুরমার করতে দেখলে দুঃখই হয়। তা আর কি হবে, উৎসর্গ না করলে বড় কিছু তো সম্ভব হয় না। দেখ তো, ধ্বংস হয়েছে বলেই আজ নতুন ইওরোপ জন্ম নিচ্ছে।

রাতে হিল্ডা তাকে বললো, 'তোমাকেও হয়তো ওরা ইংলণ্ড পাঠাবে…' রিক্‌টার উত্তর দিলে, 'জানি, কি ভয়ানক বল তো! ঝড়ে আমরা পড়েছি, মানুষের জীবনের এখন কোনো দাম নেই…শুধু শপথ কর, তুমি আমার প্রতীক্ষায় থাকবে।…'

রিক্‌টার যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারা যখন জানালো যে তাকে তিন সপ্তাহের জন্য মস্কো যেতে হবে, সে খুব খুশিই হোলো—সেই আশ্চর্য জগতের কথা তার মনে পড়লো, পরম আনন্দেই স্মরণ করলো তাকে। কিন্তু হিল্ডাকে ছেড়ে কি করে সে যাবে? সে দাবী জানালো, হিল্ডাকে বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করতে হবে। তাকে সে পেড়াপীড়িতে অস্থির করে তুললো। হিল্ডা বললে, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ। এখন কেউ ওকথা ভাবে!' রিক্‌টার উত্তর দিলে, 'এমনি সময় বলেই তো বলছি।'

বিদায়ের আগে কর্নেল হ্বিইস্কী তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, রাশিয়া

যেন এক স্ফিঙ্কস্, আর তার রহস্য যদি রিকৃটার সমাধান করতে পারে তাহলে ভালোই হয়। রিকৃটার তো আগেই মস্কৌতে ছিল, সেখানে গিয়ে নিশ্চয়ই পুরনো আলাপীদের কারো কারো সঙ্গে দেখা হবে। রুশরা বোলশেভিকদের কি চোখে দেখে, জানতে পারলে ব্যাপারটা নিশ্চয় কৌতূহলদ্দীপকই হবে। তা ছাড়া ওরা জার্মানীর এই নতুন শাসন-ব্যবস্থার সুবিধের কথা জানে কিনা তাও খোঁজ নিতে হবে, আর শান্তিপূর্ণ বা 'আধা-শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশ' সম্ভব কিনা তাও দেখতে হবে খতিয়ে—হাঁ কর্নেল এইভাবেই ব্যক্ত করলেন তার ইচ্ছা। রিকৃটার কর্নেলের সঙ্গে দেখা হবার কথা হিল্ডার কাছে গোপন করলে, শুধু বললে: 'আগের বারে ছিল সখের ভ্রমণ, এবারে আর তা নয়। এখন আর আমি স্বাধীন নই—' একটু থেমে সে বললে, 'আমি ওদের পোঁ ধরিনি, তাই ওরা আমাকে বিশ্বাস করে···'

লুকুতিনের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাবার সময় কর্নেলের হুকুম তার মনে পড়লো না। তার বুক দুলে উঠলো, পুরনো দিনেব কথা মনে পড়লো, খোলাখুলি আলাপ আর ঠাট্টা তামাসাও চললো। তার যৌবনে সে ছিল কত সরল, তখন ছিল ব্যগ্রতা। কুজেনস্কে সে একদিন এই রুশটিকেই না বলেছিল, সে কমিউনিস্ট হতে চায়। আর লুকুতিন তখন স্বীকার করেছিল, সে পার্টির সভ্য নয়।···হঠাৎ তার মাথায় খেলে গেল ভাবনা, এই তো আমাকে সাহায্য করবার উপযুক্ত লোক! ভাগ্য তার সহায়, সে রাশিয়ার বিরোধীদলের মতামত শুনতে পাবে, সাংবাদিক আর ভাড়াটে গোয়েন্দাদের উপর টেক্কা দেবে।

লুকুতিন তাকে যাতে বন্ধু ভাবতে পারে, তাই সে বললে, নাৎসীরা জিতবে কিনা সে বিষয়ে তার ঘোর সন্দেহ আছে। সে বলতে বলতে রাশ ছেড়ে দিলে, নিজের মনের কথাই বলে গেল। তখন সে মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল সে খবর বার করতেই এসেছে।

'আমাদের দেশে আজকাল স্বাধীনভাবে যারা ভাবে তাদের পক্ষে টেঁকাই দায়। সব কিছুই যেন ফরমায়েসী ব্যাপার, সত্য, নীতি এমন কি কল্পনাও তাই। তৈরি করে যেন হাজির করা হয়েছে। বহুদিন আমি একথা বিশ্বাস করতেই পারিনি তাই সব কিছুরই সমালোচনা করেছি। কিন্তু এখন···

নিজের ভুল স্বীকার করবার জন্য থাকা চাই সাহস। আমি বলব না, সব সময়েই আমি ভুল করেছি, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম বইকি। গোয়েরিং যখন বললেন, মাখনের চেয়ে বন্দুক অনেক ভালো, তখন আমাদের দেশের বহু লোকই হেসেছিল কিন্তু আজ যে রুটি-মাখন আমাদের জুটছে, তা তো বন্দুকের দৌলতেই। বন্দুকই জুটিয়ে দিচ্ছে। ভার্সাইতে জার্মানীর নিগ্রহ হয়েছিল, একথা তো আপনিই জানেন।—হল্যাণ্ডের মতো খুদে দুর্ভাগা দেশও তখন আমাদের থেকে একশো গুণে ভালো ছিল। এখন তো সে ঐতিহাসিক অন্যায় দূর হয়েছে। কিন্তু একথা আমি স্বীকার করি যে, কতগুলো ব্যাপার আমার ভালো লাগে না।···য়িহুদীরা আমাদের দেশের দুষ্টক্ষত একথা ঠিক, কিন্তু পোল্যাণ্ডে আজ যা হচ্ছে···হয়তো আমি মতবাদে একটু বেশি গোঁড়াই হব, কিন্তু তবু ওটা পরিপাক করতে আমিও পারছি না। যাই হোক এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার। কিন্তু নতুন ইউরোপ জন্ম নিচ্ছে। আপনি ভাবতেও পারবেন না, আপনাদের সঙ্গে লড়াই বাঁধেনি বলে আমি কত খুশি। আমাদের মতবাদ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমাদের শত্রু তো এক। আপনারাও তো অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকেন না। আপনাদের কিন্তু···রাগ করবেন না, আপনাদের শ্রদ্ধা করি বলেই বলছি···আপনারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে জানেন। কিন্তু আপনাদের ভিতরে অনেক সেকেলে জিনিষও রয়েছে।···এই আন্তর্জাতিকতার কথাই ধরুন না···।

রিক্‌টার নিজেকে সংযত করলো: 'আমি নিজেই বক্ বক্ করে যাচ্ছি, তাহলে তো কিছুই জানা হবে না···'

'আপনি কিছু বলছেন না কেন, হের্ লুকুতিন?'

'আপনার কথা শুনছি। এই প্রথম একজন জীবন্ত ফ্যাসিস্টের সঙ্গে আমার দেখা হোলো। সত্যিই খুব···'

"আমি, ফ্যাসিস্ট? ইতালী ফ্যাসিস্ট বলে আমাদের দেশে ওদের ঘৃণাই করে। আপনি যদি আমাকে নাৎসী মনে করে থাকেন ভুলই করেছেন। বহু বিষয়ে ওদের সঙ্গে আমার অমিল আছে। আমার সঙ্গে খোলাখুলি আপনি আলাপ করতে পারেন—আমি নিরেট ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিক নই। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া সম্পর্কে আপনার কি মত?"

'দেখুন পররাষ্ট্র নীতি ভারি গোলমেলে ব্যাপার। আর ফ্যাসীবাদের

কথাই যদি বলেন—আমাকে ক্ষমা করবেন, ঐ নামেই আমি অভ্যস্ত…হাঁ ফ্যাসীবাদকে আমি ঘৃণা করি ওকে বন্ধ্যা করে দিতে না পারলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।…মাপ করবেন, আমার একটু তাড়া আছে।'

পাওনা চুকিয়ে রিকটারের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য হাত না বাড়িয়েই লুকুতিন চলে গেলেন।

'হয়তো আমি একটু বেশি ঝাঁঝ মিশিয়ে ফেলেছি কথায়? কিন্তু আমি তো রাজনীতিজ্ঞ নই…চমৎকার লোকটা! কিন্তু একটু জাঁক দেখাতে চায়…ওদের সঙ্গেই আমাদের লড়তে হবে আর সে লড়াই হবে ভয়ংকর—হিটলার ওদের পাঁয়তাড়া শিখিয়েছে। আগে রিকটারের মতো মানুষেরা ভাবত। আজকাল তাদের আর ভাবনার বালাই নেই—নেই বিবেকের বালাই; এমন কি সাধারণ ভদ্রতা-জ্ঞানটুকুও তারা হারিয়েছে। দার্শনিকের দেশই বটে!…"

গোর্কি স্ট্রীট দিয়ে সে চললো। সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে স্পষ্ট উঁচু বাড়ীর সার। ওই বাড়িগুলো তার পছন্দ নয়, কিন্তু এখন যেন একটা স্নেহের অনুভূতিই জাগছে, এক হত্যাকারী যেন খেয়ালী স্বাপ্নিকের চক্ষু মেলে তাদের ধ্বংস করবার জন্য হাত তুলেছে। লুকুতিন আপন মনে ভাবলো, বাঁচতেই হবে আমাদের, ঐ রিকটারদের এখানে আসতে দেব না, বাধা দেব। হাঁ, যদি দরকার হয়তো শুধু তারই জন্য বাঁচতে হবে।…

সার্জির সঙ্গে তার সভায় দেখা হোলো, মনে পড়লো বেলচেভের সঙ্গে বাদানুবাদের কথা। কাফেতে সাক্ষাতের কথা সে সার্জিকে বলতে চাইল, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেল। শুধু বিদায়ের সময়, সে তার হাত চেপে ধরলো শক্ত করে, তেমনি স্নেহ যেন তার প্রতিও তার আছে, যে স্নেহ ঐ বাড়ীগুলো, এই শহর, নতুন কারখানার রেখাচিত্র, এই কঠোর, শান্ত, এই উদগ্র, কামনাময় জীবনের প্রতি সে অনুভব করছে।

লুকুতিনের সঙ্গে আলাপের কিছুদিন পরেই রিক্‌টার মস্কো থেকে চলে এল। হিল্ডার দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল: কি সুন্দরই ও হয়ে উঠেছে! তার দিকে বহুক্ষণ সে তাকিয়ে থেকে একটু ছলনার আমেজ টেনে এনে বললে,

'মস্কোতে বহু চমৎকার মেয়ে আছে।'

উদাসীনভাবে হিল্ডা উত্তর দিলে—

'তাই নাকি?'

সে মনে মনে ভাবলো, ওর মন এখন অন্যের কাছে বাঁধা…ঐ নারীর মনে কি ঘটছে, ও কখনোই জানতে পারবে না।

হিল্ডা এবার জিজ্ঞেস করলো, মস্কোতে সে কি দেখে এল।

"শহর অনেক বদলে গেছে, ওরা বহু নতুন বাড়ি তুলেছে। ওদের পরনের পোষাক এখনো নোংরা, কিন্তু খাবার আছে যথেষ্ট। আমি এক-একবারে পাঁচ-পাঁচটা পেস্ট্রি খেয়েছি। আর লোকগুলোও বেশ হাসিখুশি। দেশটার সবচেয়ে যা খারাপ লাগে সে হচ্ছে তার বিরাট পরিধি—মস্কোই তো ঢের দূর। আমার মনে পড়ছে সাইবেরিয়ায় ভ্রমণের কথা।…কতলোক! পথ ছেয়ে আছে মানুষে, গিস্ গিস্ করছে।…তুমি বুঝতেই পারছ হিল্ডা, একথা মনে হলে কি অস্বস্তিই লাগে… ফ্যুরার অবশ্য ভালোই জানেন কি তিনি করতে চান, কিন্তু যদি লোকসংখ্যার দিক থেকেই বিচার করতে হয়, তা হলে পশ্চিমের উপরই আমাদের নির্ভর করা ভালো। পারী আর লণ্ডনে উপনিবেশ গড়া যাবে না, এ কথা হিটলারী তরুণদলের ঐ নাক-উচ্ কাণো ছোকরারাও বোঝে। কিন্তু রাশিয়া—সে তো এক শূন্য বিস্তৃতি। আমার এক পরিচিতের সঙ্গে ওখানে দেখা হোলো, না কমিউনিস্ট সে নয়, একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, জার্মান ভালোই বলেন। কিন্তু যে-রকম কথা বললেন…ঠিক ঐ রকম কথা উনিশশো তেত্রিশ সাল অবধি আমাদের কমিউনিস্টরা বলতো। রুশরা খারাপ নয়, কিন্তু তাদের চাই উপযুক্ত নেতৃত্ব। আমরা শুধু তাদের

ভাব-ধারার ফিল্ড মার্শাল, শাসক আর বিজ্ঞানীদেরই যোগান দেব না, তাদের আত্মিক উন্নতির জন্য সার্জেন্টেরও যোগান দেব—স্কুলের শিক্ষক, এমন কি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য পাহারাওয়ালা পর্যন্ত সবকিছুর চাহিদা আমরাই মেটাব।—কি বলব, ওরা রাস্তা পার হতে পর্যন্ত জানে না।…এ একটা বিরাট কর্তব্য, এ কর্তব্য শেষ না হলে নতুন ইউরোপের সৃষ্টি অসম্ভব।"

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কার্ট। তুমি কি বলতে চাও, আমরা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি? সে তো পাগলামি! কতদিন যুদ্ধ করতে পারব?'

'ঠিক সাধারণভাবে যুদ্ধ যাকে বলে তা নাও হতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের এক বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছেন, শান্তিপূর্ণ বা আধা-শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশই হবে। তিনি তা বলতে কি বোঝেন আমি জানি না।…হয়তো রুশরা ফরাসীদের থেকেও তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করবে। আমার মতে, গোলমাল শুরু হবে তারপরে—অত বড় দেশটাকে হজম করবার ব্যাপারে। …আমি তো তোমাকে কুজেনস্কের সেই আলাপীর কথা বলেছি। সে হয়তো গেপেউর ভয়েতেই মিশতে চায় নি, ভাণ করেছে, কিন্তু আমরা যখন জিতব, সে ঠিক আমাদের দলেই ভিড়বে…কি জানি কি হয় বলা যায় না। যাই হোক, আমরা যে এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার কাছাকাছি এসে পড়েছি তাতে আর সন্দেহ নেই। বাতাসে তারই তো সংকেত…'

বেড়াতে বেরিয়ে পড়লো রিক্‌টার। বার্লিন তাকে মুগ্ধ করলো, সব কিছু যেন মাপা আর নির্ভুল, লম্বা সিধে সড়ক, একই রকম বাড়ি সার—সব! সে আপন মনে ভাবলো, এই যে কল্পনার অভাব, এও তো এক সুন্দর কল্পনা।

টিয়েরগার্টেনে ছেলেমেয়েরা খেলছে। উত্তপ্ত দিনের পড়ন্ত রোদ পোয়াচ্ছে মূর্তিগুলি। বিবর্ণ রঙের চুরুটে অলস টান দিচ্ছে বুড়োরা। এখানে ওখানে সৈন্যের মেলা। তারা বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে বাঁধছে মেয়েদের, সোহাগ করছে—দেখে মনে হয় ওরা বিজয়ী।

রিক্‌টারের কানে ভেসে এল আলাপ।

'ফ্রানৎস্ তো লিখেছে, ওদের পল্টন নাকি নামবার জন্য তৈরী।'

'হিবলমারসডরেফ-এ পাঁচখানা ঘর আর একটা মস্ত স্নানের ঘর আছে কে বলছিল…'

'ওরা সোমবার থেকে নাকি হল্যাণ্ডের পনীর দেবে, খাঁটি হল্যাণ্ডের জিনিস—জানো, একেবারে ওখান থেকেই নাকি আমদানি...'

'স্মিড্‌ট তো বলে পয়লা মে'র ভিতরেই সব চুকে-বুকে যাবে...'

রিক্‌টারের আনন্দ হোলো। কি শান্তি! এই মুহূর্তে লণ্ডনের বাসিন্দেরা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে ভয়ে—কোথায় লুকোবে—মাটির তলার খুপরীতে না খাতে—এই তাদের এখন ভাবনা। কিন্তু এখানে আছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, নিজের শক্তির চেতনা। লুকুতিনকে যদি এই বাগানে, এই মূর্তি আর ছেলে-মেয়েদের পরিবেশে আনা যেত, তাহলে সে বুঝত তার চাষীরা এই বিরাট সংহতি শক্তির বিরুদ্ধে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না। রাশিয়ায় বেড়াতে গেলে ভালোই লাগবে, কিন্তু ওখানে কেউ থাকতে পারে না। রবার্ট ঠিকই বলেছিল, এ যেন আর্কটিক আফ্রিকা।...ববার্ট হিল্ডার সঙ্গে দু-দুবার দেখা করতে এল কেন?...ঐ খসড়া নিযে ক'দিন সবুর করলেই পারত...হয়তো সে-ই হিল্ডাব মন চুরি করেছে? পাগল, হিল্ডা পাগল! রিক্‌টার হঠাৎ নিজের মনের ছবি দেখে হেসে উঠলো: ওথেলো!...কিন্তু সে কি করবে, এ যে তার স্বভাব। বাইরে সে সংযত, কিন্তু হিল্ডা জানে সে কি দুর্দম। জার্মান চরিত্রের এই তো রহস্য—শাশ্বত শক্তির আকর। ফরাসীরা তর্ক করতে ভালোবাসে, ইংরেজরা বেনিয়া, রুশরা উদ্ভট স্বপ্নবিলাসী কিন্তু আমরা ছিঁড়ে খুঁড়ে এগিয়ে চলি—আমরা—আমরা গতি। ফ্যুরার জার্মান চরিত্রের মূল রহস্য বুঝেছেন—তিনি আমাদের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন—তাই এখন আমরা আত্মিক বিস্ফোরকের সঙ্গে মেলাতে পেরেছি এক অপূর্ব সংগঠনী শক্তি। আমিই বা কেন ঝড়ের ভয় করছিলাম? হিল্ডাকেই বা কেন ভয় পাইয়ে দিলাম...আর সবাই ঝড়ের ভয় করুক না, আমাদের ভয়ের কারণ নেই—আমরা নিজেরাই তো ঝড়।

## নয়

যখন রঙ্গমঞ্চে যবনিকা নেমে আসবে, যখন নায়িকার দুঃখের পালা সাঙ্গ হবে, বিজয়ী হবে নায়ক, শেষ প্রশংসাধ্বনির ক্ষীণ রেশের আবেদনে অভিনেতারা

এসে আর দাঁড়াবে না পাদপ্রদীপের আলোয়, যখন লোকেরা জোব্বা-রাখবার ঘরে ভিড় জমিয়ে তাদের ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আলাপ করবে, তখন হয়তো কোনো মেয়েকে দেখা যাবে শূন্য প্রেক্ষাগৃহে, চোখ তার তখনো কিছু দেখছে না, বিয়োগান্ত নাটকের লীন ভাবাবেগের মধ্যে তখনো সে বুঝি বেঁচে আছে। এই কি সেই মেয়েটি নয়, যে ছবির গ্যালারীতে একখানা পুরনো দিনের প্রতিকৃতির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে, ছবিখানা তেমন কিছু নয়, তবু চেয়ে থাকা তার ফুরোয় না। যে জীবন বহুদিন বিগত সে কি তার মানে খুঁজতে চায়? এই কি সেই মেয়েটি নয়, যখন তার বন্ধুরা ঝেনিয়া আর মাশার কথা নিয়ে হাসি তামাসা করে, তখন সে হঠাৎ নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে মনে মনে আবৃত্তি করে :

প্রেম, প্রেম,
ঐতিহ্য তো বলে, দুই আত্মায় এ মিলন
তাদের মিশ্রণ, যোগাযোগ
এক হওয়াই তো তাদের নিয়তি
আর তারই দ্বন্দ্ব তাদের…

ঠিক এমনি মেয়ে যেন ভালিয়া। সে অভিনেত্রী হবে এই স্বপ্নই দেখেছে, কিন্তু দেখা গেল তার সে ক্ষমতা নেই। তার সম্বল শুধু ভাবপ্রবণ মন, শিল্পে নিবেদিত হতে সে বাধ্য করে মাত্র। একদিন বৃদ্ধ অধ্যক্ষ তাকে বললেন, বেচারীর বোকামি দেখে সহানুভূতিতে ভরে উঠলো তার মন, 'আর কোনো পেশা বেছে নাও। সিনেমায় আসতে চাও কেন?…এ শিল্প তো দর্শকদের জন্য, আর একশো কি দুশো বাছাই করা মানুষের জন্য এর সৃষ্টি। তোমার পক্ষে শক্তই হবে, সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে হয় তুমি জমে যাবে, নয় তো দর্‌দর্‌ করে ঘাম ছুটবে। তার ফলে কি পাবে—ওরা তোমাকে গাদায় নামাবে, কারো নজরেই পড়বে না। যদি ভাগ্য ভালো হয় তো দশ বছর পরে একটা ভূমিকাও মিলে যেতে পারে—জেলা সোভিয়েতের কর্তাকে তুমি হয়ত একটা শুয়োরছানা দেখিয়ে বলবে 'একে আমরা মস্কোয় পাঠাচ্ছি। প্রদর্শনীতে পাঠাচ্ছি…' ব্যস্‌ পার্ট শেষ হয়ে গেল!…এই জীবন কি তুমি চাও? তোমার চোখ নষ্ট হবে, নিজে ব্যর্থ হবে…।' ভালিয়া কথা শুনে দুঃখই পেল, কিন্তু স্বপ্ন ছাড়লো না। দরকার হয়তো সে ঝি-গিরি করেও তার কলালক্ষ্মীর সেবা করবে।

ছাব্বিশ বছর তার বয়েস, কিন্তু জীবন তার কুয়াশায় ভরা, ভোরের কুয়াশা যেন তাকে ঘিরে আছে। বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য সারা শহর পাক দিয়ে বেড়াতে সে রাজি, কিন্তু নিজের জন্য কিছুই সে করতে চায় না, পারে না। শুধু শুধু তার মা তাকে 'ঘুমন্ত' নাম দেননি। ভালিয়ার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার ক্রাইলভ বিস্ময় চেপে রাখতে পারেন না। কখনো কখনো ওকে সাধারণ মেয়ে বলেই মনে হয়, আবার পরমুহূর্তেই ও সুষমাময়ী হয়ে ওঠে, কখনো বা উদ্দাম চঞ্চলা, কখনো বা আনমনা—তার মন তখন চলে যায় অনেক দূরে।

ভালিয়া গ্রীষ্মটা কিয়েভ-এই কাটিয়ে দিতে এলো। তার পিকউইক ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হবে, এই আশায়ই তখন সে উৎফুল্ল, নিঃসঙ্গতায় সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। মা তো শুধু গাদা গাদা খাবার খাইয়ে পেট ভরালেন। বাবা একটু দ্বিধা ভরেই যেন জিজ্ঞেস করলেন—'মস্কোর ওরা কি বলে—তুমি কিছু করতে পারবে ওখানে' ?···ভালিয়া নিরুত্তর।

রায়াকে সে চিনতে পারলো না যেন—খামখেয়ালি, আনমনা মেয়ে, ওকে বিশ্বাস করা যায় না। ওসীপ এখনো পেচোরায়। রায়া ভালিয়াকে বললে, 'ও আমাকে ভুলে গেছে, ঠিক ভুলে গেছে···এত একেবারে পরিষ্কার ব্যাপার···ওর জন্য আমিও আর বসে নেই।' জিনার পাত্তাই মিললো না; সে তার ঘর ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। শুধু গালোচকাই রোজ সন্ধ্যায় দেখা করতে আসে আর মস্কোর কথা জিজ্ঞেস করে, রেড স্কোয়ার আর থিয়েটারের কথা পাড়ে। কিন্তু ভালিয়া আর সবার মতোই গালোচকার উপর মুরুব্বীয়ানা ফলায়; মেয়েটাকে দেখলে হাসি পায়।

কিয়েভ-এ আসার এক কি দু' দিন পরে ভালিয়া বোরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেল। ভেরা প্লাতোনোভ্না দোর খুলে দিলেন।

'ও তো বাড়ি নেই বাছা, কি একটা কাজে পাঠানো হয়েছে তারনাপোল শহরে···'

ঝাড়ন দিয়ে তিনি চোখ মুছলেন, তারপরে বললেন,

"বোসো, বোসো! আর তুমি তো এখন মস্কোর মানুষ বনে গেছ·· ওখানে ভালো লাগছে তো ?···কাজকর্ম ভালো চলছে তো ?···"

ভালিয়া ভেঙে পড়লো—চোখ দিয়ে জল ঝরছে। তার মাকে যা বলতে পারে নি, ভেরা প্লাতোনোভ্‌নাকে সেই কথাই বললো।—

'আমার অভিনয় প্রতিভা নেই। আমি কিছুই করতে পারব না—'

"ওকথা বলছ কেন বাছা? 'কিছুই করতে পারবে না—' তুমি একটা কিছু হবেই। কষ্ট না করলে কিছুই হয় না। দাঁড়াও, চা খেয়ে যাবে, আমাকে সব খুলে বলবে..."

মস্কৌতে ফেরবার আগে ভালিয়া নদীতে নৌকো বাইতে গেল একদিন। মন তার নেচে উঠলো—তীর যেন সাদা, সবুজ সোনালীতে মেশানো, সেদিকে তাকিয়ে মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা, তরুণ মনের স্বপ্ন দেখা দেয়। আমি এখানে থেকে যাব নাকি? হয়তো তাই-ই ভালো...রায়া আর গালোচ্‌কা আছে এখানে, বোরিয়া তো ফিরে আসবে...ভেরা প্লাতোনোভ্‌নার কাছে খুলে বলতে পারবে মনের কথা...আর সব চেয়ে বড় কথা—এই তার কিয়েভ। ...যে এখানে জন্মেছে, সে কি আর অন্য শহরে গিয়ে সুখ পাবে।...কিন্তু এ তো মুহূর্তের দুর্বলতা: মস্কৌতে আছে কলাভবন, শিল্প। তাই ভালিয়া মস্কৌতেই ফিরে গেল।

সার্জির প্রতি তার আকর্ষণ উদগ্র, সে যেন নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে চায় তার কামনার ভিতরে; দুই বা তিনবার দেখা হবার পরই সে বুঝেছে, সে তাকে ভালোবাসে। এতদিন সে ভালোবাসার ছায়াকেও মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, নির্বাসন দিয়েছিল। যারা তাকে আগে ভালোবাসা জানাতে এসেছিল, তাদের হীন বলেই তার মনে হয়েছে, তাদের ভালোবাসায় ছিল নীচতা, আর পাপ। সে চঞ্চল প্রেমকে ভয়ই করেছে; অনেকে যেমন মদের গেলাসে চুমুক দিতে গিয়ে ভয় পায়—এও যেন তেমনি ভয়। কি জানি যদি মাতাল হয়ে যাই, যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি! তার চেয়ে একা থাকাই ভালো, ভালো এই নিঃসঙ্গতা। তা ছাড়া—এই কি ভালোবাসা?...ওরা গভীর ভাবে ভাবে না, ওদের কাছে ভালোবাসা এক খেলা, একটু আমোদ। তাহলে কি দেখে সে সার্জির দিকে ছুটে গেল, আকৃষ্ট হোলো? সে তো অভিনেতা নয়, কবিও নয়। হয়তো তার নম্র ধূসর চোখে, তার গম্ভীর মুখে—তার ভাবদ্যোতনাময় ভঙ্গীতে আছে আকর্ষণ?...অথবা যে অনুপ্রেরণা নিয়ে সে কথা বলে যায়? এ কথাগুলো তো ভালিয়ার কখনো ভালো লাগত না,

এখন কি করে লাগে ?·· অথবা তাই-ই কি শেষে ঘটলো—ভালোবাসাই শেষে এল তার জীবনে ?···সার্জির সঙ্গে তার দেখা—সেই তো ভরে রেখেছে তার জীবন। এইত এখন ভোরে জেগে উঠেই সে বুঝতে পারে—দিনটা কি ভাবে যাবে। রাস্তায় গাড়ির নম্বরগুলো যেন তার সঙ্গে কথা কয়, ঘড়ির কাঁটাটা তাকে পাগল করে তোলে।

বসন্ত এসেছে ; জোরালো হাওয়া আর রোদে ভরা দিনে মস্কৌ যেন তার জীবন ফিরে পেয়েছে। আনাচ-কানাচ থেকে ঝরে পড়ছে জল, গলি-ঘুঁজিতে কল কল করে ছুটছে জল, তুষার ঝেঁটিয়ে সাফ করা হয়েছে ছাদ থেকে। লোকেরা পা চালিয়ে সরে সরে যাচ্ছে ; হাসছে তারা জোরালো হাসি। ফুলওয়ালীরা মিমোজা ফেরি করছে, আর শুকনো, শীর্ণ ফুলের গোছা নয়, এখন পরিপূর্ণ আর রং-এর সমারোহে উজ্জ্বল। ফুলের গোছা থেকে যেন খুশি উপছে পড়ছে। আর অমনি খুশি আর উজ্জ্বলতা দেখা দিয়েছে ভালিয়ার চোখে। সে এসেছে সার্জির কাছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সন্ধ্যার আঁধার ছেয়ে গেছে ঘরে, সব কিছু যেন বদলে গেছে। পোশাকের আলমারীটা যেন একটা গাছ, গালচেখানা যেন এক প্রান্তর। আঁধারের চূর্ণ যেন ভালিয়ার মুখে, তার চুলকে দিয়েছে সে আলুল করে, তার চোখে দিয়েছে সব-কিছু বিস্মৃতির অঞ্জন এঁকে—বেলাডোনার এ অঞ্জন। সে সার্জির দিকে তাকালো—বিস্ফারিত তার দৃষ্টি—নিয়তির মতো সংকোচহীন।

আনন্দ আর ভয়ে ভরা তার বুক—

"আমি কিছুই হতে পারব না। অভিনেত্রী হতে আমি চেয়েছিলাম··· কিন্তু কত কিছুই তো মানুষ চায় !·· তার জন্তে চাই আলাদা ভাগ্য···"

'মানুষকে বাঁচতে হবে—ব্যগ্রতা নিয়ে বাঁচতে হবে—একশোটা বা তারও বেশী জীবনকে এক জীবনে পূর্ণ করে তুলতে হবে···'

'লারমন্তভ বেশ অল্প বয়েসেই মারা যান···কিন্তু তারই মধ্যে অত কথন লিখলেন ?···হয়তো তাঁর অনুভূতির থেকে প্রগাঢ় ছিল আশঙ্কা ?···'

'কিন্তু আশঙ্কা যখন দেখা দেয় সে তো ভয়ংকর—। তুমি তা জানো ভালিয়া···'

'না, জানি না ! আর ওকথা আমায় বোলোও না !···'

'আজকের মস্কৌ যেন ঝড়ের আগের সমুদ্র।'

'আমি সমুদ্র কখনো দেখিনি···কিন্তু তুমি যা বলছ, তা তো সত্যি··· শেরিওঝা !···'

সে নিজেকে বিলিয়ে দিল তার কাছে, তার এত দিনের অনভিজ্ঞ ঠোঁট আর অবদমিত লুকানো কামনা, মূক কামনা ফেটে ছড়িয়ে পড়লো। সে এবার বুঝলো কামনার কত শক্তি, কত তার ওজন, চোখ নিষ্প্রভ হয়ে এল, নিঃশ্বাস এল ফুরিয়ে। হঠাৎ ভালিয়া ফুটে উঠলো নারী রূপে। এ যেন রূপকথার মতোই। সে দেহ সঞ্চালনে নিপুণ, এই সে খামখেয়ালি, আবার পর মুহূর্তেই একান্ত বাধ্য, এই সে কোমল, আবার পরক্ষণেই কামনাময়ী। সে আর সে-ভালিয়া নেই, যে সার্জির কাছে আসতে ভয় পেয়েছিল, দ্বিধা জেগে-ছিল মনে—সে আসবে কি আসবে না তারই দ্বিধা। এ যেন নিপুণা ভালিয়া, অভিজ্ঞা ভালিয়া। সে অনুভব করলো সার্জির পেছনে আছে বহু বছরের স্মৃতি। পুরানো দিনের মোহ, পুরুষের চপলতা, আছে কত জিনিষের ভাবনা—হয়তো পারীর কথাও আছে তার সঙ্গে মিশে, আছে সেতু আর তারাদের কথা। সে তো সেখানে নেই, সে ছাড়া সবাই আছে। সে তবু এখন তারই পাশে, এখনো জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার, এখনো প্রকৃতিস্থ হয়নি। এখনো সে তার, উত্তপ্ত, মথিত, বিবশ সার্জি—ওর মতো মানুষ কখনো বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবে না, কথাও এখন বলবে না, কিন্তু ওর হাত দুখানি, তারা তো ঘড়ীর কাঁটার মতোই···তেমনি অমোঘ। আমি কি পাগল হলাম রায়ার মতো! না, আমি আর ভাবব না, এখন জীবনের খসড়া তৈরী করব, খুঁজে নিতে হবে নিজেকে।

ভালিয়া আবার সার্জিকে জড়িয়ে ধরলো, খুঁজে খুঁজে পেল তার ঠোঁট। আলো জ্বালিয়ে সার্জি অবাক হয়ে গেল—এমন তো ভালিয়াকে সে কখনো দেখে নি, তার মুখখানা যেন খুশির সুষমায় ভরে উঠেছে। কখনো কখনো গভীর নদী খুবই স্বচ্ছ হয়, যে কেউ নৌকোর হালে বসে দেখতে পায় নদীর তলদেশ ; তেমনি পরিপূর্ণ সুখের মহান মুহূর্তে নিজের প্রিয়তমার আত্মাকে বুঝি দেখা যায়। ভালিয়া এবার প্রকৃতিস্থ, সে চেঁচিয়ে উঠলো :

'তুমি কি পাগল হয়েছ! আলো নিবিয়ে দাও!'

প্রচণ্ড ভাবাবেগ যখন উদ্বেল হয়ে ওঠে, জীবন তখন জটিল পথে চলে। সেই অন্ধকার ঘরে কেন ভেসে এল এক অদ্ভুত ছায়া?···প্রশস্ত সড়কের দুধারের

গাছের খসা পাতা, সূর্যাস্তের নদীর ধূসর আলোড়ন, গোলাপের গন্ধ, পেট্রলের কটুতা, একটা স্টুডিয়ো, এখানে ওখানে ছড়ানো ছবি…সার্জির সব কিছুই মনে পড়লো ; এখনো উত্তাপ তাকে ঘিরে আছে, কিন্তু মন সন্দেহে আকুল, চপল বলে নিজের উপর জাগছে ধিক্কার। সে কোনো কথা বললে না, কিন্তু ভালিয়ার স্নায়ুতে স্নায়ুতে বিবশতা, সে বুঝতে পারলো সার্জি তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। সে কোনো প্রশ্ন করলো না, ভৎসনায় মুখর হয়ে উঠলো না, অনুযোগ জানালো না, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো না, একটুও বাসো না। কিন্তু আমার কাছে তো একই কথা…আমি সুখী, বড় সুখী…'

তার চুমুতে চোখের জলের নোনা স্বাদ।

জীবন্ত যে সেই তো জিতলো : ভালিয়া ভাবলে সার্জি বহু দূরে চলে গেছে, কিন্তু সে তখন তার পাশেই, সে বিপর্যস্ত, তার প্রতি অনুরক্ত, সে তার পেলব হাত দু'খানির উপর চুমু খেয়ে বললো :

"তুমি ভুল করছ! আমি তোমাকে ভালোবাসি! তোমাকে প্রথম দেখেই আমি ভালোবেসেছি…সেই হেমন্তের দিনে, যেদিন তোমাকে আমি নাতাশার ওখানে দেখলাম…"

"দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ আমার ভাগ্য গুনেছিলেন সেদিন। তিনি তোমার কথাই বলেছিলেন…"

"শেরিওঝা, আমার এত আনন্দ হচ্ছে, নিজেই লজ্জা পাচ্ছি! আমার দিকে তাকিয়ো না, না, তাকিয়ো না, তোমার কাছে এই আমার ভিক্ষা—এই আ-মা-র ভি-ক্ষা!…"

সে হেসে উঠলো। গ্রীষ্মের দিনের কথা সে বলতে লাগলো—তারা দু'জনে যাবে সমুদ্র তীরে—হাঁ যাবেই—সে তো সমুদ্র কখনো দেখেনি!… তার মনে পড়লো সার্জি ঝড়ের কথা বলছিল, আবার তার বুক ভয়ে ভরে গেল।

'আমাদের কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না, তাই না শেরিওঝা?'

'হাঁ'।

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই!'

'তাহলে আর যুদ্ধ হবে না?'

'না।'

সে দৃঢ় বিশ্বাসেই উত্তর দিলে। কিন্তু কেন? মাদোকে তো সে ভিন্ন উত্তরই দিয়েছিল, সে জানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এখন—এই মুহূর্তে সে বিশ্বাস করে সব কিছুই যে করে হোক ঠিক হয়ে যাবে—সে যে সুখ চায়, অফুরন্ত সুখ চায়—সে তো স্বপ্ন নয়, ছায়ার মত পারীও নয়, এমন কি মাদোও নয়, যে-মাদো বোয়া দ্য বুলোঁর প্রশস্ত পথে ঘুরে বেড়াত—সোনালী গোধূলির বিবর্ণতায়, সোনা আর ছাই মেশানো সে স্মৃতি। না, সে চায় সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ, তার উত্তাপও থাকবে, সে যেন হবে ভোরবেলার বাগানের মতো, শৈশবের মতো। ভালিয়ার কোঁচকানো পোশাকের দিকে তাকিয়ে সে আপন মনে ভাবলো—পোশাকে সুখ ছাপা রয়েছে…সে পারলো না যুদ্ধের ছবি আঁকতে—এ যেন এক ভয়ংকর, অর্থহীন শব্দ ইথার তরঙ্গে ঘূর্ণি তুলেছে…কিন্তু ভালিয়ার গাল দুখানি, ওর যুগ্ম স্তন, ওর দুই হাত—ঐ তো সুখ—ঐখানেই সুখ।

ওরা এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা, হাওয়া জোরে বইছে মস্কোর উপর দিয়ে। হঠাৎ জোর বেড়ে গেল হাওয়ার, যেন সে গাছ-পালা উপড়ে ফেলতে চায়, পথের আলো নিবিয়ে দিতে চায়। সার্জির মনে পড়লো ঝড়ের কথা…হঠাৎ এক অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেললো। তার শান্ত প্রাত্যহিক জীবনের উপর করুণা দেখা দিল—করুণা! আর করুণা দেখা দিল ভালিয়ার প্রতি, ও তো বিশ্বাস ভরেই তার হাত ধরে আছে, তাকে ঘিরে রাখতে হবে ঢালের মতো, রক্ষা করতে হবে হিংসা থেকে, বাঁচাতে হবে!…

## দশ

মরিস ল্যাঁসিয়ের বহু পরিবর্তন ঘটেছে, এখন তিনি একটু কুঁজিয়েই চলেন, মাথায়ও টাক পড়ছে। যদি কেউ তাঁকে স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করে, তিনি উত্তর দেন, 'ধন্যবাদ, টেনে হিঁচড়ে চলছি তো এখনো'…নিজের মনে মনে বহু

বাদানুবাদ তিনি করেছেন, পারীতে ফিরে যাবেন কি যাবেন না। জার্মানদের তিনি দেখতে পারেন না, বিদেশী শাসনে এই বুড়ো বয়সে বাস করতে হবে, এ কথা তাকে পীড়াই দেয়। অমার্জিত মানুষের শাসন সহ্য করতে হবে শেষে! সুখের দিনে যে কুঁড়েমি তিনি উপভোগ করতেন, এখন তাতে বিরক্তিই লাগে —ভোর থেকে রাত অবধি মার্সেলিনের কথাই ভাবেন।

বার্টি পারী থেকে ফিরেছে, সে বললে জার্মানরা ভদ্র ব্যবহারই করছে, জীবন আবার ধীরে ধীরে পুরানো ছকে ফিরে আসছে। করবেইয়ে দখল হয়নি, বার্টিই সব ব্যবস্থা করেছে। তবে রোম-আইনে নিয়ে গোলমাল চলছে, জার্মানরা আলপের্ত-এর জন্মের কথা নিয়ে হৈ চৈ বাঁধিয়েছে। কিন্তু লাঁসিয়ে যদি এখন পারীতে যান, তাহলে সব গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে পারেন।

লাঁসিয়ে খুব খুশিই হলেন। নিজের পথ আর নিজেকে বেছে নিতে হবে না, ভাগ্যই নির্দেশ দিচ্ছে, কি করতে হবে। তিনি মাদোকে বললেন:

'আর উপায় কি—বার্টি আমাদের পারীতে নিয়ে যাবে।'

করবেইয়ে থেকে একশো গজ দূরে জার্মান বিজ্ঞপ্তি লাঁসিয়ের চোখে পড়লো: 'সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য পানশালা।' লাঁসিয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন, মার্সেলিন ঠিক সময়েই গেছে···হয়তো, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন লিওন্স কি মার্সেইতে যাওয়াই ভালো? অন্তত জার্মানরা তো সেখানে নেই···কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়লো, বাস্তুহারার ভিড়ে ভরা শহরগুলি, নোংরা হোটেল—আর দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ অবকাশ, কিছু করবার নেই। কেন কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো বিদ্রোহী হবেন? সে তো বৃথা। এমন কি ভার্দুনের বীর নায়কও মতোঁয়েরে গেছেন হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করতে। আর উপায় তো নেই—আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি। এখন তো জার্মানরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে না, ওরা ইংরেজদের সঙ্গেই করছে। আমাদের তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই···ইংরেজরা জার্মানদের থেকে ভালো কিসে? ওরা আমাদের নৌ-বহর ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল?···মশাই, যারা নতুন উপনিবেশ গড়তে চায় তারা আমাদের রক্ষা করতে আসে নি, তারা এসেছে তাদের নতুন প্রভুদের জন্যই। কিন্তু আমার কারখানায় ফরাসীদের আমি কাজ দেব। না মশাই, ফরাসী শ্রমিকরা আপনাদের ধ্বংসাত্মক কার্যের

আহ্বান বোঝে না। আপনারা শুধু রাজনীতি, আর রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত, চিরন্তন রাজনীতি। কিন্তু শ্রমিকের আছে সন্তান-সন্ততি তাদের মুখের খাবার জোগাতে হবে…নিজের মনে মনে এমনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা আওড়াতে-আওড়াতে লাঁসিয়ের হঠাৎ লুইর কথা মনে পড়লো। একেবারে ছেলেমানুষ সে, কোথায় গেল? সৎ আদর্শে সে চালিত—কবিতায় তার মন ভরা… রোমান্সের নেশাও আছে…এমন ছেলে নিয়ে মানুষ গর্বই বোধ করে!…কিন্তু রাজনীতির সে কি জানে? অন্তে বক্তৃতা দেবে, সামরিক সম্মান-চিহ্ন পাবে, টাকা রোজগার করবে, কিন্তু ছেলেটা মারা যাবে…এক জুয়া খেলা চলছে, বোকামি তাতে আছে, আর আছে পাপ! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জার্মানরা জিতবে। ফ্রান্সের ভাগ্য লণ্ডনের ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে বাঁধা নয়।

সদর দপ্তর থেকে ফিরে লাঁসিয়ে মেয়েকে বললেন:

"একথা অবিশ্যি ঠিকই, এখান থেকে ওরা দূর হয়ে যাক—এই-ই আমি চাই, কিন্তু যদি ন্যায়ত বলতে হয়,—ওরা ভদ্র, আর আমাদের ঠিক চিনেছে। আমাদের সব কিছু ওদের জানা। যেই আমি আমার নাম বললাম, ওরা রোস-আইনে সম্বন্ধে বলতে লাগল। ওরা সাহায্য করবে বলেছে…বড় দুঃখ হয় ওদের মত এমন উৎসাহী আর জীবন্ত মানুষ আমাদের মধ্যে একজনও নেই।"

লাঁসিয়ে কাজ শুরু করলেন। তিনি সন্ধ্যাগুলো কাটাতে লাগলেন নস্যিদানি আর বই মনের মতো করে বার বার গুছিয়ে, কখনো বা নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন বন্ধুদের। আবার পুরানো জীবনকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন কিন্তু সব কিছুতেই যেন ওষুধ গেলবার পরের তিক্তস্বাদ। তার মনে হোলো, তারই কারখানার মজুররা তার দিকে ঘৃণাভরে তাকায়; একজন তো বলেই বসলো: "তাহলে হিটলারের হয়েই আমরা খাটছি।" লাঁসিয়ে জ্বলে উঠলেন: 'তুমি আজকাল ইশতেহারগুলি পড়ছ বুঝি। আমি রাজনীতির কি ধার ধারি? আমি ফ্রান্সের সেবা করছি।' মজুরটি হাসলো: 'হাঁ ঠিকই কত্তা আমি ঠাট্টাই করছিলাম।'…কিন্তু এতে ব্যথা পেলেন লাঁসিয়ে সব চাইতে বেশি: এরা ভয় পেয়েছে, বিশ্বাস হারিয়েছে।…করবেইয়ের তুচ্ছ জিনিস-গুলোও মার্সেলিনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিশেও তিনি সুখ পান না—তারা যে শ্রান্ত, উদাসীন ভাবে অনিচ্ছায় কথা বলে। কালে ভদ্রে কেউ বা জিজ্ঞেস করে জার্মানরা কি শীগ্‌গিরই ইংলণ্ডে নামবে।

সবাই এখন সাবধানী, এমন কি নিজেদের বৃত্তে পর্যন্ত সতর্ক হয়েই কথা বলে। তাই এমনি ধারা প্রশ্ন শুনে বোঝা শক্ত প্রশ্নকারীর কি উদ্দেশ্য।—সে কি জার্মান বিজয়ের স্বপ্ন দেখছে, না, তার পরাজয় চাইছে। লাঁসিয়ে এখনো কথাবার্তার মোড় ঘোরাতে গিয়ে বলেন, পল ভ্যালেরীর কবিতা খুবই সুন্দর, কিন্তু উত্তাপহীন; কিন্তু এ নিয়ে আর তর্ক বাঁধে না কেউ প্রতিবাদ করে না। তারপর আবার কথাবার্তা সাধারণীর খাদে গিয়ে পিছলে পড়ে—কার আত্মীয় নরম্যাণ্ডি থেকে ভাল মাখন পাঠিয়েছে, কে এক টনি নাকি এখনো বেশ কিছু খাঁটি কফি বার করে দিতে পারে। এখন আর মিনিয়েচার (ক্ষুদে প্রতিকৃতি—শিল্প কলায় ব্যবহৃত শব্দ) কি বিবর্ণ ফোটো লাঁসিয়েকে চাঙা করে তুলতে পাবে না; তিনি হঠাৎ তার প্রিয় জিনিষগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দীর্ঘ হাই তুলতে থাকেন। কি একঘেয়ে!…অথচ আগে এই সবের ভিতরেই বেঁচে ছিলাম…

করবেইয়ের গর্ব সেই সুদানের ছাগলটি একদিন খাওয়া হোলো। লাঁসিয়ে এই শোকাবহ ঘটনাকে উৎসবে পরিণত করতে চাইলেন, পুরানো বন্ধুদের জড়ো করলেন, আর এমন এক অপূর্ব সস্ তৈরী করলেন যাতে ঐ বুড়ো ছাগলের মাংসও ভেড়ার মতোই নরম হয়। সাবাঁ, নিভেল, ডাঃ মোরিলো আর ছ্যমা এলেন ভোজে। অধ্যাপককে দেখে লাঁসিয়ে খুবই খুশি—ছ্যমা তো এখন তপস্বীর জীবন কাটাচ্ছেন, তিনি বলেন আমি আর বাড়ির বাইরে যাই না—পথে পথে যে ওদের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে…লিও এল না লাঁসিয়ে কিন্তু তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যখন কেউ তার পুরোনো অংশীদারের কথা তোলে লাঁসিয়ে চেঁচিয়েই ওঠেন ক্ষোভে—সত্যি কি ভয়ানক!… লিও কেন সইবে এই দুর্ভোগ? জার্মানরা এমনিতে বিবেচক। তাদের বিজ্ঞানও একেবারে আধুনিক কিন্তু এই জায়গায়ই ওরা উন্মাদ…। আর সবাই থাকতে ওরা য়িহুদীদের উপরই বা এত খাপ্পা কেন? না, ও কথা না ভাবাই ভালো। কিন্তু ছ্যমা যেন ইচ্ছে করেই ওর কথা জিজ্ঞেস করলেন:

'আলপের্ত আসছে না.?'

'আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছি কিন্তু সে এখন নিরিবিলিতে থাকতে চায়।'

'ভালোই করেছে, ছ্যমা গর্জে উঠলেন, ঐ হতভাগাদের কমই দেখতে হয়।'

নিভেল পরিবেশটা হালকা করবার জন্য নির্জনবাসীদের সম্বন্ধে বলতে শুরু করলো। আধুনিক সভ্যতার দূষিত আবহাওয়ায় এরাই তো মহান। নিঃশব্দে সুদানের ছাগলের মাংস খাওয়া চললো। ল'াসিয়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু করতে চাইলেন। নিভেল উত্তর দিলে, 'হবাগ্‌নারের কথা যদি বলেন—' জ্যমা হঠাৎ উঠে পড়ে পাইপ থেকে গালচের উপর ছাই ঝেড়ে বললেন :

'খাওয়া আর গল্পের পর্ব শেষ—এবার বাড়ি ফেরা···মরিস, জানো, সব কিছু কিন্তু প্রচণ্ড ঠাট্টা বলেই মনে হচ্ছে···'

সারা শহরই এই ঠাট্টার ভিতরে বেঁচে আছে। পুরনো নাম নিয়েই বেরুচ্ছে খবরের কাগজ—সেই পারী সোয়ার, পেতি পারীসিয়েঁ মাতিঁ—তাদের পাতায় পাতায় বিখ্যাত নামের স্বাক্ষর ঝলমল করছে। ক'দিন আগে এই কাগজগুলোই জার্মানদের নিন্দা করত, আজ তারা হিটলারের মহিমায় মুখর। কেউ এতে অবাক হোলো না। অবাক হোলো না পারীর বিলাসিনী-দের সাঁজেলিজে দিয়ে জার্মান পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যেতে দেখে। আর অবাক হবার বুঝি কিছু নেই। মানুষ জার্মানদের কাজ করছে, জার্মানদের কাছে জিনিষ বেচছে, কিনছে। হর্ষধ্বনির প্রত্যুত্তরে পাদপ্রদীপের সুমুখে এসে অভিনেতারা বক্সের দিকে তাকাচ্ছে সেখানে আছে এক জার্মান-জেনারেল। শার্কেও এখন পারীতে, বিজয়ী হিসেবেই সে ফিরে এসেছে, তবু বিচক্ষণতা গর্বে উবে যায় নি। বিচক্ষণ ভাবেই সে বলছে : "কারও উপরে জোর করে কিছু আমরা চাপাতে চাই না। আমরা অনুপ্রেরণা দেব"। অভিজাত সমাজের বৃত্তে জাতির বিশুদ্ধতার কথা শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে গ্রাম্য জীবনে ফিরে যাওয়ার কথা ; স্বাধীন চিন্তাধারার বিরুদ্ধবাদীতাও মানুষ করছে, ওতেই তো ফ্রান্সের সর্বনাশ হয়েছে। এক গীর্জা-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা, কঠোর নিয়মে ভবিষ্যতের মানুষদের পালন—তারই প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। রঙ্গালয়গুলোর দরজা খুলেছে, আতেলিয়ে দ্য মোদে, ব্যাঙ্ক আর নানা প্রতিষ্ঠানগুলোরও দরজা খোলা ; কিন্তু যে ইচ্ছাশক্তি মাংসপেশীর সঞ্চালনে সাহায্য করে তা তো নেই, নেই জীবনের সঙ্গতি। তারই তো অভাব। নকলে ভুলছে না মানুষ। নতুন পোশাকের বদলে দেখা দিয়েছে জটিল চুলের কেয়ারী, কিন্তু সুন্দরীদের সেই বিলাসী কেশ-শোভায় ম্লান শোকাকুলই দেখাচ্ছে—তাদের মুখে দুঃখের ছাপ, উপবাস আর ভয় সেখানে বাসা বেঁধেছে।

রঙ্গালয়ের প্রথম রজনী আর শিল্প-প্রদর্শনীর আলাপ আজকাল বাধা পায়, কেউ হয়তো উৎসাহেই চেঁচিয়ে ওঠে :

'জানো, রোজের প্রায় দুই পাঁইট আলাদা তেল পেয়েছে !...'

জার্মানরাও মার্জিত রুচির পরিচয় দিতে চেষ্টা করছে, মহিলা দেখে আসন ছেড়ে দিচ্ছে মেট্রোতে, সঙ্গে সঙ্গে বলছে। 'সিল ভ্যু প্লে' ক্ষমা করবেন'—এমনি সব কথা। গ্রেফ্‌তার চলছে শুধু রাতে ; রাতে মানুষ মোটরের ভেঁপুর জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে উৎকর্ণ হয়ে আছে সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দের জন্য।

যে সব লেখকদের বই এখনো দোকানের শো-কেসে কেসে সাজানো তারা ফরাসী-নারীদের জার্মানদের উপপত্নী হবার বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করছেন। বইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বেশ্যারা তাঁদের বই দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কোথাও, অন্তরালে সাহসীরা জড়ো হচ্ছে, বাড়ীতে তৈরী রোটারীতে ছাপছে ছোট ছোট ইশতেহার। সংগ্রামের আহ্বান জানাচ্ছে ইশতেহার, বীরত্বের উদ্দীপনা জাগাচ্ছে আর আছে আত্মোৎসর্গের আবেদন। কিন্তু তারা তো সংখ্যায় কম। তাদের এই সহৃদয় আহ্বান ডুবে যাচ্ছে কানাকানি ফিসফিসানি, হাসি আর গর্বিত পদক্ষেপে। মানুষ পরস্পরকে ঘৃণা করছে নিজের প্রতি ঘৃণা কুঁড়ে খাচ্ছে প্যারীর বুকখানা—এ তো বুভুক্ষার চাইতেও ভয়ংকর।

ল্যাঁসিয়ে শেষে ঠিক করলেন লিওকে অংশীদারী চুক্তিটা ভাঙতে বলবেন। বাটি রোস-আইনেকে বাঁচিয়েছে। যদি আগের দিনকাল থাকত ল্যাঁসিয়ে তার অংশীদারের ক্ষতি-পূরণ করতেন। কিন্তু এখন তো তা হয় না—যা সময় পড়েছে...। ল্যাঁসিয়ে মনে মনে ভাবলেন, আমার নিজের উপরই ঘৃণা হচ্ছে কিন্তু উপায় কি...। লিওর জন্য কেন মাদোকে বঞ্চিত করব ?...

ল্যাঁসিয়ে বহুদিন বন্ধুর ওখানে যান নি। লিও নিশ্চয়ই রাতের আঁধারের চেয়েও গম্ভীর...এ যেন প্রেতকৃত্যে চলেছেন তিনি...কিন্তু লিও খুশি মনেই তাকে স্বাগত জানালেন ;

'আরে, আরে, তোমার যে টাক পড়েছে দেখছি! তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে জানো ? একেবারে আস্ত রোমের সেই পুরনো যুগের সিনেটের সভ্যটি!'

লিওভাইন রোগা হয়ে গেছে, ম্লান দেখাচ্ছে তাকে; শিশুর মৃত্যুর ধকল সে

এখনো সামলে উঠতে পারেনি। কিন্তু লিও নিরাশ হননি—মন মরাও তিনি নন। সব সময়েই তিনি একটা না একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কখনো বা তিনি সরু করাত দিয়ে কাঠ কেটে নানা নক্‌সা তৈরী করছেন, কখনো বা গাছে জল ঢালছেন, শিস দিচ্ছেন। লাঁসিয়ে আসল কথাটা চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়লেন—জার্মানদের এই উন্মাদ শাসনব্যবস্থা হোলো তার উপজীব্য। বন্ধুত্বের একটা দাবী আছে…কিন্তু মানুষকে বাঁচতে হবে তো…মাদোর কথা লিও বাধা দিলেন :

'মরিস, ওসব কথা রাখ আমি ছেলেমানুষ নই। আমি কিছুই আর আশা করি না…আমার আর কোনো দাবী নেই…'

লাঁসিয়ে খুব খুশি—যাক বিপদটা কেটে গেছে। এখন তো তার সুমুখে পুরানো বন্ধু, তারা এখন খোলাখুলিই আলাপ করতে পারবেন। লিও যুদ্ধ সম্বন্ধে কি ভাবে তাও জানা যাবে। তিনি তা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তা ছাড়', ধরেই না হয় নেওয়া যাক জার্মানরা ইংরেজদের থেকে ভালো—কিন্তু তারাও হয়তো তাড়া খেয়ে সরে পড়বে। এ কথা ভাবতেও মনটা খুশিতে ভরে ওঠে…যাক ঐ বাজে রাজনীতি এখন থাক! যথেষ্ট হয়েছে! বার্টি তো মাদোর প্রতি অনুরক্ত। মানুষটার মন না যেন সোনা, কিন্তু মেয়েটা কেমন উদাসীন—আদুরে মেয়ের খেয়াল আর কি!…দ্যুমা আপোষ করতে রাজী নন, সব কিছুই তার নীতির ব্যাপার, ওর সঙ্গ আজকাল বিরক্তিই জাগায়… নিভেল তেমনি আছে, নতুন একখানা বই বার করেছে। ভারি তামাসার ব্যাপার কিন্তু…কোথায় এখন পড়ছে বোমা—জাহাজ ডুবছে, গ্রীকরা মরছে, কিন্তু পারীতে সব কিছুই আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসছে।…সুদানের ছাগলটার স্বাদ ছিল, কিন্তু মাংস ভারী শক্ত—ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখা হোলো, সেদ্ধও করা হোলো অনেকক্ষণ।

'সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছিল, তুমি এলে না। দ্যুমা অবধি তার কোটর থেকে শুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এলেন…। বল, পরে আসবে।'

'না মরিস, আমি যাব না। আমাকে নিমন্ত্রণ কোরো না। জানি, তুমি বিশ্বাসী বন্ধু, কিন্তু এখন আমরা দুই বিভিন্ন জাতির মানুষ।…শুধু শুধু কেন তোমাকে বিপদে ফেলব? তুমি—আর্য, ওরা তাই তো বলে।…ঠিক আছে। তোমার জন্য আমার আনন্দই হচ্ছে, অন্তত তোমাকে তারা সম্মান দেখিয়েছে।

ওরা তো আমাকে ঘৃণা দিয়ে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু তা পারবে না, আমার স্নায়ু যে ভারি শক্ত। কিন্তু এখন তো সবই ওলট-পালট হয়ে গেছে …

'তুমি কি মনে কর আমারই সুখে দিন কাটছে ?'

'না, তা মনে করি না। জার্মানদের আসার আগে তোমার ছিল অফুরন্ত সুখ। তোমার সেই সুখের খানিকটা গেছে, তুচ্ছ জিনিষগুলো খসে পড়েছে, কিন্তু আমাকে তারা বুট দিয়ে মাড়াচ্ছে…'

লাঁসিয়ে ক্রুদ্ধই হলেন—লিও কি মনে করে তুচ্ছ জিনিষ নিয়েই আমি ব্যস্ত—আমার আগের সুখ কি তাই দিয়েই গড়া ? তা যাই বলো আমি ফরাসী।

'হয়তো তোমাকে অপমান তারা বেশিই করেছে, ওদের ওটা খুশ-খেয়াল। …কিন্তু ব্যক্তিগত অপমানের কথা আমি বলছি না। আমি ফরাসী। বুঝতে পারছ ? ফ্রান্স যদি পৃথিবী থেকে মুছে যায় তুমি কিয়েভ-এ যেতে পারবে, আমেরিকায় যেতে পারবে। আর আমি কোথায় যাব জানি না। কি করব আমি বল—হাঁ আমি নিয়োরের মরিস লাঁসিয়ে ?…'

লিও জোরে হাই তুললেন :

'বাজে কথা রাখো। ওসব আমি জার্মানদের খবরের কাগজ থেকেই জানি। তুমি যে দেখছি ওদের বুলি আওড়াচ্ছ—যাক্ তোমার আশা আছে… এখন বল দেখি, আফ্রিকার ঐ মোষটিকে কি করে গিললে ?'

লাঁসিয়ে ফুঁসে উঠলেন। তিনি এমনই সংযম হারালেন যে, ভদ্রভাবে লিওতাঁইনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াই হোলো না। বেরিয়ে যেতে যেতে মনে মনে ভাবলেন : না, এবাড়ীর উঠোনও আর মাড়াব না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তিনি আবার উপরে উঠে গেলেন—ভাবাবেগের ঘূর্ণি উঠেছে মনে : অনুতাপ, রাগ, বিদ্রোহ আর করুণা মিশে আছে। তিনি লিওকে বললেন,

'ভাবলাম, দস্তানাটা বুঝি ফেলে এসেছি, কিন্তু আমার পকেটেই রয়েছে যে ! আজকাল বড় ভুলো হয়ে পড়েছি·· শোনো, লিও, আমাদের ঝগড়া করা উচিত নয়। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে না যেতে পার, সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু যদি কখনো আমার সাহায্য দরকার হয়, মনে রেখো—তোমার জন্ত কোনো কিছু করতেই আমি পেছপা হব না' …

লিও গলে গেলেন। ল'াসিয়ে চলে যেতে তিনি লিওতাঁইনকে বললেন :

'যদি তেমন কিছু হয়, ল াসিয়ে আমাদের সাহায্য করবে। আমরা হতাশ হব না! কত উপায়ই তো আছে।'

'আমি তো কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছিনা লিও।'

'তা হলে শোনো! ইংরেজরা হঠাৎ রেগে-মেগে হামবুর্গের কোথাও গিয়ে নামতেও পারে। মার্কিনরাও যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। আর রুশদের ব্যাপার কি? ওদের ভুলে গেছ নাকি? ওরা তুচ্ছ নয়, বরং বিশিষ্ট। আমি ওদের দেখেছি—ওরা পাগল' ওরা আত্মসমর্পণ করে সুদানের ছাগল রান্না করতে বসবে না। হিটলারও হঠাৎ মরতে পারে, খুনও হতে পারে। জার্মানদের মধ্যে বুদ্ধিমান কেউ বেরুবে না এমন তো কথা নয়, বা এমনও হতে পারে...'

তিনি কথা শেষ করলেন না। লিওতাঁইন ম্লান হেসে বললেন,

'কি এমন হতে পারে?...'

'কি হতে পারে! একদিন রাতে ঘুমোতে গেলাম, জেগে উঠলাম স্বর্গে। হ্যাঁ, আমরা দুজন, সমুদ্র, জলপাইয়ের বন আর গাং-চিল। আর একটিও মানুষ সেখানে নেই।...শুধু আমরা দুজন ..আমার প্রিয়া, আমার জীবন, আমার স্বর্গ!...'

লিওতাঁইন লিওর বাহুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো, তখনো তেমনি ম্লান হাসি তার ঠোঁটে।

ল'াসিয়ে শান্ত হতে পারলেন না। সব চেয়ে বৈষয়িক ব্যাপারটার কথা-বার্তায়ই তিনি উত্তেজিত হলেন। লিও তো আমোলেই দিল না কথা, উদাসান রইলো। ল'াসিয়ে অপমান বোধ করলেন, লিওকে দোষী করলেন; রাতে মনে হোলো, বুকে অসহ্য জ্বালা বোধ করছেন, মার্সেলিনের এমনি হোত। তিনি মোরিলোকে ভোর হতে না হতেই ফোন করলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করে হাসলেন :

'খাদ্য দুষ্প্রাপ্য, তোমার লিভারের পক্ষে তা ভালোই হয়েছে, আর তোমার বুক তো একেবারে ছোকরাদের মতো।...'

'কিন্তু কাল কি হয়েছিল? আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, ঘুমোতেই পারিনি...'

'ও স্নায়ুর ব্যাপার। পৃথিবী শুদ্ধ ঐ তো রোগ। নিশ্চয়ই কোনো উত্তেজনার কারণ ঘটেছিল।'

'হাঁ তা বটে। আলপের্তের সঙ্গে একটু ঝগড়াই হোলো। একটু উত্তেজিতও হয়ে পড়েছিলাম…। ওর জন্য আমি কত দুঃখিত, তুমি তো জানো…কিন্তু অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তো, কিন্তু সেইখানেই ও নাছোড়বান্দা। আমি ওকে সবই খুলে বললাম। কিন্তু ও প্রমাণ করতে চাইল যে আমার কোনো অনুভূতি নেই। এতে যে কেউ চটে যেতে পারে—তাই না? আমি ভার্দ্যনে ছিলাম না? ও কে যে আমাকে দেশাত্মবোধ শেখাতে আসে? ও তো কালই সরে পডতে পারে…ওদের প্রতিভা আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ওরা সব জায়গায় ছড়িয়েও তো আছে। আর সে কথা ভাবলে…'

মোরিলো হো হো করে হেসে উঠলেন:

'দেখ, দেখ, তোমার শরীরেব কলকবজাই এমনি, যে যে-কোনো বিপদে টি'কে যাবে। তুমি এই তো কিছুক্ষণ আগে হতাশায় মরছিলে, কিন্তু অমনি বাঁচবার উপায় পেয়ে গেলে। 'আর সে কথা ভাবলে' ঐ তো পথ। যাক আমার আবার তাড়া আছে, একজন রোগী প্রত্যাশা করে আছে। বড়ই তার দুর্ভাগ্য যে ঐ পৃথিবীর ব্যথা-রোগে তাকে পায়নি, সে ভুগছে সাধারণ ক্যানসারে।'

## এগারো

বাইরে আর সবার মতোই মাদো। তেমনি জীবনই কাটাচ্ছে। তার বাবা খুঁতখুঁতে মানুষ, তাকে একেবারে আদর্শ গৃহকর্ত্রী তৈরি করবার জন্য তিনি ব্যস্ত। সে কেনা-কাটি করে, মেয়েদের সঙ্গে তুচ্ছ বিপদ-আপদের কথা হয়, অন্যকে সে সাহায্যও করতে চায়। মাঝে মাঝে যায় আলপের্তদের বাড়ি। লিওতাঁইনকে ভুলিয়ে রাখে।

যাদের সে দেখে, কথা বলে যাদের সঙ্গে, তাদের কথা ভাবতে গিয়ে

মাদোর মনে হয়, তার চারদিকে সবাই যেন মরে গেছে। আর কেন যেন সেই মরার দল বিগত জীবনের এক মিলনান্ত প্রহসনে অভিনয় করছে। এর চেয়ে ওরা যদি প্যারী পুড়িয়ে দিত, ভালোই হোত!...হাঁ এই নকল জীবনের চেয়ে মৃত্যুও বুঝি শতগুণে ভালো ছিল! কিন্তু তবু এই নকল জীবনকে আঁকড়ে ধরে আছে মানুষ, তার আর কোনো সম্বল নেই। তারা আঁকড়ে ধরে আছে এক টুকরো চকোলেট, কি এক জোড়া মোজা। মাদো তাই নিজের মনেই প্রশ্ন করে :

ওরাই কি ঠিক করছে? ..হবেও বা ..

সাবাঁকে সে জিজ্ঞেস করলো :

'এখন কি করা যায়?'

সাবা উত্তেজিত, আর সবার মতোই সেও তর্জন-গর্জন করছে, গালাগাল দিচ্ছে, আবার নিজেব কাজ করতে শুরু করেছে। মাদোর প্রশ্নে সে কেমন যেন হয়ে গেল।

'আমাকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই মাদো, আমি বীর নই।... যুদ্ধের আগে লেজ। আমাকে গাল দিত, জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম বলে। আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম, যদি যুদ্ধ হয়, আমি সে যুদ্ধে যোগ দেব...আমি জানিনা।...কিন্তু যদি সত্যিই পথে পথে যুদ্ধ শুরু হোত, আমি ছুটে যেতাম ..কিন্তু যুদ্ধ কোথায়? তবে শিল্প সম্বন্ধে আমার মতামত একটুও বদলাবো না। কিন্তু তাই বলে কে সাধ করে ইটের দেয়ালে গিয়ে মাথা ঠুকে মরে?...না, তা আমি করব না।'

মাদো ভাবলো, ও আর সবারই মতো।...ও ছবি আঁকছে, আর কেউ কাজে ফিরে গেছে, কেউ বা য়িহুদীদের দোকান দখল করে খুশি। সাবা লেজাঁর কথা বললো। মাদোও বহুবার তার কথা ভেবেছে, ভেবেছে জোসেতের কথা, আর অন্ধকার পথে সেই শ্রমিক ছেলেটির কথা। ওরা কি করছে এখন? ওরা বশ্যতা স্বীকার করেনি, হাঁ, একথা নিশ্চিত বলা যায়। ওদের আছে বিশ্বাস, ওরা লড়ছে...। জোসেতকে পাওয়া গেল না—সে চলে গেছে, হয়তো অন্য নামে কোথাও লুকিয়ে আছে...

একদিন মাদো গেল ডাঃ মোরিলোর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বেশ উত্তেজিত, বার বার ঘড়ী দেখছেন। সে ভাবলে তার বুঝি রোগী দেখতে

বেরুবার তাড়া আছে। না, তাতো নয়। হঠাৎ তিনি রেডিয়োর কাছে দৌড়ে গেলেন, ফিসফিসিয়ে চুপ করতে বললেন তাকে। একটা ধাক্কার শব্দ, কেউ যেন দরজায়। এবার ঘোষক জানালেন, আস্‌মারা দখল করা হয়েছে। মোরিলো অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, ঠিক, ঠিক হয়েছে।' মাদো জানে না, আস্‌মারা কোথায়, ঘোষক আবো জানালেন সত্যিকারের ফরাসী যারা তারা ইংরেজদের সঙ্গে মিলে লড়াই চালাচ্ছে। মাদো ভাবলো, ঘোষক লুইর কথাই বলছে, কিন্তু লুই তো বহুদূরে—যেমন দূরে ঐ আসমারা আর জোসেৎ ·· রেডিয়ো থামতে মাদো মোরিলোকে জিজ্ঞেস করলো :

'আপনার কি বিশ্বাস হয়, জার্মানদের তাড়িয়ে দেওয়া যাবে ?'

'জানিনা···যাই হোক, ফরাসীরা ওদের তাড়াতে পারবে না। আমরা এক সময়ে ছিলাম এক মহান রাষ্ট্র আজ জার্মানদের আক্রমণের কেন্দ্রভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়, এইখানেই হয়তো যুদ্ধের আর এক রঙ্গভূমি তৈরি হবে···'

তাহলে মোরিলোর নিজেরও কিছুতেই আর আস্থা নেই। ··

সেই রাতেই লা হাসিয়ে মাদোকে বললেন :

আমি বুঝতে পারি না রুশরা কি করে আমাদের এই অপমান উপভোগ করছে···'

'তুমি কি করে জানলে ?

তার বাবা জার্মানদের হয়ে কাজ করছেন এতে তার বিরক্তি ধরে গেছে। তাই তিনি চান সমস্ত পৃথিবীই এমনি হীনতায় ভরে উঠুক—তাতে তিনি শান্তিই পাবেন···সার্জি কি ভাবছে এখন ? সে তো জানে না, কখনো জানতেও পারবে না।

মাদোর জীবন ফাকা, ফাপা হয়ে গেছে। শুধু একজন তার উপর নজর রেখেছে, সে তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই জন্য যেন তার বেঁচে থাকা—সে বার্টি, অথচ এই বার্টিই ছিল উত্তেজনা আর সহানুভূতি-হীন মানুষ।

বসন্তের প্রথম দিকের সন্ধ্যা। বাদাম গাছগুলি জার্মানদের তোয়াক্কা রাখে না—তাই তারা তাদের সাদা মোমের মতো ফুলের ঝাড় তুলে ধরেছে

আকাশে। মাদো আর বার্টি ঘুরছিল পথে, মাদো আপন মনে ভাবছিল—এও তো এক কৃত্রিমতা-ভান···আর বার্টি বলছিল,

'তুমি কি কল্পনা করতে পার মাদো, চল্লিশ বছরের একজন মানুষের হৃদয়, যে কারখানা, ধাতু, চুক্তি আর শেয়ার নিয়ে জীবন এতদিন কাটিয়েছে? একটা মরুভূমিও বুঝি তার চাইতে অনেক উবর। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই মাদো, আশ্চয ব্যাপার সত্যিই ঘটে। আমি ও ভাবনা দূর করে দিতে চেয়েছি, লড়াই করেছি এরই বিরুদ্ধে, ৮ বছর ধরে নিজেকে পরীক্ষা করেছি! এখন তো আমি জানি—ঠিক জানি—তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। বেশি দিন আগের কথা নয়, তুমি বলেছিলে আমার বন্ধুত্বের অনেকখানি মূল্যই তুমি দাও। মাদো, বন্ধুত্ব নয়, এ এক উন্মাদনা···কেন আমি তাকে লুকিয়ে রাখব? আমি স্কুলের ছেলে নই, হাস্যাস্পদ হব, তার জন্যে আমি ভয় পাই না। তোমাকে আমার স্ত্রী হতে হবে মাদো।'

সে চমকে গেল—এতই অপ্রত্যাশিত এ প্রস্তাব, আর বার্টির স্বরে যেন কি এক দুর্নিবার শক্তি।

'কিন্তু সে তো অসম্ভব···' ভাষা খুঁজে পেল না মাদো, 'তুমি আমাকে ভুলোনা, কিন্তু এ তো অসম্ভব···তোমার এই ভালোবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তুমি আমার বাবার জন্য এতো করেছ, আমার দুঃখিনী মার জন্যেও। আমি কখনো ভাবিনি···না, না, এ অসম্ভব···'

'কেন?'

'তুমি জানোনা আমার কি হয়েছে···'

'তুমি আঘাত পেয়েছ···'

'না, আমি মরে গেছি'।

'তোমাকে আমি জীবন দেব, তুমি হবে আমার স্ত্রী।'

'কিন্তু সে তো অসম্ভব···তোমাকে তো আমি ভালোবাসি না।'

'আমি তা জানি, কিন্তু এও জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসবে। আমার স্ত্রী তোমাকে হতেই হবে।'

সে আর সহ্য করতে পারলো না, পালিয়ে গেল। পরের দিন আবার বার্টিকে তার পাশে দেখা গেল, তেমনি সংযত স্বরে, প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা ভরা স্বরে সে আবার বলে গেল 'তুমি আমার—' তারপরের দিনও ঐ একই

কথা। প্রতিদিন চললো এমনি। সে দীর্ঘ চিঠি লিখলো তাকে, তাতে কঠিন কঠোর যুক্তি ভরা, কখনো বা লিখলো ছোট্ট চিরকুট—উন্মাদনায় তাও শেষ করতে পারেনি। সে অনুনয়-বিনয় করলো, পেড়াপীড়ি করলো, দাবী জানালো। সে ফোন করলো, দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো, মাদোর ঘর ভরে দিলে সুগন্ধি ফুলে, চিঠি আর প্রেমের কুজনে গুঞ্জনে। দিন আর রাত মাদো শুনলো: 'তোমাকে আমার স্ত্রী হতেই হবে—' কামনায় সে উন্মাদ, কিন্তু মাদো? তার কামনা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, আর এই পেড়াপীড়ি কি দিয়ে সে বাধা দেবে? তার তো আছে মূক হতাশা, ব্যথা, তাও বুঝি ভোঁতা, আর আছে উদাসীনতা।

পাঁসিয়ে তাই বিচলিত হলেন, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন:

'তাইত, কিছু ভালো শাম্পেন তো জোগাড় করতে হবে—এমন একটা ব্যাপারে সমারোহ তো দরকার। একটা গোটা কেসই তার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম, কি জানি নিজেই আবার কখন খেয়ে ফেলি। আমার কেমন যেন আগেই মনে হয়েছিল…'

মাদো ঠিক করলো, রাজিই সে হবে। অভিনন্দন এল নানাদিক থেকে। যারা তাকে ভালোবাসে, তারা মসিয়ে বার্টির বুদ্ধি, সুচেহারা আর প্রতিভার কথা বললেন, যাদের ঈর্ষা হোলো, তারা এই কথাটার উপর জোর দিলে: 'প্রেমের দেবতা আজকাল সোনার তীর দিয়েই বেধেন দেখছি।' সে সবার সঙ্গে হেসে কথা কইলে, সবাইকে ধন্যবাদ জানালো। লাঁসিয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন:

'আহা, ওর মা আজ বেঁচে নেই, দেখতে পেলেন না…এখন আমি বলতে পারি: যখন ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম, ওই আমাকে বাঁচায়। আমাদের পরিবারের জন্য ও যথেষ্টই করেছে—তাছাড়া—ও খাঁটি ফরাসী। ওকে জার্মানদের সঙ্গে কথা বলতেও শুনেছি—সবাই যদি অমনি মর্যাদা বাঁচিয়ে চলতো…'

নিভেল মাদোকে উপহার দিল নিজের কবিতার বই, তাতে লেখা—

যদি মরতে পার, মর,
তাকিয়ো না, কেঁদো না, কথাও কোয়ো না।

মাদো ভাবলে, 'আমাকে ও ঠাট্টা করেছে, ঠিকই করেছে। কিন্তু ও তো

অমনি—ও পাসে'ফোনকে নিয়ে কবিতা লিখছে—কিন্তু কাজ করছে পুলিশ-দপ্তরে—জার্মানদের হয়ে—ও আমাকে বিচার করবার কে ?...'

তাকে এই অবসাদ থেকে জাগালো সাবাঁ !

'আমি তোমার কাছে সব কিছুই আশা করেছিলাম। তুমি বিষ খেতে পারতে, শ্যামের রাজাকে বিয়ে করতে পারতে—নয় তো মাদ্রিদের কোথাও মরতেও পারতে। কিন্তু মাদাম বাটি হওয়া—সত্যিই ব্যাপারটা এমন কিছু নয় যে এত জাঁক করা যায় ..'

সে মুখ ঢাকলো, যেন ও তাকে আঘাতই করেছে। হ্যাঁ, এও তাকে সহ্য করতে হবে...জানি আমি কি করেছি। বিয়ের পোশাক সে পরলো বাধ্য মেয়েটির মতো, তারপরে নিজের মনকে উত্তর দিলে : সবই আমাকে করতে হবে...আমি করব। যখন তারা বাটির বিরাট শূন্য বাড়িতে এসে পৌঁছলো, মাদো তলিয়ে গেল বিস্মৃতিতে। শুধু বেঁচে রইলো তার ইচ্ছাশক্তি—সে চেঁচিয়ে উঠবে না, নিজেকে সে প্রকাশ করবে না।

ভোর হোলো। বাটির দিকে সে তাকালো, সে এখনো ঘুমিয়ে আছে, তার লম্বাটে মুখ বালিসের ফ্রেমে যেন আঁটা—পুরানো ছবির কথাই মনে করিয়ে দেয়। ফোলা গাল, কালো চুল, রোমক নাসিকা, বিবর্ণ পাতলা ঠোঁট। তার রাগ হোলো না, বিতৃষ্ণা জেগে উঠলো না ; তার মাথা ঘুরছে—যেন পারীর সমস্ত আবর্জনা—জার্মানদের সঙ্গে রাত্রিবাস, বিজেতাদের কামুক হাসি, গেস্টাপোর দল, খোসবাইয়ের গন্ধ গায়ে, যৌন ব্যাধির চিকিৎসালয়ে মানুষের সার, মুনাফাখোর অভিজাত রেস্তোরায় বসে উদ্গার দিচ্ছে, গরীবদের সস্প্যানে বেড়ালের মাংসের হাড়, নৃত্যশালার স্বেদধারা, সেখানে ঝঞ্ঝাবাহিনীর কর্মচারীরা ব্যবসায়ীদের মেয়েদের সঙ্গে নাচছে, সিগারেটের টুকরোয় ঠোঁটের ভিজে স্পর্শ লেগে আছে, চোরা বাজারের দুর্গন্ধ—হাঁ এই সমস্ত আবর্জনা, নগরের সমস্ত দুর্গন্ধ যেন এই পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ঘর ভরে দিল। আমি যেন অমনি—ঐ আবর্জনা...আজ কোন তারিখ ? বারো...এক বছর আগে পারীর পতন হয়েছিল। আমারই বা অত গর্ব কিসের—ও ও যা আর একজনও তাই—সবই আমার কাছে সমান।...তবু ভালো একজন জার্মানের সঙ্গে হয়নি...

মাদো জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো, প্রশস্ত পথের দিকে জানালাটা।

সবে ভোর হয়েছে, প্রহরের প্রশান্তি তাই মানুষের উপস্থিতিতে নষ্ট হয়ে যায় নি। পাখীরা ডাকছে গাছে গাছে, সবচেয়ে উপরের তলার জানালা সূর্যের আভায় পাহাড়ের বরফে চাঙড়ের মতো লালাভ। কেন এখন মাদোর মনে পড়লো সার্জিব কথা; ওর কথা তো সে বহুদিন ভাবে নি? তাদের শেষ বিদায়ের মুহূর্ত ভেসে উঠলো স্মৃতিতে—তারা ভালোবাসার কথা বলেছিল, সে বাঁচাতে পারে, নতুন জীবন দিতে পারে। কেন—এ কথা মনে পড়লো মাদোর? এ অনুভূতি এত গভীর যে সারা রাত নিঃশব্দে সহ্য করেছে, কিন্তু আর তো পারছে না। সে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠলো।

বার্টি জাগলো না, আর জাগলেও মাদোর কাছ থেকে একটা কথাও সে বার করতে পারত না। ভোরের নির্মলতায় নিঃশ্বাস নিয়ে সে সার্জিব উদ্দেশ্যে জানালো, সে ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করবে এই প্রতিশ্রুতিই দিল, আর আহ্বান জানালো প্রেমকে, প্রেম তাকে করবে সাহায্য। হয় তো এ আহ্বান বিলম্বিত, কিন্তু উদগ্র কঠোর এ আহ্বান, তাই সে তো এখন বীরত্ব আর আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত।

সে যেন বল পেল, দৃঢ়তায় ভরে গেল, কিন্তু সে তো কয়েক ঘণ্টার জন্য, পরদিন এল হতাশা, আবার আসন্ন সর্বনাশের ভাবনা ফিরে এল। সে বার্টিকে বললো:

'তুমি বুঝতেই পারছ, আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারি না...'

তার স্বরে দুর্বলতা প্রকাশ পেল। বার্টি শান্তভাবে বললে,

'তোমার কাছে আমার কোনো দাবা নেই। তুমি তোমার নিজের খুশি মতো এখানে জীবন কাটাতে পার। সত্যিই কি করবেইয়ের জন্য তোমার দুঃখ হচ্ছে? ..

যেন আগে থেকে ভেবেই রেখেছিলেন, এই সময়ে তিনি ঢুকবেন ঠিক তেমনি ভাবেই লাফিয়ে ঢুকে পড়লেন। তার মুখে আনন্দের দীপ্তি।

'মাদো, আমার যে আজ তোমাকে সুখী দেখে কত আনন্দ, কি বলব। .. নিভেলের একটা নতুন বই বেরিয়েছে, তাই একটু সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেছি। তুমি নিশ্চয়ই আসবে। ঠিক যুদ্ধের আগের মতোই ভোজের আয়োজন করতে চেষ্টা করব।...'

মাদো ভাবলো, 'তাইত, করবেইয়েই বা এর থেকে সরেশ কিসে? ..'

নব দম্পতি পাশাপাশি বাস করতে লাগলো, কিন্তু তারা যেন অপরিচিত। মাদোকে দেখে মনে হোলো সে শান্ত, এমন কি উদাসীনও বটে. বার্টির কিন্তু নিজেকে সংযত রাখা শক্ত হয়েই উঠলো। ছিটেফোঁটা ভালোবাসার জন্য সে যা কিছু করতে প্রস্তুত। প্রথমে সে ভেবেছিল, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে, সব কিছু মন্থন করে দেবে কিন্তু এবার সে বুঝলো. মাদোর মন সে জয় করতে পারবে না। এই প্রতিদানহীন প্রেম তাকে পাগল করে দিল, সে জ্ঞান হারিয়েই ফেললো।

মাদো প্রায়ই বেরুতে লাগলো। বার্টির ঈর্ষা হোলো. নানা সন্দেহে সে মাথা ঘামালে। কিন্তু মাদো কারো কাছে ছুটলো না. সে ঘুরে বেড়ালো শহরতলির নির্জনতায়। উপসাগর থেকে হাওয়া এসে তাকে চাঙা করে তুললো, যেন নতুন জীবন বয়ে নিয়ে এল সে। সাগরের ঝড়ের অস্তিত্বের ক্ষীণ স্বর এই হাওয়া। মাদো হাওয়ার মুখে এগিয়ে গেল. তার বেদনাতুর সুন্দর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো। সে বুঝতে পারলো না. এ তার আরোগ্যের প্রাথমিক আভাস, না মৃত্যুর যন্ত্রণা।

## বারো

কর্পোরাল কেলার দিজোঁর পানশালায় সুপরিচিত। সে ফরাসী ভালোই বলে, আর সব জার্মানদের মতো 'ব' আর 'প'-এর উচ্চারণে গোলমাল করে ফেলে না। তা ছাড়া মদ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ—পুরোনো বার্গাণ্ডি আর বাজে আলজিরিয়ার মদের তফাৎ কি বলে দিতে পারে। তার দেশের সাঙাৎরা তাতে তার উপর ভারি খুশি। কেলার আরো একটা কারণে নাম কিনেছে, সে পানশালার পরিচারিকা মিমির মন কেড়ে নিয়েছে। মিমি তো খোলাখুলিই বলে, তার জার্মানকে সে কারো সঙ্গে বদল করতে রাজি নয়। এই পল্টনটি গ্রীষ্ম থেকে এখানে আস্তানা গেঁড়েছে, কেলার তো এখন খাঁটি পুরোনো বাসিন্দে বনে গেছে।

তিন বছর আগে যদি কেউ হাইডেলবুর্গের এই নম্র-স্বভাব প্রাইভেটকে

বলতো সে একজন সাহসী সেনা হবে, পানশালায় চলবে তার অবাধ গতিবিধি, এক উচ্ছৃঙ্খল ফরাসী মেয়ের সে হবে প্রেমিক, সে নিজেই বোধহয় বিশ্বাস করত না। অতীতে যখনই সে যুদ্ধের কথা ভেবেছে, তখনই তার নিষ্ঠুরতা আর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কথাই তার মনে পড়েছে। সত্যিই কি নিষ্ঠুর! ছাত্র বয়সে রেমার্কের উপন্যাস পড়ে তার মনে হয়েছিল, মানুষ বিস্ফূর্ত গোলাগুলির ভিতরে বাঁচতে পারে না, তার বিশ্বাস ছিল, তারই মতো সবাই এ কথা উপলব্ধি করেছে। তাই তার সুমুখে কেউ যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা বললে সে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। শীগগিরই যুদ্ধ আসবে—এতো বাজে কথা, রাজনৈতিক কূটচাল ছাড়া আর কি ··

কিন্তু সে কিছু ভাববারও সময় পেল না, তার আগেই তাকে পাঠানো হোলো বেলজিয়ামে। সে আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহ আবির্ভাবের দিকে তখন তাকিয়ে, কবে আসবে যুদ্ধ? নিজের ভীরুতাও তখন তাকে লজ্জা দিচ্ছে। সাথীদের সঙ্গে আলাপে কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বরং সে বড়াই করেই বললো, 'একে কি যুদ্ধ বল?'···কিন্তু পল্টনের কামানের দূরাগত শব্দ তাকে জানিয়ে দিলে যুদ্ধ হচ্ছে, তার মনে হোল, সে বমি করে ফেলবে। প্রথম দিকের সংঘর্ষে তার পল্টন যোগ দিলে না, সীমান্ত যখন ভেদ করা হয়েছে, তখন তারা এগোতে লাগলো। অফিসাররা বললেন, তাদের এ এক সখের ভ্রমণ, তাদের সুমুখে শাম্পেনের সুরার কুঠরীগুলি—তারই ভিতর দিয়ে তারা চলে যাবে। কিন্তু হঠাৎ এপারনের কাছে তারা বাধা পেল—জন পঞ্চাশেক ফরাসী বন দখল করে বসেছিল। কেলার যে মোটর ট্রাকে যাচ্ছিল, তারই উপর গুলি চললো, তার দু জন সাথী মারা গেল, চারজন হোলো আহত। কেলার স্তব্ধ হয়ে গেল ভয়ে, সে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে না পড়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কেন যেন চশমা মুছতে শুরু করলো। শুধু অফিসারের হুকুম পেয়েই সে আত্মস্থ হোলো, শুয়ে পড়ে চালাল গুলী।

হাঁ—অন্য সবার মতোই চালালো গুলী। এক ঘণ্টা পরে শত্রুকে তারা বন থেকে তাড়িয়ে দিলে। কেলার যখন দেখলে, দশ-বারোজন ফরাসী হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সে খুশিতে উপচে পড়লো। সে যে বেঁচে আছে, এ কথা তার মনে হোলো। ফিরে-পাওয়া জীবন তো আগের জীবনের চেয়ে ঢের বেশি মধুর। সে রাত্রে তার চিরাচরিত অভ্যাসের বদল হোলো, একটা

মদের ঠাণ্ডা কুঠরিতে সে মদ খেয়ে মাতাল হোলো। তারপর ঘুমোলো একটি মেয়ের সঙ্গে। গার্ডার কথা ভেবে ভোরে সে বিবেক দংশন অনুভব করলো না: যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ, দিনের বেলা তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করছ, আর রাতে করছ স্ফূর্তি। এই তো নিয়ম!

যুদ্ধ শীগিগরই শেষ হোলো কিন্তু সুসময় রয়েই গেল। আর টিঁকে রইলো কেলারের নতুন-পাওয়া আত্মপ্রত্যয়। যখন শীতকালে সে বাড়ি ফিরে এল, গার্ডা তাকে চিনতেই পারলো না। বললে ঠাট্টাই মনে হবে—সত্যিই বত্রিশ বছর বয়েসে জোহান যেন পুরুষের মতো পুরুষ হয়ে উঠেছে! বেশ জোরেই সে কথা বলে, মদও টানে বেশ! গার্ডা যখন বললে একবার গীর্জের পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করতে, কেলার খেঁকিয়েই উঠলো—'তোমাকে তা নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না।' গার্ডা দুঃখই পেল, আবার খুশিও হোলো। সে এই জোহানকে আগেকার জোহানের থেকে বেশি পছন্দ করে; রাতে কেলার তাকে চুমু খেল, ভালোবাসার পীড়নও বাদ গেল না, গার্ডার মনে পড়লো ফলি-বার্জারের ফরাসী বিলাসিনীদের। সে কুমারী জীবনে বিমূঢ় হয়ে যেমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতো, তেমনি দীর্ঘনিঃশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। জোহান তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কিন্তু ভৎর্সনা করা তো বোকামি—এখন যে যুদ্ধ চলছে।...

যখন সে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো সীমান্তে মানুষ ভয় পায় কিনা, কেলার উত্তর দিলে:

'হাঁ পায় বই কি! তবে উন্মাদনাও আছে। মানুষের ছেলেবেলার কিছু না কিছু থেকেই যায়, এও তো এক খেলা—বড় নিষ্ঠুর খেলা—তবে তার রোমাঞ্চও খানিকটা আছে বই কি।'

কেলার জানে বহু জিনিষ বই পড়ে তার শেখা, বই সামনে রেখেই সে বিচার করতে বসে। একথা সত্যি যে প্রকৃত যুদ্ধে সে যোগ দেয় নি, কিন্তু তবু সে লড়াই করেছে, তার পল্টনের ছ'জন মানুষ হত হয়েছে। সীমান্তের সৈনিক হিসেবে যুদ্ধের কথা বলবার তার অধিকার আছে। সন্দেহ নেই যে সবাই তারা ভীত, কিন্তু গুরু ভোজের আগে ক্ষিদে বাড়াবার মদের মাত্রার-মতোই সে ভয়। বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণাই সে জোগায়, জীবনকে চাঙা করে তোলে। এর থেকে বেশি ভয় সে পেত—যখন সে বাড়ীতে চটি পরে

বসে থাকতো গেস্টাপোর প্রতীক্ষায়—যুদ্ধে এমন কিছু আছে যা মানুষের মনে নাড়া দেয়, মানুষের সায় পায়। লেখকরা তা বোঝে না, তাই তারা মানবতার তর্ক তোলে, চোখের জল ফেলে। কিন্তু হিটলার সেকথা বুঝেছেন। এইটেই কি তার সাফল্যের কারণ নয়? তিনি আমাদের একত্র করেছেন, আমাদের সামরিক প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছেন, তারপর নামিয়েছেন এই সংঘর্ষে —এখন আমরা এক দায়ীত্বের সূত্রে বাধা পড়েছি—এ দায়িত্ব সবার। আমি কি নাৎসী?…আমি জানি ওরা কি ভাবে নৃতত্বকে বিকৃত করেছে…। কিন্তু তবু এখন আমি হিটলারের পক্ষে—আমরা লণ্ডন দখল করব, তা না হলে যে পারীর জন্য আমাদের খেসারৎ দিতে হবে।…

দিজোঁয় ফিরে মিমিকে আরো ভালো লাগলো তার। মিমি বললে,—

'জান, কেন আমি তোমাকে ভালবাসি? তুমি একটা জানোয়ার, হাঁ, হাঁ, তর্ক কোরো না—তুমি একটা জানোয়ার। তুমি কলেজে পড়াতে পার—কিন্তু তুমি ঠিকই একটা আস্ত জানোয়ার। ফরাসীরা পীরিতের কথা খুব বলে, কিন্তু মাথা তাদের ঠাণ্ডা, কখনো জ্ঞান হারায় না। তারা সব সময়েই হাসে·· আর তুমি—চশমা খুলে ফেললে তুমি তো একটা আস্ত ষাঁড়…'

মেয়েটাকে সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ সে কেঁদে ওঠে, নিজেকে গালাগাল দেয়, ওকে বলে, সে নাকি ভারি সুখী, আর সোহাগের নিবিড়তম মুহূর্তে কানে কানে বলে—'ষাঁড়। ষাঁড় কোথাকার।' ওর কোমল উচ্ছৃঙ্খল চোখের দিকে তাকিয়ে কেলার ভাবে—কি সুন্দর ও, লাবণ্য যেন চুঁইয়ে পড়ছে, আবার কত অশ্লীল।…

সে তার পরিবারকে তবু ভোলে নি। তাদের একদিন অন্তরই চকোলেট, সসেজ আর সাবান পাঠাচ্ছে। গার্ডাকে চিঠি লেখাও বাদ পড়ে নি—প্রতি চিঠির শেষে 'হাজারটা চুমু'ও থাকে।

ফ্রান্সকে পছন্দ হয়েছে তার, তার পাহাড় আর আঙুরের ক্ষেত, গোথিক গীর্জা, সরু উঁচু পথ, পথের আবার সিঁড়ি, বন্ধ জানালা বাড়িগুলো, কালো পোশাক-পরা মেয়ে, ধ্বনি-ময় কথা, ঠিকমতো তার প্রকাশ আর আনন্দ চঞ্চল চোখ—সবই তার পছন্দ। সে যেন একজন ভ্রমণকারী, প্রতিপদে বটুয়া বার করবার অস্বস্তি থেকে রেহাই পেয়েছে। তার ভাষার জ্ঞান জীবনকে এখানে সহজ করে তুলেছে; সে জোর দিয়েই বলে, সে এ দেশকে বোঝে, ভালোবাসে।

যখন কারো চোখে বা স্বরে অসন্তোষের ছায়া বা আমেজ দেখা দেয়, সে বন্ধুভাবেই বলে, 'আমার উপর রাগ করো না। নিজের ইচ্ছায় আমি এখানে আসিনি। যুদ্ধ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার!...' কিন্তু খুব কমই তা ঘটে। কেলার বিশ্বাস করে একটা বিদেশী পল্টনের উপস্থিতি ফরাসীদের কাছে বিরক্তির কারণ হলেও তারা জার্মানদের উপর মোটেই নির্দয় নয়, বরং বন্ধুভাবই বজায় রেখেছে।

মিমিকে সে দু-সপ্তাহ দেখেনি। কেমন একঘেয়ে লাগছিল তার, রাগও হোলো। অবশেষে মিমি এসে দেখা দিল। ওর গায়ে দাগ সে লক্ষ্য করল।

'এ সব কি?'

'পড়ে গিছলাম।'

'মিথ্যে কথা, বাজে ধাপ্পা...'

'বেশ তো, তোমার তো ব্যাপার নয়।'

সে বুঝতে পারলো ঈর্ষা এখানে বোকামি, একটা হৈ চৈ করাও তাই। তা ছাড়া মেজাজটাও তার এখন শরিফই আছে। চুমু খেয়ে সে তৃপ্ত হোলো, সে বলতে চাইল অনর্গল কথা—নিজের ভাবনাকে মুখর করে তুলতে চাইল। কিন্তু মিমি তো তেমন আলাপী নয়...। কিন্তু সে তো তার পাশে আছে। তার বন্ধু কেউ নেই, সঙ্গীরা ঘুমুচ্ছে, কেউ বা মদ খাচ্ছে, কেউ বা তারই মত মেয়ে নিয়ে ফুর্তি লুটছে।

'তোমাকে আমার বড় মনে ধরেছে মিমি—তাই টানও আমার খুব—তুমি সত্যিকারের ফরাসী মেয়ে। এ বড় অবাক লাগে, যুদ্ধ আমাদের সবাইকে এমনি করে কাছে টেনে আনলো। আমাদের দলে চমৎকার সব লোক, ওদের কিন্তু ফ্রান্স সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, কিন্তু এখন ওরা বলে, 'ফরাসীরা ভালো লোক, ভালো করে বাঁচতে জানে'—হাঁ, বিবাদ অবিশ্যি আছেই, তাতো হবেই, আমরা যে বিনা নিমন্ত্রণের অতিথি...কিন্তু মনে হয়, ফরাসীরা আমাদের বুঝতে শিখেছে, এমন কি আমাদের ভালোও লাগছে। তুমি তো সব রকম মানুষের সঙ্গে মেশো, আমাদের কথা ওরা কি বলে জানতে ভারি ইচ্ছে হয়।'

মিমি জোরে হেসে উঠলো:

'ওরা আমাকে যা বেধড়ক মেরেছিল, কোনোরকমে শরীরটা টেনে-হিঁচড়ে বাড়ী ফিরেছি।'

'কারা ?'

'কারা জানি না—তবে তারা ফরাসী।'

'ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না—কেন মারলো ?'

'আমি কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝেছি···তোমাকে আমি ভালোবাসি, আর ব্যাপারটা কেলেঙ্কারীর একশেস—যখন তোমরা যাবে, দেখো, ঠিক ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে···'

কেলার মনে মনে ভাবলো. ওরা বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কি হবে। ওরা তোমার সুমুখে হাসবে, কিন্তু পেছনে···গার্ডা ঠিকই বলেছে—আমি বড় বোকা।

সে একটা কাফেতে ঢুকে পড়লো। এখানে আগে কখনো সে আসে নি, বার-এ গিয়ে মস্ত এক গেলাস কনিয়াক সে খেল। মনটা বেশ মুষড়ে পড়েছে। মানুষটা সে ধীর, স্থির মেজাজটাও তার তেমনি। এই যে মানসিক উপদ্রব তার মাঝে মাঝে শুরু হয় এতে যেন সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। সে বলতে চায়, বুঝিয়ে দিতে চায় ফ্রান্সকে সে ভালোবাসে, সে ফ্রান্সের গোপন শত্রুদের চায় চিনিয়ে দিতে। কিন্তু কাফেতে এক বুড়ো ছাড়া কাউকেই পেল না যাকে সে বলতে পারে সব কথা। বুড়োর পোশাকে গরীবানা ফুটে বেরুতে পারে, কিন্তু নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা আছে, তার জামার বোতামের ঘরে একটা সম্মানের ফিতেও আঁটা। হয়তো অবসরপ্রাপ্ত কোনো অধ্যাপক বা জমিদার হবে যুদ্ধে যার সর্বস্ব গেছে' !···কেলার মোটাসোটা হোটেলউলীর সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করলো।

'চমৎকার রাত মাদাম. এই তো খাঁটি বসন্তের রাত শুরু হোলো।'

'অবাক হবার তো কিছু নেই মসিঁয়ে, মে মাস তো শেষ হয়ে এল···'

'হয়তো আপনার বন্ধ করবার সময় হয়েছে, আমি আপনাকে আটকে রেখেছি।'

'না, মসিঁয়ে, আপনি আরো একঘণ্টা সময় পাচ্ছেন।'

পেছনের ঘরে চলে গেল হোটেলউলী। বুড়োর মুখে বন্ধুত্বের হাসি। কেলার তার কাছে গিয়ে ভদ্রভাবে বললো :

'আপনার পাশে বসতে পারি কি ?'

বুড়ো নিরুত্তর। কেলার যেন এই ব্যবহারে নিবে গেল ; তার ব্যবহারে

এবার মিমির সঙ্গে কথাবার্তা আর মদের প্রভাব দেখা দিল। সে পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়লো।

তুমি তাহলে কথা বলতে চাও না— ?'

বুড়োর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় নি, কিন্তু এখনো সে নিরুত্তর।

'তোমার এই ভণ্ডামি ছাড়বে কিনা বল ! তোমাকে কথা বলতেই হবে… হাসলে কি হবে। ভাড়ন তো এখন পুরানো ইতিহাস। তোমাদের জাঁদরেল জেনারেলদের আমি আত্মসমর্পণ করতে দেখেছি। তুমি ভাবছ, চুপ করে থাকাই তোমার হাতিয়ার—এই দিয়েই আমাকে ঘায়েল করবে? পাজি, শুয়োর কোথাকার।'

'মসিঁয়ে, বুড়ো ভদ্রলোকের উপর চটবেন না, মসিঁয়ে শাঁপিলো কালা আর বোবা, ওকে সবাই চেনে। আপনার উপরওয়ালা ওর বাড়িতেই থাকেন।…

কেলার একটা বিশ্রী শপথ করে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাগে তার শরীর জ্বলছে। ওরা গোল্লায় যাক, ওরা সবাই কালা আর বোবার ভাণ করে!…সে-রাতে সে ঘুমোতে পারলো না, মাথায় যন্ত্রণা। ঐ বিশ্রী হাসিভরা মুখখানা লোকটার, মিমির পিঠের ক্ষত তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো…বিশ্রী !…হাঁ, সব কিছুই বিশ্রী—ফরাসীরা আর তাদের এই লড়াই—সব ! আর আমি—একজন বিজ্ঞানী, যার প্রতিশ্রুতি যথেষ্টই ছিল, সে কিনা হৈ হুল্লোড় করছে…

এক সপ্তাহ পরে কেলার খবর পেল, তাদের পল্টনকে জার্মানীতে পাঠানো হচ্ছে, গার্ডার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনায় সে খুশি হয়ে উঠলো, ছেলেমেয়েদেরও অনেকদিন পরে দেখবে। কিন্তু পরে ভেবে তার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো: এর মানে তো এই, তার কাছে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। এখন আর সম্ভাবনা কি রইলো—সেই এক ঘেয়ে, বর্ণহীন জীবন—গার্ডার রেশনকার্ড নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি, ক্লিশের বইয়ের তথ্য নিয়ে ষড়যন্ত্র—এই-এই তো সব। এক বছর বাদে সবাই একেবারে ভুলে যাবে যে সে ছিল সীমান্তে সৈনিক, তার গল্প শুনে হাসবে। কিন্তু উপায় কি, এই তো জীবন!…

মিমির কাছে বিদায় নিতে হবে, সেও এক দুঃখ। কেলারের কাছে সে তো ফ্রান্সের প্রতীক। পাপিষ্ঠা কিন্তু তবু মোহময়ী। তার মনে হোলো

মিমি কাঁদবে, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলবে। কিন্তু কেলারের চলে যাবার খবর শুনে, সে শান্ত ভাবেই বললো :

'আমার তো মনে হয়, তোমাকে ওরা মিসরে বা আর কোথাও পাঠাবে। তা ছাড়া, তুমি যে মরবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তোমার জন্য আমার দুঃখই হচ্ছে, কিন্তু এ আমার বোকামি। আর কারো জন্য তো দুঃখ হয় না, নিজের জন্যও না। ওরা আমাকে খুন করবে, তা আমি জানি, আর তাইতো আমার পাওনা...'

## তেরো

বার্টি কাজের ভিতরে সান্ত্বনা খুঁজে পেল। মাদো ছাড়াও তার আর এক প্রবল উদ্দীপনা আছে—সে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আগে সে নিজেকে বিংশ শতাব্দীর প্রতীক বলেই অভিহিত করত; এখন সে হেসে বলে, 'আমার শতাব্দী জয়ী হয়েছে। তার মতে বিদেশীরা জেতেনি, নতুন ভাবধারা, জীবনের নতুন মান আর নতুন অভ্যেসের জয় হয়েছে। জার্মানদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে সে দেখে, তারা তারই নিজস্ব ভাবধারা আওড়াচ্ছে; তাদের সঙ্গে একমত হলেও, সে তর্ক জুড়ে দেয়; বিদ্রূপও করে—নিজের স্বাধীনতাই জাহির করতে সে চায়। জার্মানরা বুঝুক, প্রশংসার কথা বলে আমাকে কেনা যায় না। ওদের পক্ষে কারা গেছে? যত সব বাজে লোক, দশটা বোকা আর পাগল, আর গেছে দশহাজার পাজি। তাদের আমাকে দরকার—হাঁ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি জরদগব পেতাঁ নই। আমার ভাবধারা আছে, উচ্চাকাঙ্খা আর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আছে। আমি কখনো জার্মানদের দাস হব না। কিন্তু যদি তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয় আর আমার কথা শুনে চলে, ওদের বন্ধু আমি হতে পারি। এই তো প্রকৃত দেশাত্মবোধ—ফ্রান্সেই শুধু নিজের দাবি নিয়ে টিকে থাকা নয়—নতুন ইয়োরোপে ফ্রান্সের আসন টিঁকিয়ে রাখা—হাঁ, এই আমার আদর্শ।

বার্টির কারখানাগুলো পুরোদমে চললো—জার্মান বাহিনীর জন্য মোটর-

ট্রাক তৈরী হতে লাগলো ; বাটির মনে হোলো—এক মহান কাব্যের সেও অংশীদার—তার ট্রাক ইয়োরোপের পথে পথে চলেছে—ফিয়র্ডময় নরওয়ে থেকে ছুটে চলেছে থার্মপলী অবধি। তারা ছুটে চলেছে আফ্রিকায়—তারা যাবে ইংলণ্ডে। বাটির স্থির বিশ্বাস, জার্মান বাহিনী জিতবে। একদিন মাদো যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো ফ্রান্সের কি হবে—সে উত্তর দিলো: 'পরাজিত বাহিনীর অধিনায়ক হওয়ার চেয়ে বিজয়ী বাহিনীর সাধারণ সৈনিক হওয়াও ভালো…'। একদিন ডাঃ মোরিলো এলেন মাদোর সঙ্গে দেখা করতে ; তিনি বাটির এই নব ন্যায়ের বিজয়ের কথা শুনলেন, তারপর ঠাট্টার ভাণ করে জিজ্ঞেস করলেন :

'আপনার কি ভয় হয় না যে, ইংরেজরা আপনার কারখানাগুলি চুরমার করে দেবে ?'

বাটি হাসলো :

'অসম্ভব…'

মোরিলো উত্তর শুনে এত অবাক হয়ে গেলেন যে, পরে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'শুনছ, বাটির নিশ্চয়ই ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, নইলে এমনি বেপরোয়া ভাব হয় !'

কিন্তু বাটির স্থির বিশ্বাস ইংলণ্ড শীগ্‌গিরই ধ্বংস হয়ে যাবে।

জার্মানদের শ্রদ্ধা সে পেয়েছে, তাদের বাধ্য করেছে শ্রদ্ধা দেখাতে। 'আমার হুকুম ছাড়া একজন জার্মানও আমার অফিসে ঢুকতে সাহস করে না', দখলের প্রথম দিকেই একথা সে বলত। আর কথাটা ঠিকই, জার্মানরা তার কারখানা-গুলিকে ছোটখাটো রাষ্ট্র বলেই মনে করে।

প্রতিপত্তি আছে, এমন যে সব জার্মানদের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, রুডলফ শার্কে তাদের মধ্যে একজন। ইয়োরোপ ব্যুরোর আগেকার মালিক এখন নানা ব্যাপারে লিপ্ত। মুদ্রাযন্ত্র—ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক জীবন, পারী-সমাজের প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর আলাপ-আলোচনা (শার্কে এই আলাপ-আলোচনার নাম দিয়েছে—'ভাবাবেগহীন শিক্ষা') নিয়ে সে মেতে আছে। বাটির কাছে শার্কের যা ভালো লাগে সে তার পারী সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান, তার বহুমুখী আকর্ষণ, সবার ওপরে তার ঔদ্ধত্য। আর সব জার্মানরা প্রায়ই কিছু

বলে না, কোনো কথা দিতে দেরী করে, বার্লিনে হুকুম চেয়ে পাঠায়, কিন্তু শার্কে সে রকম নয়। সে তখন তখনই 'হাঁ' কি 'না' বলে দেয়।

বছরের এক গুমোট দিনে বাটি মাদোকে বললো,

'মসিঁয়ে শার্কে আজ এখানে ডিনারে আসছেন। ব্যাপারটা তোমার কাছে খারাপই লাগবে বুঝতেই পারছি। আমার কাছেও ঠিক তাই। কিন্তু আজকাল অনেক জিনিসই সইতে হচ্ছে...এই জার্মানটার সঙ্গে আমার কাজ-কারবার কিছু নেই, কিন্তু আমি ওকে এই যে বিজয়ী কর্তৃপক্ষ কতগুলি অন্যায় হুকুম জারি করেছে, সেই সম্বন্ধেই জানাতে চাই...'

শার্কে অতি বিনয়ী, বহুবার সে গৃহকর্ত্রীর প্রশংসা করলো, আসবাবপত্র দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো :—'আপনাদের দেখছি একেবারে নর্ডিক পছন্দ'। বাটি শুরু করল জার্মানদের মূর্খতা আর অভদ্রতার কথা। শার্কে মনোযোগ দিয়ে শুনলে, কখনো বা নোটবইয়ে কি টুকে নিলে, তারপর আস্তে আস্তে সে যেন অপরাধী এমনিভাবেই বললে, 'সত্যিই বড় দুঃখের কথা, আমাদের ভিতরে ইতরের অভাব নেই।'

এবার আলাপের মোড় ঘুরলো সাধারণ খাতে। এখন একই প্রশ্ন সবার মনে, 'বলকানে অভিযান সফল হবার পর জার্মান বাহিনী কোথায়, কোনদিকে যাবে?' বাটি লক্ষ্য করলো শার্কে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, সে উত্তেজনা তলিয়ে দিতে চাইলো পুরনো মদে—বাটি অতিথির গেলাস ভরে দিল। শার্কে এবার বললো :

'সামরিক গুপ্ত রহস্য ফাঁস না করেও বলতে পারি, আমাদের শেষ অভিযানের পর্যায়ে এসে আমরা পৌঁছেছি। প্রাচ্যে এবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে ..'

'আমার প্রথম থেকেই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, আপনারা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আজই হোক, কালই হোক—দাঁড়াবেন। কিন্তু এ যুদ্ধ যে ভয়ানক, অতি ভয়ানক হয়ে উঠবে। আমরা এই যুদ্ধে আপনাদের পক্ষে যাব কিনা সেটা আপনাদের উপরই নির্ভর করছে। এক বছর হয়ে গেল, তবু আপনারা আমাদের জাতির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করছেন না। যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে ফরাসীদের ভয় দেখানো বা বোকা বানানো যায়, তাহলে ভুলই করেছেন। সহজ, স্থূল প্রশ্ন হচ্ছে—নতুন ইয়োরোপে ফ্রান্সের স্থান কোথায়?'

হয়তো মদটা এত ভালো বলেই, আর নিজের সংযমের ক্ষমতা সম্বন্ধে শার্কের ধারণা খুব উঁচু অথবা ডিনারে আসবার ঘণ্টাখানেক আগে ফ্র্যারের সিদ্ধান্ত জেনেছিল, তাই সে নিজের প্রকৃতিস্থতা হারিয়ে ফেললো, টেবিল-ন্যাপকিন দিয়ে সে কপাল মুছে বললো :

'নতুন ইয়োরোপে ফ্রান্সের স্থান কোথায়—জিজ্ঞেস করছেন ? আপনাদের একটা ভালো প্রবাদ আছে না,—যেখানে বাঁধা থাকে, সেখানকার ঘাসই ছাগলে খায়।'

মাদো উঠে পড়লো, একটা কথা না বলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। শার্কে তখনি বুঝতে পারলো সে বুদ্ধিমানের মত কথাটা বলে নি। জোর করে বিনয়ের ভাব মুখে এনে সে বাটির অভিযোগের কথায় ফিরে এলো, কথা দিলো এর বিহিত করবে, তাছাড়া এও জানালো আসন্ন যুদ্ধে জার্মানী আর ফ্রান্স হবে মিত্র। বার বার সে একথা বললো : 'অস্ত্রের মৈত্রী-বন্ধনে আমরা বদ্ধ হব।'

তবু এই আলাপ-আলোচনা বাটির মনে বিরক্তির ছাপ রেখে গেল। এ যেন এক বিকৃত স্বাদ, খাবার পরেও তার বিকৃতি থেকে যায়। গুমোট রাত—তার মাথা কামড়াতে লাগলো। সে তার শূন্য বাড়ীর ঘরের পর ঘরে পায়চারী করলো। শেষে মাদোর দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা মারলো। মাদোর সাড়া নেই। সে দরজা ঠেলে খুলে ফেললো। মাদো জানালার কাছে চেয়ারে বসে আছে। সে ডাকলো, কিন্তু উত্তর এল না। সন্তর্পণে সে কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো : 'আমাকে ক্ষমা কর'। তার হাতের উপর চুমু খেতে চাইল। সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফিস ফিস করে বললো :

'আমাকে ছুঁয়ো না…। আমার ভয় হয়, আমি তোমাকে কবে খুন করব।'

# চৌদ্দ

ফ্রান্স ছাড়বার আগে কেলার একবার পারীতে আসার সুযোগ পেল। বহুবার সে আবার পারীতে আসার কথা ভেবেছে—সেই পারী, যুদ্ধের আগে যে ছিল তার কাছে রূপকথার দেশ। তখন গার্ডার আশঙ্কা, ডাঃ কোনিগের পরামর্শ আর ফরাসীদের বেদরদী ব্যবহার তার কাছে বন্ধন হয়ে দেখা দিয়েছিল—কিন্তু এখন তো তা নয়। পারীর পথে পথে একা সে ঘুরে বেড়াচ্ছে—স্বাধীন গর্বিত সে—ভয় তার নেই, আগের সেই বিনতিও নেই। কিন্তু শহর যেন পচে যাচ্ছে, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তবুও এই শহরই তার মনকে টানলো, সে মুগ্ধ হল।

পারীতে পৌঁছে প্রথম দিনই সে ঠিক করল অধ্যাপক দ্যুমাব সঙ্গে দেখা করতে যাবে। একথা যদিও সত্যি, আমি গত এক বছর ধরে বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নেই, কিন্তু অধ্যাপক জানেন যে যুদ্ধ পড়াশুনো করার সময় নয়। পরিচিত একজন ফরাসীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দ আছে বই কি। দ্যুমাও নিশ্চয়ই একজন জার্মান বিজ্ঞানী তাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে ভেবে খুশিই হবেন…কিন্তু কেলার আসল কথাটা মনে মনে স্বীকার করতে চাইল না: সে দ্যুমার সঙ্গে সাক্ষাতের সেই স্মৃতি মনে করতে চাইল না—একটা স্কুলের ছেলের মতোই ছিল সেদিন তার ব্যবহার, কিন্তু আজ ফরাসী বিজ্ঞানীর কাছে সে অন্য রূপ নিয়েই দেখা দিতে চায়, এ রূপ আগের চাইতে নিশ্চয়ই শোভন হবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তার মনে হোলো: যদি দ্যুমা আমার সঙ্গে কথা বলতে না চান? ওদের মধ্যে একগুঁয়ে মানুষের তো অভাব নেই…। না, তা হতে পারে না—সে আর দ্যুমা প্রথমে বিজ্ঞানী তারপর তাদের অন্য সংজ্ঞা—তাদের মধ্যে পরিখার ব্যবধান থাকতে পারে না।

মারী দরজা খুলে দিল। যে-অতিথি তার রন্ধন নৈপুণ্যকে অবহেলা করেছিল, আজকের এই জার্মান সৈনিককে দেখে সে তাকে চিনতেই পারলো না। সে চিৎকার করে ছুটতে ছুটতে অধ্যাপকের কাছে গিয়ে হাজির হোলো:

'জার্মান এসেছে! জার্মান এসেছে।'

দ্যুমা শান্তভাবেই বললেন,

'ওরা তল্লাস করুক। না আমাকেই নিয়ে যেতে এসেছে?'...

তিনি জামার বোতাম আঁটলেন, তারপর হলঘরে ঢুকে বললেন:

'যদি আমার জন্য এসে থাক, আমি তোমাকে আটকে রাখবো না।'

'অধ্যাপক, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি জোহান কেলার। যুদ্ধের আগে আপনি আমাকে যে সম্মান দিয়েছিলেন তা...'

'ওঃ আপনি।...সেই আদিবাসী না!...বেশ, বেশ, ভিতরে আসুন। এমন সব ব্যাপার চলছে যে আজকাল আর কাউকে চিনবার যো নেই...। বসুন, ভয় পাবেন না, সব কিছুই এখানে পচে গলে গেছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, অতিথিকে একটু আপ্যায়ণ করব, এমন কিছুও নেই। আপনার দেশবাসী সব একেবারে শোষণ করে নিয়ে গেছে। দাঁড়ান, দেখি তো, হাঁ, একেবারে তলায় একটু পড়ে আছে দেখছি, কিন্তু তলানি হলে কি হবে চমৎকার জিনিস—। পুরানো কালভাদো। এখন কি নিয়ে কাজ করছেন?'

'আমার বিষয়ে আজ এক বছর হোলো কিছুই করিনি।'

'তবে কি করছিলেন? নগরের পর নগর জয়? নোংরা কাজ! প্রথমে তো দখল করলেন, তারপরে সেগুলি আবার আপনাদের কাছ থেকে দখল করা হবে, তখন আর নগরগুলির কিছু থাকবে না। মানুষও কি ছাই থাকবে? মনে আছে, আপনাদের এক অধ্যাপক লোক-সংখ্যার অতিবৃদ্ধির কথা বলেছিলেন।...দেখবেন, আপনি যেন নিজে বাদ না পড়েন...। মাপ করবেন, আপনাকে প্রথম থেকেই আক্রমণ শুরু করেছি। আমি তো এখন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটাচ্ছি...। আমি বুঝি, আপনাদের মত লোকের এ সব নোংরা ব্যাপারে কোনো হাত নেই।'

'অধ্যাপক, আমি আগের মতোই এখনো রাজনীতিকে এড়িয়ে চলি।'

'আমিও তাই। কিন্তু জানেন তো, রাজনীতি বিনা নিমন্ত্রণেই এসে দেখা দেয়...খান, একটু কালভাদো খান, আজকাল এ মদ একেবারে দুষ্প্রাপ্য। কি দুঃখের কথা, আপনাকে ঐ পোশাকে দেখতে হোলো। একজন মানী লোক, একজন সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী কিনা ঐ পোশাক পরলেন!—দেখেও যে মন

বিষিয়ে ওঠে !...কি ব্যাপার—আপনার কি বেসামরিক ভদ্র পোশাকে শহরে ঘুরে বেড়াবারও অধিকার নেই ?'

'অধ্যাপক, আপনি অমন করে কথা বলছেন কেন ? আমার তো মনে হয়, আমাদের দুই জাতি এই দুঃসময়ে আরো কাছাকাছি এসেছে, আমরা পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি, চিনেছি...'

'কি বললেন ?...কাছাকাছি এসেছে ?'—দ্যুমা লাফিয়ে উঠলেন, হাসছেন তিনি। 'মারী, কাছে এস! এই ভদ্দর লোকটির মুখখানা দেখ—উনি বলছেন, আমরা জার্মানদের কাছে এসেছি !...একজন ডাকাত যদি একটা লোককে পেড়ে ফেলে তার মুখে কাপড় পুরে দেয়—তাকে কি কাছাকাছি আসা বলে ?...'

কেলার এতক্ষণ সংযত হয়েই ছিল, তার মনে হল সে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সুমুখে বসে আছে, কিন্তু এবার সে আত্ম-সংযম হারালো :

'আমার মনে হয়েছিল, এত বড় বিপর্যয়ে ফরাসীরা অন্তত ভদ্র হবার শিক্ষাটুকু পেয়েছে...'

দ্যুমার মুখখানা লাল হয়ে গেলো, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন :

'এখুনি বেরিয়ে যাও, এখুনি ! যাও তোমার গেস্টাপোদের নিয়ে এস ! না, না, ভাণ করতে চেষ্টা কোরোনা তুমি অতিথি হয়ে এসেছ ! মারী, ওকে বাইরে যাবার দরজা দেখিয়ে দাও। যাও, বেরোও !'

কেলার নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মারী কেঁদে উঠলো :

'কি করলেন, মসিঁয়ে দ্যুমা ? এবার ওরা আপনাকে নিয়ে যেতে আসবে—'

তিনি তার কড়া-পড়া হাত দুখানা নিজের হাতে টেনে নিলেন।

'মারী...কি করে বাঁচতে হয়, তা মানুষকে জানতে হবে—হাঁ, হাস, গান গাও, নাচ, পান কর—অবশ্য যদি তোমার পান করবার মত কিছু থাকে... কি করে মরতে হয় তাও জানতে হবে, মানুষের মতোই দিতে হবে প্রাণ। যখন একটা খরগোস আহত হয়, সে বাচ্চাদের মতোই চেঁচিয়ে কাঁদে, কিন্তু একটা বড় গাছ কেটে ফেল, নিঃশব্দে সে লুটিয়ে পড়বে...মরতে ভয় পেলে চলবে না, মরাও তো একটা মহৎ কাজ। হাঁ যদি তুমি বাজে লোক না হয়ে সত্যিকারের মানুষ হও, তাহলেই একথা মনে হবে।'

…জানালাটা খুলে দাও তো, ওর গন্ধও যেন এখানে না থাকে…'

এমনিভাবেই কেলারের পাবীতে শেষ কটা দিন মাটি হয়ে গেল। আচেনে সে পল্টনের সঙ্গে যোগ দিলে। তাদের পোল্যাণ্ডে পাঠানো হচ্ছে। সৈনিকরা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলো, নতুন লড়াই আবার কোথায় শুরু হবে।

'ওরা তো বলছে রাশিয়ায়', সার্জেণ্ট বললে, 'রুশরা আমাদের দেখতে পারে না…'

কেলার হাসলো, হতাশার সে হাসি।

'যুদ্ধ এখন সবখানে। তোমার কি মনে হয় ফ্রান্সের মানুষই আমাদের দেখতে পারে? তারা শুধু আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সুযোগ খুঁজছে। আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে, পাজিটাকে সদর দপ্তরে টেনে নিয়ে গেলাম না কেন? যাক, নিজের হাত গন্ধ করিনি…আমরা জার্মানরা শিল্পী, আমাদের মনও যথেষ্ট উঁচু।'

## পনেরো

রায়া পোলোনস্কীর সঙ্গে নাচছে। তার আগে সে খেয়েছে এক গেলাস মুসকাতেল, সে আনন্দ পেতে চায়। নাচতে শুরু করেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু এখন ভয় করছে, তবু মুখে হাসি লেগেই আছে—তার মুখখানা কঠোর হয়ে উঠছে। দেহ কিন্তু দুলছে নাচের ছন্দে। ছন্দে যেন নিয়তির ইঙ্গিত, সে তার স্থিতি জাহির করছে। গ্রামোফোন পথের কুকুরের মতো গোঙাচ্ছে, ছন্দের তালে তালে কাঠি পড়ছে, আর এই শীস্ কান্না, আর গুরু গুরু গর্জনের ভিতরে বেহালা ফোঁপাচ্ছে ছোট্ট শিশুর মতো। হঠাৎ থেমে গেল বাজনা—এক শূন্যতা, এক গহ্বর, এক নিস্তব্ধতা—মাথা ঘুরে যায় বুঝি। কি করব আমি?—রায়া ভাবলো। আবার গ্রামোফোন নৈঃশব্দ থেকে জেগে উঠছে, আবার গোঙানি শোনা যাচ্ছে—পাক খেতে হবে—আবার দুলতে হবে, ঘূর্ণায় ঘুরতে হবে।…

গরমকাল তবু কন্টিনেণ্টাল রেস্তরাঁয় ভিড় জমেছে। কাল রবিবার,

সভিয়াতোশিন, দারনিৎসা বা পুশকা—ভোদিৎসায় যাওয়াই ভালো নয় কি—সেখানে শুঁকবে পাইন বা নতুন-কাটা খড়ের গন্ধ!

'কাল থেকে গ্রীষ্মকাল শুরু, বর্ষপঞ্জী তো তাই বলে—'

কিন্তু গ্রীষ্ম এসেছে বহুদিন। গরমও পড়েছে! ওরা নদীতে বাইচ খেলছে না কেন? এখানেই বা এল কেন? এই বাজনা, মদ আর আলাপ তো আরো গরম বাড়িয়ে দিচ্ছে।—

'পেতিয়া, তোমার কি মনে হয় যুদ্ধ হবে?'

কে এ প্রশ্ন করলো? হয় তো ঐ ছোকরা লেফটেনাণ্টটি। হয়তো বা ঐ ধূসর রঙের ডোরা-কাটা পোশাক-পরা লোকটি? না, ঐ ইয়াসচেঙ্কো?

বাজারে ওরা বলাবলি করছে জার্মানরা শীগ্‌গিরই আক্রমণ করবে। হানা বৃদ্ধা, তিনি ভয় পেয়ে সকালবেলা ফিরে এলেন:

'রায়েচকা, ওরা বলাবলি করছে যুদ্ধ নাকি বাঁধল বলে…'

সবাই মনে মনে কামনা করছে, না, এ হতে পারে না! ছোকরা লেফটেনাণ্টটি বিয়ে করেছে সবে পরশু দিন, তার ভারিয়েট্‌কার সঙ্গে সে নাচছে। সে কি করে বিশ্বাস করবে যে যুদ্ধ হবে? ঐ যে ধূসর রঙের ডোরা-কাটা পোশাক-পরা লোকটি, ও কি করে বিশ্বাস করবে যুদ্ধ আসছে? সে এসেছে বিজয় উৎসব করতে—তাদের পদ্ধতি কাজে ফলানো হয়েছে—শীগ্‌গিরই সমস্ত দোকান, গোলাপ আর ধানের মঞ্জরী আঁকা পেয়ালা-পিরীচে ভরে যাবে, আবার তাদের ধারগুলিতে সোনালী পাড় দেওয়া থাকবে। যে মেয়েটির সঙ্গে সে নাচছে সে তিন দিনের ভিতরে উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য নাইট্রেটের প্রয়োজনীয়তার উপরে রচনা দাখিল করবে। যুদ্ধ?…না এখন তা অসম্ভব। আর পেতিয়া, যাকে এই মাত্র জিজ্ঞেস করা হোলো যুদ্ধ হবে কিনা…সে এক রকম দেয়ালের নতুন রং আবিষ্কার করেছে, আর শোনা যাচ্ছে তার জন্য তাকে একটা পুরস্কারও নাকি দেওয়া হবে। আজ সে তার জন্মদিনের উৎসব করছে। আর হঠাৎ আসবে কিনা যুদ্ধ?…না না!

হানাও সকালবেলা তাই বললেন, 'না, তা হতে পারে না! মানুষ তো সবে প্রাণ পেয়েছে, বাঁচতে শুরু করেছে …'

হানার মনে হোলো যুদ্ধ অনেক আগেই শুরু হয়েছে, সেই তার স্বামীর চলে যাওয়ার ঠিক পর থেকে। নাউম মারা গেলেন, হানার ভাই মারা গেল

পেরেমশিল-এ। আর এক ভাই চার বছর পরে মারা গেল ককেশাসে। লোকে তখন বলত শান্তি আসবে, কিন্তু পথে পথে চলত গুলী।...সেই পেত্‌লিউরার দল! আর পোলরা, কে জানে কে তারা...। তারপর এল রেশন কার্ড আর কিউ...হানা তখন বুড়ো হয়ে গেছেন। হঠাৎ আবার শাদা ফিনদের হানা...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, জীবন আবার নিজস্ব খোপে ফিরে এসেছে। বাড়ীর পর বাড়ী তৈরী হচ্ছে, দোকানে ঢুকে সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায়... আর ওরা কিনা আবার বলছে যুদ্ধের কথা!...যুদ্ধ তো সবে শেষ হোলো। না, না, এ হতে পারে না।

ভূগোলের শিক্ষক স্তেশেঙ্কো বিড়বিড় করে বললো, না, এ হতে পারে না। সে তার বদ্ধ ঘরে স্বপ্ন দেখছে গ্রামের একখানি কুটীরের, বোগুনিয়া থাকবে বাগানে, দোলনা থাকবে।

জিনাও বলে উঠলো, 'না এ হতে পারে না।' তার মন অতীতের বীরদের বীরত্বের কাহিনীতে ভরপুর—কিন্তু সে তো সাহিত্য—পাশের ঘরে বাড়ির তত্ত্বাবধানকারিণীর বারো মাসের শিশু স্তবিক ঘুমোচ্ছে—তাকে বেড়ে উঠতে হবে, সে খেলা করবে, যাবে স্কুলে...।

কেউ বিশ্বাস করতে পারল না যুদ্ধ হবে, কিন্তু তবু সবাই ভয় পেল। কে জানে জার্মানদের মনে কি আছে?...কিন্তু কাল তো—রবিবার। তরুণ-তরুণীরা যত খুশী নাচতে পারে।

রায়ার জীবন-নাট্য তো এই ভীতির কাছে অতি ক্ষুদ্র। এ যে জগত ছেয়ে গেছে। সে নিজেও তা বুঝতে পারছে, কিন্তু মন তবু স্বীকার করতে চাইছে না। পোলোনস্কী তো শুধু 'প্রেমিক' নয়, তার তো অমন বহু প্রেমিকই আছে—তাদের সঙ্গে নাগরিকাবৃত্তি করে, নেচে সে তাদের ভুলেও যেতে পারে।

না পোলোনস্কী তার কাছে অপার সুখ। হয় সুখ, নয় তো নিয়তি...

ওসীপ উত্তরে এক বছরের বেশি কাটালো। ছোট শিশুর মতোই সে নিপারের সাদা তটভূমি দেখে খুশি হোলো। তারপর আবার পাহাড়ী উঁচু পথময় শহর, আবার রায়ার দীর্ঘায়ত আঁখিপল্লব। তার হাততালি দিয়ে ঘরময় নেচে বেড়াতে ইচ্ছে হোলো। কিন্তু মুখে সে শুধু বললে, 'ফিরে এসে খুবই

ভাল লাগছে, রায়েচকা…' সেদিন সন্ধ্যেয়ই সে ছুটে গেল : 'ইয়াসচেক্কোর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

রাতে রায়া ফিসফিস করে বললো, 'তোমার ফিরে আসার জন্য আমি যে কি প্রতীক্ষা করছিলাম! তুমি জানো…আমি বিশ্বাস রেখেছি'…সে অবাক হোলো না। রায়া রেগে উঠলো : 'আমি যেন ওর কাছে পোশাক রাখবার আলমারী—চাবী বন্ধ করে ও চলে গিছলো, এখন আবার ফিরে এসেছে—সবই ঠিক আছে কিছু খোয়া যায়নি'…আর তার যৌবন, তার শেষ কটা দিন কেটে যাচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে।

স্বামীর চলে যাওয়ার আগের থেকে এখন জীবন আরো দুর্বহ হয়ে উঠেছে। শুধু কাজের কথাই বলে স্বামী, তা নয় তো বলে গ্রীকরা কোর্সে না কি দখল করেছে। সে জিজ্ঞেসও করে না, রায়া তার জীবন কি ভাবে, কি নিয়ে কাটাচ্ছে? রায়া তাকে বললো, 'গান-বাজনা একেবারে ছেড়ে দিলাম।' ওসীপ উত্তর দিলে, 'তাইত ভারি দুঃখের কথা,' তারপর খবরের কাগজ খুলে বসলো। কখনো বা ব্যগ্রতাও তার দেখা দেয়, সে তার ক্ষুদে হাত নিয়ে চুমু খেয়ে বলে, 'রায়া রায়াচ্‌কা।' কিন্তু তাতে পবিত্রতা থাকতে পারে, কামনা হয়তো থাকে না।…তারপরে হয়তো বেরিয়ে যায়। রায়ার নিজের অফিসের কাজ ভালো লাগে না। তার উপরওয়ালা কাচের মত চোখ চেয়ে বলেন, 'দেখছ না আমি ব্যস্ত?' আলিয়েস্কা আছে তার ঠাকুরমার কাছে। হাঁ এমনিই চলেছে—রায়া আগেও কখনো মেয়ের দিকে নজর দেয় নি, কখন বা দেবে? সে থিয়েটার আর নাচের আসর নিয়েই মেতেছিল। তাই আলিয়েস্কাও মার থেকে ঠাকুরমারই বেশি ন্যাওটা হয়েছে। রায়াকে তো কেউ চায় না, সে এখন মরলে কেউ দুঃখ করবে না…।

ওসীপ তাকে ভালবাসে না, একথা অবশ্য সত্য নয়। কিন্তু এ এক অদ্ভুত ভালোবাসা! হয়তো অন্য গ্রহে এমনি ভালোবাসাই চালু…মে মাসে আবার তাকে পেচোরায় পাঠানো হোলো। খুশিই হোলো ওসীপ; 'ওরা কি রকম উন্নতি করেছে দেখলে ভালোই লাগবে…রায়া, তুমি আবার কিছু মনে করে বোসো না, এবার এক মাসের মাত্র ব্যাপার, তার বেশি তো নয়ই।' হয়তো কথা মতোই সে ফিরে আসবে, হয়তো বা এক বছরও থেকে আসতে পারে। কি করবে ও নিজেই জানে না…। ও কি মানুষ? কিন্তু তবু তাকে সে

ভালোবাসে, বিদায়ের আগে সে বললে, জানো রায়া, যখন ওখানে ছিলাম, একদিন বেরিয়েছি।···শীত খুব, চারদিক অন্ধকার। হঠাৎ আমার মনে হোলো, তুমি আর আমার কাছে নেই—তুমি আমাকে ভুলে গেছ, ছেড়ে চলে গেছ···আমার মনে হোলো আমি যেন অন্ধ হয়ে গেছি—আর কিয়েভকে আমি দেখতে পাব না, জীবনকেও আর খুঁজে পাব না। উপন্যাসের মতোই ব্যাপারটা উদ্ভট, কিন্তু তবু তোমাকে ছাড়া আমি তো জীবনের কল্পনা করতে পারি না···'

'আর আমি ?···আমার মনে হয়, আমিও ভালবাসি, ওরই জন্য আমি দুঃখ সইছি। হয়তো এ একটা অভ্যেস—তাই কি ?···জানি না। কিন্তু পোলোনস্কীর কথা তো আলাদা—ও যখন আমার দিকে তাকায়, আপন মনে খুশি হয়ে উঠি, কিন্তু আবার এত ভয় হয়, বুঝি তখনি মরে যাব···ওর সঙ্গে আবার নাচতে যাব, কিন্তু হাসি থাকবে মুখে, আমার কি দুঃখ, ও বুঝতে পারবে না···'

পোলোনস্কী রায়ার থেকে লম্বা, সে যখন তার সঙ্গে নাচে, মুখ নীচু করেই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে হাসে না, তার মুখখানা সব সময়েই বিষণ্ণ, যেন একটু ক্ষুব্ধ এমনি ভাবখানা—হয়তো ওর মুখের গড়নের বা ওর চোখের জন্যই তা মনে হয়। কিন্তু সে বিষণ্ণ বা অসন্তুষ্ট নয়, রায়ার সঙ্গে সারা সন্ধ্যেটা কাটাতে পেরে বরং সে খুশিই হয়। সে সত্যিই প্রেমে পড়েছে। সোচিতে সে যাবে ঠিক করেছিল, জায়গাও মিললো, কিন্তু গেল না, রায়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ তার সইবে না। কমই ওদের দেখা হয়, যদি হয় তাও নানা মানুষের ভিড়ে। সে বুঝতে পেরেছে রায়া তার দিকে আকৃষ্ট, ভয়ও সে পেয়েছে···। ভবিষ্যতের দিকে সে তাকায় না, এক সাক্ষাৎ থেকে আর সাক্ষাৎ নিয়েই তার জীবন। আলাপও হয় তাদের ছাড়াছাড়া, তুচ্ছ বিষয় নিয়েই কথা তারা বলে, কিন্তু সেই তুচ্ছ তো তাদের কাছে মূল্যবান। তারা পরস্পরকে প্রশ্ন করে, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার ঝগড়াও করে। অস্ফুট আধো-বলা কথার জাল বুনে যায়, আবছা সঙ্কেতময় হয়ে ওঠে। কখনো বা তারা কবিতা থেকে চলে যায় পথের নামে, আবার পথ থেকে বৃষ্টির কথায়—বৃষ্টি থেকে শোপাঁয়।

কণ্টিনেণ্টাল থেকে ওরা বেরিয়ে এল। রায়ার মনে হোলো, এখন বাড়ী

যাওয়াই উচিত, কথাও কম বলাই উচিত ; তবু সে বিপরীত দিকেই চললো। পোলোনস্কী যে তার পাশে, সেকথা যেন সে ভুলে গেছে।

'সোচি গেলে না কেন ?'

'জানি না।'

'তোমার কি মনে হয় যুদ্ধ হবে ?'

'না।'

'সোচিতে কখনো গেছ ?'

'না। কিন্তু সুখুমিতে গেছি।'

'জায়গাটা ভালো ?'

'সব চেয়ে ভালো লাগে ওদেশা থেকে ওখানে যাওয়ার পথটা।'

'সূর্য আর নীল সমুদ্র—তাই তো ভালো লেগেছিল ?'

'না, সেবার ভীষণ ঝড় উঠেছিল। অনেকে তো সমুদ্রপীড়ায় পডলো··· আমি সারারাত ছিলাম ডেকে। বড ভয়ংকর, কিন্তু কি চমৎকার ! তুমি ঐ কবিতাটা নিশ্চয়ই জানো :

ঝড় গর্জায়
সমুদ্র গায় গান···
আর শতাব্দী চলে যায়
বিদ্যুৎবেগে···

'কিন্তু ঝড হলে সে তো ভয়ানক।···আমি কখনো ঝড় দেখিনি। কবে যাচ্ছ ? অগাস্টে কি ?'

'জানি না·· ধর যদি যুদ্ধই বাঁধে···'

কিন্তু এই মাত্র তো বললে, যুদ্ধ হবে না···'

'বলেছি নাকি ? জানি না তো···শুধু ভাবছিলাম—আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি ?'

ওরা নির্জন অন্ধকার পথে বেড়াচ্ছিল। পথের চারদিকে বাগান। মাথার উপরে তারার দল। পোলোনস্কী রায়ার হাত ধরলো, তার দেহের পেষণ সে অনুভব করছে। কিছু না ভেবে, সে তাকে চুমু খেল, রায়াও সাড়া দিলে ; তারপর হাত ছাড়িয়ে নিলে।

'না, অমন কোরোনা।'

'কেন ?'

'জানি না…'।

সে আবার হাত ধরলো, রায়া ছাড়িয়ে নিলে।

'কেন, অমন করছ ?'

রায়া চুপ। সে জোরে পা চালিয়ে চলেছে। ওরা এবার ক্রোশচাটিকের দিকে চলেছে। পোলেনস্কী রায়ার চোখে জল দেখতে পেল। তারা কথা বললো না, শুধু বাড়ী পৌঁছে রায়া বললে :

'তুমি রাগ করো না…অন্য উপায় আমার ছিল না। এ ত আমার এক অনুভূতি, তোমার, এমন কি আমার নিজের কাছেও তাকে বুঝি প্রকাশ করা যায় না। আমি যে চাইনি তাতো নয়…। কথায় বলে না, 'তুমি যেমনটি চাও, তেমনিভাবে জীবন কাটিয়ো না, ভগবানের হুকুম মতো চোলো'। ভগবান নেই, কিন্তু তবু মানুষ নিজের ইচ্ছামতো জীবন কাটাতে পারে না…।'

যা ঘটে গেল, তারই উত্তেজনায় সে মুখ মুছতে ভুলে গেল। সে বাড়িতে ঢুকলো, মুখে তার অশ্রুর কলঙ্ক। যেমন ভাগ্য, হানা এখনো ঘুমোন নি। তিনি রায়াকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন :

'কি হোলো গো তোমার ?'

'কিছু না।'

'আন্তোনিনা পেত্রভ্‌না এসেছিলেন, তিনি বললেন, 'জার্মানরা নাকি ঠিকই যুদ্ধ বাধাবে। কে তাকে বলেছে জানিনা …তুমি কি শুনে এলে রায়েচকা ?…'

'আমি ? কিছুই না…'

রায়া পোশাক ছেড়ে বিছানায় শুতে যেতে যেতে হঠাৎ শুনলো হানা কাঁদছেন ?

'কাঁদছ কেন ?'

'লিওভা নিশ্চয়ই মারা গেছে। হবে না, আমরা ভগবানকে কত হেনস্তা করেছি ?'

'কিন্তু তুমি কি ভগবানে বিশ্বাস কর ?'

'জানিনা বাছা…যখন সব ভালো যায়, তখন একবার ওকথা ভাবিও না। কিন্তু কিছু হলেই…তুমি রাগ কোরোনা রায়েচকা, তোমার বইপত্তর আছে,

তুমি থিয়েটারে যাও…কিন্তু আমার তো এই সম্বল…আমার মনে পড়ে কত ভগবানকে ডাকতাম, আর তাতে মনটা শান্ত হোত। আমার লিওভার জন্য ভারি ভাবনা হচ্ছে…'

'যুদ্ধ বাঁধলে ওসীপ তো যাবেই…'

'ওসিয়ার গায়ে জোর আছে। কিন্তু লিওভা যে নাউসের মতো…ওসিয়া মাথা ঠিক রাখবে। সত্যি কথা বলতে কি বাছা—ওসীপকে আমি ডরাই। ভারি তাজ্জব না, যাকে মানুষ করলাম…তাকে কিনা ভয় করি।'

'ভয় কর কেন ?…'

'ওযে কোনো কথা বলে না।'

'ও যে শিশুর মতো, নিজের কথা বলতে পারে না। ওকে এখন আমি বুঝতে পারি।…ওর সঙ্গে থাকতে পেলে সুখেরও বুঝি দরকার নেই। কিন্তু বড় কঠোর ; বড় কঠোর ! না, না, ওর কথা বলছি না। শুধু বলছি, জীবন-টাই বড় কঠিন—কঠোর। আমি তো এখনো বাঁচার মতো বাঁচতে পারিনি, জীবনের স্বাদ পাইনি, শুধু খেলা করে কাটিয়েছি। কিন্তু এ বড় কঠিন…'

হানা তাকে বুকে চেপে ধরলেন, এমনি করেই তিনি আলিয়াকে চেপে ধরেন :

'জানি, আমি সব জানি…যুদ্ধ যেন না বাধে ! তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে…সব ঠিক হয়ে যাবে। রায়া, ঘুমোও, ঘুমোও…'

একেবারে ক্লান্ত হয়ে রায়া হানার পাশে ঘুমিয়ে পড়লো ; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসলো, পোলোনস্কীর সঙ্গে যখন নাচতে নাচতে হাসে এ সে-হাসি নয়। এখন তার হাসি মৃদু, শান্ত। হানাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘড়ীর মতোই সময়ের অতিবাহনের কথাই জানিয়ে দিচ্ছে। জুনের ছোট রাত এমনিভাবেই কেটে গেল।

## ষোলো

'অন্তত ঘণ্টাখানেক আমাকে ঘুমিয়ে নিতেই হবে', সার্জেণ্ট গ্রুন বললে। সে তার সরু গোঁফে হাস্যকরভাবে তা দেয় বলেই তাকে সবাই 'আরশুলা' বলে ডাকে।

সে খানিকক্ষণ পরেই হাই তুলে উঠে পড়লো, মুখে অশ্রাব্য গালাগাল।

'না, ঘুম আর হোলো না।'

কেউই সে রাতে ঘুমোতে পারলো না। তারা এই গ্রামে আজ দশদিন হোলো আছে, অসহ্য গরমে অস্থির, আর আছে মশা আর অজানা আশঙ্কা। অবশেষে তাদের যন্ত্রণার অবসান হোলো।

গোলগাল, শিশুর মতোই দেখতে এক ছোকরা সৈনিক, চোখ দুটো তার উজ্জ্বল, সে গাল দিতে দিতে থুথু ফেললো—থুথু ফেলার ভাণই বা বুঝি করলো—তার গলা তখন ভয়ে শুকিয়ে গেছে। ছোকরার নাম ক্লেপার, হামবুর্গের এক বাড়ীর মালিকের ছেলে সে। সে ভয় পাচ্ছে, তবু সে সাহস দেখাবে, লটে জানুক, সে পুরুষ, স্কুলের বাচ্চা ছেলে নয়!···কিন্তু তলপেটের কোথায় যেন ভয় কুঁড়ে খাচ্ছে। ক্লেপার আপন মনে বলে চললো :

'পল বলছিল, নিডারস্টাইনে ওরা যখন সবাইকে সাফ করে ফেললে, মাত্র একজন কমিউনিস্টই তখন বাকি—সে ছিল বাঁয়া, পল বলছিল, ওকে একটা আঙল দিয়েই টিপে মারা যেত, কিন্তু তবু তাকে ওরা ধরতে পারল না। ওরা এবার পড়লো সেই শয়তানটার খপ্পরে, সে স্ট্রেমারের গলা একখানা ক্ষুর দিয়ে দুফালি করে দিলে। সে যেখানে লুকিয়ে ছিল, সেই বাড়ি ওরা যখন ঘেরাও করলে, দুজন ঝঞ্ঝা-বাহিনীর সৈনিককে সে মেরে ফেললে। ঐ বাঁয়াটা সারা রাত ধরে ওদের অতিষ্ঠ করে তুললো, ঘাম ছুটিয়ে দিলে। যদি রাশিয়ায় কমিউনিস্টই বেশি হয়, তাহলে তো আমরা আবার শয়তানের খপ্পরে পড়ব···'

—ওরে বাচ্চা, শান্ত হ', আরশুলা বললো, 'তোর বাঁয়া ছিল জার্মান, আর এরা রুশ। আমি একজন রুশকে দেখেছি, সে তার নাক ঝাড়তেও শেখেনি।

যখন কাস্তে আর শাবল নিয়ে যুদ্ধ হয়, তখনই ওরা যুদ্ধ করতে পারে। আমাদের যে সব খেলনা আছে, তার কাছে ওরা টি'কতে পারবে না।'

আরগুলা প্যোল্যাণ্ড আর ফ্রান্স ফেরতা, তাই সে যখন আনাড়ীদের সঙ্গে কথা বলে, সে ঠাট্টাই করে—

'আরে বাচ্চা, এ নির্বাচনী প্রতিযোগিতা নয়। কমিউনিস্ট বা আর যাই হোক, চারদিক একবার দেখবারও সময় পাবে না। একটা ব্যাপারে আমার ভারী দুঃখ—আমাদের ট্যাংক বাহিনীতে নেওয়া হোলো না। আমাদের পল্টন সব সময়েই পিছিয়ে আছে। আমার ছোট ভাই ট্যাংক বাহিনীতে আছে, ওরাই সবটুকু সর টেনে নিলে। আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে সব পুরনো মদ শেষ হয়ে যাবে, আর ছুঁড়িদেরও সতীত্ব যাবে।'

কেপলার চেষ্টা করে হেসে উঠলো। সে ভাবলে, একটি মেয়ের সঙ্গে ফটো তুলতে পারলে কি চমৎকারই হবে, আর সেই ফটো সে পাঠাবে লটের কাছে। সে জানুক—ও এখন একটা জলজ্যান্ত পুরুষ···কিন্তু ভয় এখনো আছে। এখন পাকস্থলীর ভিতরে কামড়াচ্ছে।

ক্লেপার কথায় কথায় আরগুলাকে জিজ্ঞেস করে বসলো,

'লড়াইয়ের পাল্লার মধ্যে পড়েছিলে নাকি কখনো ?'

'এড়াতে আর পারলাম কোথায় ? সাউমুরে'গিয়ে যখন আমরা হাজির হলাম, তখন আমাদের ট্যাঙ্কগুলো চলে গেছে লা রচেল অবধি। এরই মধ্যে কোত্থেকে ওরা হুড়মুড় করে এসে পড়লো—ওখানেই ছিল বোধ হয়···। ভাবছ, ফরাসী বুঝি ? একেবারে শয়তানের মতো কালো ভূত, আর তেড়ে এলো যেন আফ্রিকার ছাগলগুলোর মতো। রাত অবধি আমাদের জ্বালালে ···হাঁ, কড়া জান বটে ঐ সেনগালীগুলোর, কিন্তু তাদেরও খতম হতে দেরী হোলো না। রুশরা কালো রং যত ইচ্ছে মুখে মাখুক না, কিন্তু আমাদের খেলনার সামনে এলে ওরা ডাকবার ফুরসৎটুকুও পাবে না, তার আগেই···'

লোহার ক্রশ-আঁটা একজন কর্পোরালও আরগুলার কথায় সায় দিলে :

'যখন ওদের জার আর জার্মান সেনাপতিরা ছিল, তখন নিজেদের রক্ষা করলেও করতে পারত। এখন তো ওরা শুধু আন্দোলন করতেই জানে। ওরা হচ্ছে প্রকাণ্ড পর্বত, কিন্তু পা দুটো মাটির তৈরী হয়েই সব মাটি করেছে।

'সবাই বলে, ওখানকার পথ-ঘাট নাকি খুব খারাপ।'

'দেখো, পোলাণ্ড যখন পার হয়ে এলাম, তখন তাতার দেশ হলেও পার হয়ে যাব।'

ক্লেপার শান্ত হতে পারল না। সে থুথু ফেলে বললে:

'ফ্যুরার কিন্তু বলেছেন, ওরা আমাদের আক্রমণ করবার তোড়জোড় করছে। তার মানে ওদের সেনাদল বেশ বড়...'

'ওহে ছোকরা, তুমি কি লুক্সেমবুর্গ মনে করেছ নাকি।' হাঁ, ওদের সেনাদল বেশ বড়ই। তার মানে কি জানো, বড় বড় বন্দীশিবির আমাদের তৈরি করতে হবে।'

বাউয়ের নন্‌-কমাব্যাটাণ্ট। বয়েস চল্লিশ বছর। বেসামরিক জীবনে সে স্কুলে আঁকা শেখায়। সে ভ্রূ কোঁচকালো: বিশ্রী ব্যাপার!...আবার রাশিয়ার দিকে পড়ি-তো-মরি করে ছুটছে কেন? রুশদেরও নাৎসী হতে হবে নাকি? ঐ পোঁটা-ঝরা সেনাপতিগুলোর তাঁবে দৌড় করতে বাধ্য হচ্ছি—তাতে কি যথেষ্ট হয় নি? দেখ না—আমি কতখানি নেমে গেছি। পোলাণ্ডে চাষীদের বৌ-ঝিদের কাছ থেকে মুরগীছানা কেড়ে আনছি।...আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগের কথা। না জুন মাসে নয়, আগষ্টে, আমি মস্কো বেড়াতে যাব। আমরা উণ্টার ডেন লিণ্ডেনে ইনটুরিস্ট আফিসে গিয়ে টিকেট কাটলাম.. আমার সঙ্গে ছিল ফ্রিৎস। কিন্তু শেষে ক্রাউস হেরিংসডর্ফে নিমন্ত্রণ করল, আর যাওয়াই হোলো না...আমি এখানে কেন এসেছি? রুশরা আমার কি ক্ষতি করেছে? কিছুই না। কিন্তু নাৎসীরা আমাকে খাঁটি অমানুষ বানিয়ে ছেড়েছে। কিয়েলস্‌-এর ঐ মেয়েটার শরীরে বোধ হয় রোগ ঢুকিয়েই দিয়ে এসেছি...। মেয়েটার নাম জানিনা...। বিশ্রী! আর ঐ মুর্খগুলো আনন্দে আটখানা হয়ে উঠছে...

ক্লেপার লটেকে লিখবে ঠিক করলো। তর ভাষায় যথেষ্ট কারুকরি, আবার অনুভূতির প্রকাশ না হয় সে চেষ্টাও আছে। সে লিখলে: 'শেষ মুহূর্তের আশাময়ী ভয়ংকর রাত'...তারপর সাবধানে 'ভয়ংকর' কথাটা কেটে দিয়ে লিখলো 'অভিশপ্ত' রাত'। 'পোলাণ্ডে কত সুশ্রী তরুণী, আমার সঙ্গীরা তাদের নয়নবানে বিদ্ধ করেছে, আনন্দের প্রস্রবণ বইছে। কিন্তু আমার ভাবনা তো এখন সুদূরে। পূর্ব-ভূমণ্ডলে যেখানে সূর্য প্রথম উদয় হয়, সেই-খানেই হয়তো আমার জীবন অস্ত যাবে।—আর এক ঘণ্টা পরে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব সমরে। ওবারভেল্ডে সেই ভ্রমণের কথা কি তোমার মনে

আছে? আমি তোমাকে যা বলেছি তাই-ই করব। সীমান্ত থেকে হাসছি তোমার দিকে চেয়ে'…। চিঠি শেষ করে সে লটের দেওয়া নোট বই বার করে লিখলো 'একুশে জুন, রাত। হুকুম এসেছে। কেউ ঘুমোয় নি—আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। কি ভয়ংকর…' চকোলেট মুখে পুরে নিজেকে সে শান্ত করতে চাইলে, কিন্তু একটু কামড় দিয়েই থু করে ফেলে দিলে—বমি বমি লাগছে গলা পর্যন্ত যেন এসে গেছে।

রিক্‌টার কথা বলছেও না, শুনছেও না, সে ভাবছে হিল্ডার কথা। এখন সে নিশ্চয়ই ঘুমে। যদি ঘুমিয়ে না থাকে…তবে কি রোবার্ট আছে তার সঙ্গে? …স্টেশনে তো সে ওর পাশে ছিল…। সে বার্লিনেই রয়ে গেছে। এখন সে বুঝি হিল্ডারই সঙ্গে আছে? সে হয় তো নটায় এসেছে, তারপরে আধ ঘণ্টা হয়তো হিল্ডা তাকে বসবার ঘরেই বসিয়ে রেখেছে। একটু অস্থির সে, বার বার হাই তুলছে আর 'জার্মান গোথিক-শিল্প' বইখানার পাতা ওলটাচ্ছে। এরই মধ্যে হিল্ডা তার পোষাক বদলাচ্ছে, পরেছে একটা নীল কিমোনো—গলায় সেণ্টের বোতলের ছিপিটা ঝুলিয়ে নিয়েছে। এবার সে বাইরে এল, তার আয়ত ম্লান চোখ দুটি তুলে তাকালো রবার্টের দিকে, তারপর বললে, 'কে, বন্ধু তুমি?…' যেন সে জানে না কে তার প্রতীক্ষায় বসে আছে! তারপর সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'রবার্ট কি করছো তুমি?'…এখন হয়তো বলছে, 'ধর, কার্ট যদি জানতে পারে? ওকে আঘাত দিতে আমি চাই না…' রবার্ট স্বরে করুণ আমেজ এনে বলছে, 'বেচারী কার্ট…' না না, এ অসম্ভব! ঐ সব বাজে ভাবনা করে মনে ব্যথা পাচ্ছি কেন? আর তাও এমনি রাতে…! …না, না, এসব ভুলে যেতে হবে। রিক্‌টার ওদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করলো।

কর্পোরাল বলছে, 'ওরা নেপোলিয়ানকে কিমা বানিয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু তখন ঘোড়ায়-টানা গাড়ী ছিল, আজকাল আছে মোটর। মোটরই এখন ভাগ্য ঠিক করছে, দূরপাল্লায় মানুষ আর ভয় পায় না…'

রিক্‌টার ভাবতে লাগলো: দুঃখ মিশে গেছে ভাবনায়। ওরা তো জানে না রাশিয়া কেমন…সে তো দেশ নয়, গোটা একটা পৃথিবী…। তুমি বেড়াচ্ছ তো বেড়াচ্ছই—কিছুতেই ফুরোয় না…সব সময়েই তুমি যে কত ছোট সেই কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। যুদ্ধ না হলেও ওখানে মানুষ হারিয়ে যেতে

পারে—তুমি মরতেও পার, কেউ টেরও পাবে না…। আমাদের মতো ওরা সুনিয়ন্ত্রিত নয় একথা খুবই সত্যি। কিন্তু ওরা অদ্ভুত জীব, ওদের উপর নির্ভর করা যায় না। ওদের সঙ্গে কথা বল, বেশ ভালই লাগবে, কিন্তু কখন কি ফন্দি আঁটবে কে জানে।…ওরা আমাদের ফুল দিয়েও অভ্যর্থনা করতে পারে, তাতে আমি অবাক হব না। আবার পাগলের মতো লড়াইও করতে পারে। আমি তো ওখানে ছিলাম, কিন্তু তাই বলে কি আমি ওদের চিনি? কর্ণেল হ্বিলকিও ওদের চেনেন না, তাই 'আধা শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশের' কথা বলেছেন। ফরাসী, ইংরেজ, ডাচদের বোঝা যায়—কিন্তু এরা যে এশিয়ার মানুষ। এমন কি ফ্যুরারও বোধ হয় ভাবতে পারছেন না, কি শক্ত পাল্লায় গিয়ে তিনি পড়ছেন…

আরগুলা বললে, 'হাঁ, ওরা সংখ্যায় অগুনতি, কিন্তু চীনেরা তো ওদের চেয়ে আরো বেশী। যুদ্ধটা ঠিক অঙ্ক নয়। …আমি একজন ফরাসী সেনাপতিকে আত্মসমর্পণ করতে দেখেছি…আঠারোটা সামরিক-সম্মান চিহ্ন তার বুকে আঁটা—ঠিক পোঁটা-ঝরা সেনাপতিটি নয়। কিন্তু বাছুরের মতোই সে চেঁচাতে শুরু করলো, যখন বুঝলো যে জার্মানদের কাছে সে ভীরু ছাড়া কিছুই নয়। রুশরা পিঁপড়ের থেকেও সংখ্যায় বেশি হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তো বলেছি, বাচ্চারা শোনো, আমাদের সাংঘাতিক খেলনাগুলির সঙ্গে শাবল নিয়ে এঁটে উঠতে ওরা পারবে না। লোকে বলে, কসাকদের ভালো ভালো ঘোড়া আছে। আরে আমাদের ট্যাঙ্ক এসে পড়লে, ঘোড়াগুলোর দশা কি হয় দেখা যাবে।

বোকা কোথাকার! রিক্‌টার ভাবলো। ও মনে করে, রুশদের ট্যাঙ্ক নেই। কুজেনস্কেব তাহলে কি দরকার ছিল?…আমার মনে হয়, শত্রুর শক্তির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই, ছোট করেই তাদের ভাবছি। 'আধা-শান্তিপূর্ণ' অনুপ্রবেশের মানেটা কি?…কিন্তু এ কথা বলবার সাহস তো আমার নেই—ওরা এখুনি ভেবে বসবে, আমি ভয় ছড়াচ্ছি পল্টনে। আর, তা ছাড়া, আমিই বা ভয় দেখাতে যাব কেন? যুদ্ধ যখন বেঁধেছে—আমরা জিতবই—তারপরে সব শেষ হয়ে যাবে। ভগবান, আমি যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেতাম!… হিল্ডা বলেছিল: 'আমি এক বছর, দু'বছর অপেক্ষা করব তোমারই জন্য।… কিন্তু মেয়েদের মনে কি আছে তা কি বোঝা সম্ভব?…আমাদের জিততেই হবে,

জিতবই আমরা—আমাদের আছে সুশৃঙ্খলা, আছে উদ্দীপনা, গতি। আর-গুলার মতো মানুষ কখনো থামবে না, ও ভাবে না বলেই এগিয়ে যেতে পারে। ওকে হত্যা করতে পার, কিন্তু ওর বিশ্বাস টলাতে পারবে না। এইখানেই আমাদের শক্তি। অবশ্যই আমরা জিতব। কিন্তু আমরা অনেকেই আর রাশিয়া থেকে ফিরব না।…ফ্যুরার নিশ্চয়ই এ সব হিসেব করে রেখেছেন। পোলাণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, থার্মপলী…হ্যাঁ ঐ লোকটা জানে কি করে যুদ্ধ বাঁধাতে হয়, করতে হয়। …শীতের আগে যদি ওদের নিকেশ করতে না পারি তাহলে অবস্থা সঙ্গীন হয়েই উঠবে। রাশিয়ার শীত ভয়ংকর। আমি শীতকালে কখনো থাকিনি, কিন্তু তুষার-ঝড়ের কথা ওরা যে ভাবে বলত, তাতেই আমার কাঁপুনি ধরত।—

'রিকটার, একটু রম্ নেবে নাকি—? জামাইকা রম্ একেবারে বোর্দ্যোর মাল।'

রিক্‌টার আধ মগ রম্ এক চুমুকে খেয়ে ফেললো।

'গন্ধটা চমৎকার, কিন্তু মাথা ধরে। রুশ ভোদকা কিন্তু আলাদা। বিশ্রী গন্ধ, কিন্তু এমন চমৎকার দাওয়াই। এমনি দুটি মগ চালালেও ভোরে জেগে একেবারে বাচ্চার মতোই তাজা মনে হবে।'

'মোৎসস্ট্রাসের এক রুশ রেস্তোঁরায় একবার ভোদ্‌কা খেয়েছিলাম।

রিক্‌টার হাসলো:

'যে-জায়গার জিনিস সেখানেই ভালো। আমি সাইবেরিয়ায় ভোদ্‌কা খেয়েছি।'

দেখতে দেখতে তার মর্যাদা বেড়ে গেল—সবাই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে—ফ্রান্সের জয়-যাত্রায় যারা ছিল সেই ঝুনোর দলও বাদ যাচ্ছে না। ফ্রান্সকে কে না জানে?…কিন্তু রিক্‌টার রহস্যময়ী রাশিয়াকে নিজের চোখে দেখে এসেছে…

ক্রেপার জিজ্ঞেস করলো:

'তোমার কি মনে হয়, ওরা আত্মরক্ষা করবে?'

'জানি না, ওদের যত দেখবে, চেনা ততোই শক্ত হবে। ওদের ভিতরে সংহতি নেই, শৃঙ্খলা নেই। ওরা ভোদ্‌কা খেলে মুখ বিকৃত করে, অসন্তোষের গুঞ্জন তোলে, গালাগাল দেয়। এ সব দেখলে কারো মনে হবে, ভোদ্‌কা তো

নয়, ওদের যেন কুইনিন জোর করে গেলানো হচ্ছে। কিন্তু রুশ মেয়েদের আমি ইঁট সাজাতেও দেখেছি। সে এক ভয়ানক দৃশ্য! হাতের আঙুল দিয়ে রক্ত ঝরছে, নখ খসে যাচ্ছে, তবু তারা হাসছে, যেন বিয়ের উৎসবে তারা এসেছে। যতই মাথা ঘামাও, রুশদের কখনো বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমাদের শৃঙ্খলা ওদের নেই, তাই ওদের আমরা চুরমার করে দেব—একথা তো সবারই জানা। এখন ওরা আত্মরক্ষা করবে কি করবে না—এ কথা নিয়ে ভেবে লাভ কি? সে-ব্যাপার ওদের, ওরা তা ভাবুক—যা-ই হোক না কেন আমরা মস্কো গিয়ে হাজির হবো, আর একথাও বলে রাখছি একেবারে এক পাউণ্ডের কেভিয়ার গিলে তবে খুশি হব।'

'রুটিতে মাখিয়ে খেতে হয় নাকি?' আরগুলা জিজ্ঞেস করলো।

'বার্লিনে রুটিতে মাখিয়ে খায় বটে, কিন্তু মস্কোতে ওরা চামচে করেই খায়।'

'তুমি গুলিয়ে ফেলছ। আমি জানি, রুটিতে মাখনের মতোই মাখিয়ে খায়।

'শীগ্‌গিরই তো দেখতে পাবে—আমি চামচ দিয়েই খাব।'

'ওখানকার মেয়েরা কেমন? পোলদের থেকেও ক্লিরেস নাকি?'

'পাঁচমিশেলি আছে। তবে মিশেলটা খারাপ নয়।'

আরগুলা তার গোঁপে তা দিলে:

'আমার জন্মদিনে মস্কোর একটা ছুঁড়িকে জড়িয়ে ধরব। সেই হবে আমর পয়লা নম্বর।

ক্লেপার তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলে—'কবে জন্মেছ?'

'আটই আগস্ট।'

ক্লেপার গুনলে—সাতচল্লিশ দিন···খুব খারাপ!

কর্পোরাল বললে,

'তোমার কি মনে হয় এ বাদ্যি আটই আগস্টের আগেই থামবে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কেভিয়ার চামচে দিয়ে খাওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তবে আটই আগস্টে আমরা মস্কো যাবই, তোমরা বল তো আমি বাজি রাখতে রাজি আছি। বাজি রইল—মস্কোর সব চেয়ে খপসুরৎ মেয়ে। নিজেরাই গুনে দেখনা—দিনে তিরিশ কিলোমিটার এগোনো যাবে—এতো

আর বেশী নয়। আর দশদিন যাবে সবাই মিলতে, নতুন করে পলটন সাজাতে—আমি হিসেব করে রেখেছি…

'ওরা পিঠে ছুরি চালাতে চেয়েছিল, তার মজাটা বোঝাব।' ক্লেপার গাল দিয়ে উঠলো, কিন্তু তার চোখে ভয়। 'শয়তানের খপ্পরে কাকে বলে বুঝবে! আমি মস্কো গেলে ওদের ছুঁড়িদের কি করি তোমরা দেখবে…'

ক্লিয়েটস্ চশমা চোখে ছিপছিপে ছেলেটি। দর্শনের সে ছাত্র, সে বসেছিল ওদের থেকে একটু দূরে। ওর সঙ্গীরা ওকে এড়িয়েই চলে। ও চুপ করে থাকে আর দুর্বোধ্য উত্তর দেয় বলেই ওরা ওর কাছে বিব্রত বোধ করে। আর সবাই যখন মদ খায়, মেয়ে নিয়ে আমোদ করে বা অশ্লীল গল্প বলে, ও তখন একটা বড নোট বইতে কি সব লেখে, কখনো বা বই পড়ে। ছেলেটি একেবারে হাসে না; আরগুলা আর পল্টনের সবাইকে সে ঘৃণা করে। শুধু রিক্‌টারের সঙ্গেই যুদ্ধের সম্ভাবনা, নীটশে বা মিসরীয় স্থাপত্য নিয়ে কখনো কখনো আলাপ করে। ওর ডাক নাম ওখানে মারাবু—আর সত্যিই ওকে এক জাতের পাখীর মতো দেখতে—বড়শীর মতো বাঁকা নাক, লম্বা দুখানা হাত, আর কর্কশ স্বর, ঠিক যেন পাখীর মতোই কিচিরমিচির করে। সে নোট বইখানা রেখে বললে,

'আমরা মেয়ের জন্য মস্কৌ যাচ্ছি না। ফ্যুরার কি বলেছেন জানো? আমাদের এখন একজন মাত্র প্রেমিকা…' সে তোতলাতে লাগলো, তারপর চেঁচিয়ে উঠলো—'সে প্রেমিকা মৃত্যু!'

ক্লেপার হতাশ হয়ে হাই তুললো, আরগুলা গজরে উঠলো:

তোমার প্রেমিকা ঐ রুশগুলোকে চুমু খেলেই ভালো।'

ছোট রাত শেষ হয়ে এসেছে, মরছে। আকাশ বুঝি এখনো ঘুমোয় নি, ঝিমুচ্ছে শুধু। এবার লাল হয়ে উঠছে, জাগছে। ওখানে ঐ ছোট্ট নদীর ওপারে—প্রকৃত যুদ্ধ আমাদের জন্য ওৎ পেতে আছে—রিকটার ভাবছে। কত বই না যুদ্ধ নিয়ে লেখা হোলো, কিন্তু তবু ওকে বোঝা যায় না। এ যেন প্রেমেরই মতো—ওরা লিখছে, আর লিখছে, তারপর এল এক হিল্ডা—একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর মেয়ে—ইংরেজী জানে, পিয়ানো বাজায়, কল্পনায় যাকে তুমি সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত বলে ভাবতে পার। কিন্তু কি হোলো? এক ভয়ংকর খেলা হয়ে দাঁড়ালো—এ যেন জ্বলন্ত ট্যাঙ্কে চড়ার মতোই

ভয়ংকর। নদীর ওপারে অমনি আবছা প্রান্তর, মুরগীগুলো ডাকছে, মেয়েরা বালতি নিয়ে চলেছে, ঝাকড়া চুল ছেলে-মেয়ের দল ভিড় করে আছে কামানের চারদিকে।...আর চল্লিশ মিনিটের ভিতরেই শুরু হয়ে যাবে... রিক্‌টার ভাবতে চেষ্টা করলো—এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ এসে গেছে। আমি—আমি এক বিরাট ঘটনার অংশীদার, আমার পৌত্র-প্রপৌত্ররা পড়বে আমারই কাহিনী। কিন্তু চিন্তা তো তার অসংলগ্ন, ছড়িয়ে পড়ছে চিন্তাবধারা এলোমেলো হয়ে। তার চোখের সামনে এই ভেসে উঠছে হিল্ডার নোংরা স্নানের ঘর, আবার ঝলসে যাচ্ছে বিস্তীর্ণ শ্যামলতা, মাথা ঝিম ঝিম করে উঠছে—

'রম্ তো নয়, একেবারে খাঁটি বিষ।'

ক্লেপার উত্তর দিলে,

'আমি তো এক মগ টানলাম, কিছুই তো হয়নি।...খাঁটি পল্টনী মাল। আচ্ছা, মস্কোতে গিয়ে না হয় তোমার সাধের ভোদ্‌কাও চাখা যাবে। কিন্তু রুশরা এবার বুঝবে, কি খপ্পরে পড়েছে!...'

'ওহে সাভাৎ, শান্ত হও। এ খেলা নয়, যুদ্ধ!' আরশোলার মনে পড়লো এমনি একটা হামবড়া লোক বিয়োভেতে মারা গিছলো।

সবাই জোরে হাসি-গল্প করছে, কেউ বা মেয়ের কথা, কেউ বা মস্কোর কথা। কেউ বা সোরগোল তুলেছে।—ভোর হয়ে এসেছে—একঘেয়ে প্রতীক্ষার অবসান—শীগ্‌গিরই মার্চ করে বেরিয়ে পড়বে তারা। মারাবু আবার দল থেকে দূরে সরে গিয়ে নোট বই খুলে বসেছে। আকাশ এখন পরিষ্কার, একটা সবুজ হাউই উঠেছে, কেমন ম্লান আর বিষণ্ণ যেন। রিক্‌টারের হিল্ডার দুটি চোখ মনে পড়লো, নিজের চোখ সে জোর করে মেললো। গ্রামের মোরগ ডাকছে, পরস্পরকে তারা সাড়া দিচ্ছে। আরশোলা এবার জোরালো গলায় হাঁক পাড়লো:

'এক—দুই!'

## সতেরো

শীতকাল থেকেই ভাসিয়া মিনস্কে কাজ করছে। হঠাৎ নাতাশা জানিয়ে দিলে, গ্রীষ্মে তাকে মিনস্কে পাঠানো হচ্ছে! কে বিশ্বাস করতে চায় বলো? 'ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটে গেল।'···যতই সে বোঝাতে যায়, ততোই মনে হয় সে মিছে বলছে। উড়ো জাহাজে করে নাকি বাগিচার পোকা মারবার কি ওষুধ ছড়ানো হবে···। তা বেশ তো, তা মিনস্কে কেন?···প্রথমে এই ওষুধ ছড়ানো ব্যাপারটায় দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচের কৌতূহল দেখা দিল, কিন্তু পরে তিনি ফেটে পড়লেন:

আমাকে তামাসা করা হচ্ছে, নাতাশ্কা? আর আমিও তেমনি—বোকা বুঝলাম···আমি তো তোমাকে অনেক আগেই বলেছি—ওকে আমার ভালো লাগে। আর তুমিও ওকে ভালোবাস, লুকিয়ে-চুরিয়ে কি হবে। তুমি একুশ বছরের মেয়ে, তোমার বয়েস হয়েছে। না, এখনো বিয়ের বয়েস হয়নি তোমার?···

নাতাশা হাসলো। ভাসিয়াও বিশ্বাস করবে না। সে ঠিক মনে করে বসবে—আমি আর ধৈর্য ধরতে পাচ্ছি না। এতে একটু রাগ কার না হয় বাপু! কিন্তু যদি আর ধৈর্য না-ই ধরতে পারি!···তেমন মন নেই, এ ভান করেই বা লাভ কি? ওর যা ইচ্ছে ভাবুক না কিন্তু দেখা ও করবে, কথাও বলবে।...ওর কাছ থেকে কথা বার করা শক্ত, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে হবে—'হাঁ কি না যা হয় বলুক। আর সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, সত্যিই ওকে মিনস্কে পাঠানো হচ্ছে। এমন ভাগ্যে বিশ্বাসই হয় না! একেবারে রূপকথার সামিল...। তাকে তিনটি জায়গার ভিতর থেকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল। ওর ভিতরে মিনস্কের নাম তো নাও থাকতে পারত।

দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ বললেন,

'তুমি ভারী খুশি, যেন নেপল্‌স-এ চলেছ। তোমার ঐ ক্ষুদে মুখে তো শার্সি নেই...সব কিছুই দেখা যায়। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে নিজেকে সংযত করা ভালো, যেমন ধর, যখন বাপকে ঠাট্টা করছ।'

জুন মাস, উত্তাপ আর সবুজের সমারোহময়। ভাসিয়া নিজেও ভাবছিল,

প্রস্তাব করবার সময় এই। নাতাশাও এমনি-এমনি এখানে আসেনি... এখানে বলা সোজাই হবে—মা নেই, দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ নেই, কেউ প্রশ্ন করার নেই। ওরা চিঠি লিখবে, তাহলেই হোলো।...কিন্তু নাতাশাকে কি করে বলা যায়? ভাসিয়ার কেমন যেন ঈর্ষাই হোলো: সার্জি হলে ঠিক বলতে পারত। ও যে একজন বক্তা।

দু'দিন ধরে ভাসিয়া অনেক ভেবে ঠিক করলো, সে উচ্ছ্বাসময় কথার ধার দিয়েও যাবে না। ভালোবাসার কথা বললে নাতাশা হয়তো হেসে উঠবে... এ কি অপেরা নাকি? না, ভালোবাসার কথা সে বলবে না, ওসব বইয়ে চলে। দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ-এর ঐ ছত্রটার উপর ভারি ঝোঁক:

'পাখার পৎপৎ শব্দ শুনি'।

কিন্তু বলতে গেলে কি ছেলেমানষিই হবে।...সন্দেহ নেই যে, মায়াকভ্স্কী কোনো মেয়ের কাছে অন্য ভাবেই কথাটা পাড়তেন, হয়তো তিনি হৃদয়ের আবেগের কথা তুলতেনই না। সব চেয়ে ভালো হয়, যদি সে বলে, 'এস আমরা একসঙ্গে থাকি।'...

না, সে তো বিশ্রী, ভারি অমার্জিত রুচির পরিচয়। তবে কি সে জিজ্ঞেস করবে, 'তুমি কি চিরদিনের জন্য আমার সঙ্গে থাকতে চাও?' সে আবার ভারি জমকালো শোনায়—কেন 'চিরদিনের জন্য' কথাটা কেন? আবার অপেরার মত শোনাচ্ছে না...।

সে কিছুই ভেবে পেল না। সব কিছু কিন্তু কথা না বলেই চুকে গেল। নাতাশার দুষ্টুমিভরা চোখে হাসি, ভাসিয়া শুধু বললে—'তুমি—তুমি ক্ষুদে শয়তান!'...নাতাশা লজ্জা পেয়ে এক কোণে সরে গেল, সে তাকে টেনে এনে হঠাৎ জড়িয়ে ধরলো। পাগলের মতোই ওরা হাসলো, চুমু খেল, তারপর হাত ধরাধরি করে ঘরময় ঘূর্ণি তুলে বেড়ালো। তারপর ভাসিয়া তাকে দু বাহু দিয়ে তুলে নিলে। 'তুমি ভারি হালকা! যেন পাখীর পালক।'...নাতাশা বললে, 'আচ্ছা, দেখা যাবে। ধর যদি দেখা যায়, আমার খুব বদ মেজাজ?...' তারপর সে খিলখিল করে হেসে উঠলো, তার 'বদ মেজাজ' হবে...এ তো খুব হাসিরই ব্যাপার। এবার ওরা চুপচাপ। সুখের পরিপূর্ণতায় ওরা যেন ভয় পেয়েছে। হাঁ, এই তো হয়, নাতাশা ভাবলো, অথচ মানুষ যা বলে তার থেকে একেবারে আলাদা।...এতেই কি পাগল হতে বাকি রাখে।...ভাসিয়ার

মনে পড়লো, নাতাশা কেমন বিভ্রান্ত হয়ে এসেছিল। সে আবার হাসলো: 'মনে আছে, তুমি কি বলেছিলে—উপর থেকে ওষুধ ছড়াতে হবে'—সত্যি? নাতাশা চুমু খেয়ে কথাটা থামিয়ে দিলে।

তারা পরের ছুটির দিনটা একসঙ্গেই কাটাবে। সবে সে দিন এসেছে, সে যেন তাদের কাছে ঐ চমৎকার রাতেরই অনুসঙ্গী। দুজনেই লাজুক, লজ্জা করছে পরস্পরকে; কখনো নাতাশা কখনো বা ভাসিয়া বলছে: 'কি দেখছ?' 'এদিকে ফোরো না।' তার পরমুহূর্তেই সব কিছু ভুলে, ওরা চুমু খাচ্ছে। নাতাশা চায়ের কেৎলি চাপিয়ে দিলে, যেন গৃহিনীর অভিনয় করছে এবার: 'এবার কিছু জ্যাম কিনে দেব তোমাকে। আমি কি দেখিনি, আমাদের বাড়িতে তিন-তিনবার জ্যাম চেয়ে নিয়েছিলে? ...'

ভাসিয়া তাকে 'নিজের' গড়া বাড়িগুলি দেখাতে চাইল। রোদেঝলা দিন, হাওয়া ভরা। ভাসিয়ার গলাবন্ধ কেমন উড়ছে হাওয়ায়, দেখে হাসি পায়। নাতাশা তার স্কার্ট অতি কষ্টে সামলে রাখছে।

'জোর হাওয়া দিচ্ছে...'

'তাইত গরম লাগছে না। পরে আমরা বনে ঢুকে পড়ব—কি বল?'

নতুন বাড়িগুলির কথা বলতে লাগলো ভাসিয়া।

'এই কারুকাজ আমার ভালো লাগে না, কিন্তু উপায় নেই। জিনিসগুলি খুব খেলো, তাই কারুকাজ দিয়ে ঢেকে দিতে হচ্ছে। তাহলেই ভালো দেখাবে...'

নাতাশার ভ্রূ কুঁচকে গেল, পরক্ষণেই হেসে উঠলো।

'ভাসিয়া এ সব আমি কিছুই জানি না। কিন্তু দেখো দু-তিন বছরে ঠিক সব জেনে নেব। এরই মধ্যে তুমিও ভালো জিনিসপত্র পাবে, আর পাবে একটি খুব ভালো স্ত্রী।'

তারা নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে—পরিপূর্ণ সুখ। হঠাৎ কে যেন ভাসিয়ার হাত চেপে ধরলো। সে পেছন ফিরে তাকালো—তার সহকর্মী লিপেৎস্কী।

'উনি এখুনি বলবেন! জার্মানরা এরই মধ্যে...'

খোলা জানালা দিয়ে শোনা গেল মলোতভের স্বর। বক্তৃতার পরে বাজনা। কিন্তু নাতাশা আর ভাসিয়া সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, প্রকৃতিস্থ তারা তখনো হয়নি।

পৃথিবী হানা-দেওয়া মৌচাকের মতোই গুণ গুণ করছে। দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ রাগে লাল হয়ে উঠে বার বার বলছেন: 'বর্বরের দল! কি বর্বর, অমানুষ ওরা—দেখছ তো!' যুদ্ধ এখন চলছে পোল্যাণ্ডে আর লিথুয়ানিয়ায়। রিকৃটার তার বন্দুক বার্চের ডালপালা দিয়ে ঢেকে নিলে, ডালপালায় কেমন কটু গন্ধ। হাইডেলবার্গে স্থূলাঙ্গী গার্ডা উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস। জোহান এবার যে কোনো দিন মস্কো দখল করবে। বার্লিনের মানুষ গাইছে, চেঁচাচ্ছে, বিজয় ইশতেহারের প্রতীক্ষা করছে। সেই সুদূর উত্তরাঞ্চলে ওসীপ বক্তৃতা দিচ্ছে: 'ঐ জঘন্য ফ্যাসিস্টরা'...শঠতা করে... ভালিয়া কাঁদছে, বালিশে তার মুখ গোঁজা। আর পারীতে মিলেৎ মারীকে বলছে: 'ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে এবার চুক্তি শেষ। রুশরা এবার এখানে আসবে, বুঝেছ মারী?'

নিভেল লিখলো ডায়ারীতে: 'দান পড়েছে—হয় আমরা, নয়, ওরা...'

লিথুয়ানিয়ার অরণ্যে অরণ্যে মোটর-সাইকেলের ঘস্ ঘস্ শব্দ, বেলো-রাশিয়ার গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলছে। একটি আহত মেয়ে ডাকছে—'মা, মাগো!' মস্কোতে কে যেন বেতার কেন্দ্রে চেঁচিয়ে বলছে: এখন কোন স্থচি হবে? কয়েকটা গান দাও!'...গান ঝরে পড়ছে, বয়ে যাচ্ছে বিভ্রান্ত নগরগুলির উপর দিয়ে, গভীর শান্তির গান—বাগান, নাইটিঙ্গেল আর পরিপূর্ণ সুখের গান! ওদিকে কামান গর্জাচ্ছে, বাড়ছে তাদের বজ্র-নির্ঘোষ।

আব ছোট্ট মেয়ে নাতাশা, তার মুখে তো সব লেখা হয়ে যাচ্ছে। সে এইমাত্র জেনেছে, মানুষ কেন বাঁচে। নিস্পন্দ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, নড়তে পারছে না। তার উপরও ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভাগ্য—সে ভাগ্য তার, জনগণের, রাশিয়ার, সারা পৃথিবীর।

তার চারপাশে স্বর ঝরে পড়ছে, স্বরের কলরব:

'পাজির দল!'

'আগেই জানতাম...'

'তুমি তো সব সময়েই বল, আগেই জানতে...'

'একটু জানান না দিয়ে... ইতর যতসব।'

'কিন্তু জার্মান কমিউনিস্টদের ব্যাপারখানা কি?'

'ওরা এবার কাজে নামবে...'

'চমৎকার! উনি বলছিলেন না—'জয় আমাদেরই হবে'...

'ওরা এবার বুঝবে, এটা ফ্রান্স নয়!'

'আমার ভয় হচ্ছে, ওরা এবার উড়েই এসে নামবে...'

'তোমার কি মনে হয়, যুদ্ধ বেশিদিন চলবে?'

'আধুনিক যুদ্ধের ধারা যেমন...'

'আমাদের ওরাও বোধহয় এতক্ষণে সীমান্ত পার হোলো...'

'মিশেঙ্কা, তোমার এবার ডাক পড়বে।...'

'মা, তোমার দিকে সবাই তাকিয়ে আছে...'

'আমার ভয় হচ্ছে, মিনস্কের উপর ওরা নিশ্চয়ই হামলা দেবে।'

'অতো ভয় পেয়ো না, কাছে ঘেঁষতেও ওদের দেব না...'

'ওরা কি জানে না যে আমাদের শক্তি আর সম্পদ অফুরন্ত।'

'আমরা আবার খুব বিপদের জায়গায় আছি, ঠিক বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের কাছে...'

'আমি সামরিক দপ্তরে যাচ্ছি।'

'দুয়ো, দুয়ো!'

ভাসিয়া তার বাড়িগুলোর কাজে চলে গেল, নাতাশা গেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাড়ায়।

বিদায়ের সময় নাতাশা বললে:

'কি অদ্ভুত...আজই এমন হোলো!'

'নাতাশা, যা-ই হোক না, আমরা তো দুজনে বাঁধা পড়েছি চিরদিনের জন্য।'

ভাসিয়া আর ওকথা বলতে ভয় পায় না।